Published by AUTHOR
With Financial assistance from the Government of India,
Department of Education Vide Sanction Letter No.
4-9/91-LG,

REVISED SECOND EDITION
July 1959

Printed by :
BANALATA ART PRINTERS
Sodpur, 24 Pgs. (N)

Distributor :
For West Bengal
BAMA PUSTAKALAYA
11A, Bankim Chatterji Street
Calcutta-700 073

"নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই"

সেই বেলাকে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্বের বিস্ময়। তাঁহার সমধর্মী সাহিত্যিক আজ পর্যন্ত জন্মায় নাই, ভবিষ্যতেও জন্মাইবে কিনা সন্দেহ। তিনি ৬০ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া কাব্য, নাটক-গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান, ধর্মতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি অজস্র ধারায় বর্ষণ করিয়াছেন। সেই বারি ধারায় অবগাহন করিয়া শুধু বাঙালি বা ভারতবাসী নহেন, সমগ্র বিশ্ববাসী সঞ্জীবিত হইয়াছেন।

"আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে" যে মানসী প্রতিমা তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা একেবারে একক এবং স্ববৈশিষ্ট্য মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া আলোক-স্তম্ভের মতো দাঁড়াইয়া আছে। এই আলোকস্তম্ভ কোনো কালেই নিষ্প্রদীপ হইবে না—যুগযুগান্তর ধরিয়াই আলোক বিকীরণ করিতে থাকিবে। তাই ঋষি-কবি নিজের রচনা সম্বন্ধে নিজেই ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

"আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতা খানি
কৌতূহল ভরে"

শুধু তাই নহে, কবি তাঁহার নিজের সৃষ্টির দিকে তাকাইয়া মহাকবি বাল্মীকির মতই বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন—

"আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এ যে সংগীত কোথা হতে উঠে
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ"

শুধু কবিই নহেন, বিশ্ববাসীও চমৎকৃত—

> "যে রাগিণী শুনি নিশিদিনমান
> বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
> মলিন মর্ত—মাঝে বহমান
> নিয়ত আত্মহারা।"

এবং জয়দেবের বাণী উল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে—

> "সাধ্বী, মাধ্বীকচিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি।
> দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে॥"

(রবীন্দ্র-কাব্য যতদিন এই পৃথিবীতে থাকিবে, হে মধু, মধুর বলিয়া আর কেহ তোমাকে চাহিবেনা, শর্করা হইবে কর্কশতাময় ; দ্রাক্ষা, কেহ দেখিবে না আর তোমাকে, অমৃত মৃত হইয়া থাকিবে। ক্ষীরের আস্বাদ হইবে নীরের মত, মধুর আম্রফল শোকে করিবে ক্রন্দন)।

কবির অসামান্য সৃষ্টিতে বিধৃত হইয়াছে—বিশ্বপ্রেম, সর্বজনীনভাব, আদর্শপ্রীতি, অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্য। এই সৃষ্টির পশ্চাৎপটে আছে একটি অতীন্দ্রিয় ও অধ্যাত্ম অনুভূতি। বৃক্ষ যেমন পৃথিবীর জঠরদেশে তাহার শিকড়গুলিকে প্রবেশ করাইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া রস সঞ্চয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, রবীন্দ্র-প্রতিভাও তেমনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ হইতে রস আহরণ করিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে রসপুষ্ট করিয়াছে। এই রসের খোরাক জোগাইয়াছে কালিদাস, ব্যাস-বাল্মীকি হইতে জয়দেব, অপরদিকে উপনিষদের সঙ্গে বৈষ্ণবদর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ও লীলাবাদ, হেগেলের Ideal Realism, বের্গসঁ-এর গতিতত্ত্ব, কবীর, দাদু, ওমর খৈয়াম, হাফেজ, বাউল প্রভৃতি সাধকদের গান, তত্ত্ব। কবিমানস গঠিত হইয়াছে ইহাদের সংমিশ্রণে। ফলে কবির সৃষ্টির অন্তরালে আছে ইঁহাদের প্রভাব।

প্রভাব দুইভাবে পড়িতে পারে— প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে। উপরিউক্ত মনীষীদের চিন্তাধারার কিছু প্রত্যক্ষ প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়—বিশেষতঃ কালিদাস, জয়দেব, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের। ইঁহাদের

সম্মিলিত পরোক্ষ প্রভাবও বিশেষভাবে সক্রিয়।

আলোচ্য গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব ও বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য, রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কি ভাবে রসসিক্ত করিয়াছে, তাহার সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। উপস্থাপিত বিষয়বস্তুটি নূতন নহে। ইতোঃপূর্বে বহু সমালোচক এই বিষয়টির উপর আলোক-পাত করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু কেহই পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন নাই। ফলে এই বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে একটি দীর্ঘতম আলোচনার অবকাশ আছে বলিয়াই, এই দুরূহ-কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ভীরু হস্তের রচনা—ভুলত্রুটি থাকিবেই। এই গবেষণা নিবন্ধ রচনাকালে যে-সকল সমালোচক ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে উপকরণ আহরণ করা হইয়াছে তাঁহাদের নাম ও গ্রন্থনাম এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সূত্রে তাঁহাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমি পণ্ডিত নই, সাহিত্যিক নই, সাহিত্য জগতের একজন সামান্য পদাতিক মাত্র। পদাতিকের পক্ষে মহারথীর সমালোচনা করা যেমন কঠিন, ঠিক তেমনি আমার পক্ষে 'রবি-রশ্মির' বিচার বিশ্লেষণ করাও 'দুরূহ' এবং ইহা সম্ভবপর হইয়াছে আমার সাহিত্য-পথের দুই দিশারীর অনুপ্রেরণায়। সেই দুই দিশারী হইতেছেন—জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মনীষী ডঃ সুকুমার সেন। ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে কি হইত তাহা বলা দুষ্কর। এই প্রসঙ্গে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহার নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। ডঃ লাহা যে শুধু কার্যের অগ্রগতির সহায়ক ও নির্দেশক ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রচেষ্টায় এই গবেষণা গ্রন্থটি রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি লিট উপাধি প্রাপ্তির জন্য দাখিল করিতে পারিয়াছি।

এই গবেষণা-গ্রন্থের পরীক্ষক ছিলেন—ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন এবং ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা। তাঁহাদের সপ্রশংস অনুমোদন লাভের ফলেই রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডি লিট. উপাধি প্রদান পূর্বক সম্মানিত করিয়াছেন। ডঃ সুনীতি কুমার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সপ্রশংস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থের পুরোভাগে মুদ্রিত করা হইয়াছে—বহুমূল্য শিরোভূষণ হিসাবে। আজ ডঃ সুনীতি কুমার আর ইহলোকে

নাই, তিনি গ্রন্থটিকে মুদ্রিত অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; কিন্তু বহুবিধ অন্তরায়ের ফলে তাঁহার জীবদ্দশায় গ্রন্থটি মুদ্রিত করিতে পারি নাই। এই কথা, স্মৃতিপটে উদিত হইয়া আমার অন্তরাত্মাকে বেদনা-প্লুত করিয়াছে।

এই গ্রন্থ-রচনায় অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যক্ষ জয়ন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী ও সহধর্ম্মিনী বেলা দেবী এবং আমার প্রাক্তন ছাত্রী, কল্যাণীয়া রুবি ভাওয়াল (দাস)। বেলাদেবী আজ আর নাই— 'বেলা' অবেলায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। বেলা গ্রন্থটিকে মুদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া যাইতে পারিল না। এই গ্রন্থটি যথাসময়ে মুদ্রিত করিবার জন্য কলিকাতার বহু বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশকের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গবেষণা-গ্রন্থ মুদ্রিত করা চলে না বলিয়াই তাঁহারা ফিরাইয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু সহায়তালাভে বঞ্চিত হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন-এর নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আইন-ঘটিত পদ্ধতির জন্য অপারগ হইয়াছেন। আসাম সরকার পূর্বে অর্থ সাহায্য দিতেন, এবং আমার পিএইচ. ডির গবেষণা গ্রন্থটি আসাম সরকারের অর্থেই মুদ্রিত হইয়াছে। এখন ঐ প্রকল্পটি বাতিল করার ফলে—রাজ্য সরকারও অর্থ সাহায্য করিতে পারেন নাই। তবে স্বল্পমূল্যে কাগজ ক্রয় করিবার ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। রাজ্যসরকারের ঐ সাহায্য না পাইলে নিজব্যয়ে গ্রন্থটি মুদ্রণ করা আমার সাধ্যাতীত ছিল।

বিষয়বস্তুটি বহু বিতর্কিত। বিভিন্ন সমালোচক এই বিষয়টির উপর বিভিন্ন মতামত দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে— গণিতের প্রশ্ন ও সাহিত্যের প্রশ্ন এক নয়। গণিতের প্রশ্নমালার উত্তর দেওয়া থাকে পরিশিষ্টে। ঐ উত্তরের সঙ্গে না মেলা পর্যন্ত অঙ্কটি যে ভুল হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ নীতি অচল ; সুতরাং সমালোচকদের নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গির জন্য পার্থক্য থাকিবেই। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও যে নির্ভুল একথা বলাও ধৃষ্টতামাত্র। তবে গ্রন্থকারের পরম সৌভাগ্য যে আচার্য সুনীতি কুমার ও আচার্য সুকুমার

সেনের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়াছে কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাসবী বসু (পান বাজার, গৌহাটী)। এই নবীন শিল্প-রসিকাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। মুদ্রণ প্রমাদও বেশ কিছু রহিয়া গিয়াছে। তাই পরিশেষে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য সুধীজনের নিকট এই প্রার্থনা—

সাধুজন শুধু ক্ষমিয়া মোরে
দোষটুকু ভুলে গুণটুকু ধরে
ধন্য মানিব জীবন ভরে
কথা বলিয়াছি যে দুই চারি

শ্রীঅজয় কুমার চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের দুই তারিখে—'বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে।'

কিছু বই আমার গৌহাটী বাসায় ছিল এবং কিছু ছিল আমার ধুবড়ী বাড়ীতে। ১৯৮৮ সালে ধুবড়ীতে যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল—সেই ধরণের বন্যা পূর্বে বা পরে আজ পর্যন্ত হয়নি। সেই বিধ্বংসী বন্যায় ধুবড়ী শহর তথা আমার বসত বাড়ী সাত ফুট জলের নিচে ছিল প্রায় ছয়-সাত দিন। ফলে আমার অন্যান্য বই-এর সাথে এই বইটিও বন্যা কবলিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি প্রকাশিত করেছিলাম। প্রথম সংস্করণ শেষ হবার পর, পাঠকদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পেয়ে আমার পক্ষে এ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করা অসম্ভব মনে করে আমি আসাম রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের 'মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক'-এর আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেছিলাম। রাজ্য সরকার আমার আবেদন বিশেষ বিবেচনাযোগ্য বলে অনুমোদন করে আমার আবেদনপত্র দিল্লী দরবারে পাঠিয়ে দেন।

কিছুকাল পর দিল্লীর নির্দেশানুসারে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজ পাঠিয়ে দেওয়ার পর ১৯৯২ সালে মে মাসে ঐ মন্ত্রক আমার আবেদন মঞ্জুর করেন। এই সংস্করণটি (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত) কেন্দ্রীয় সরকারের 'মানব উন্নয়ন মন্ত্রক-'এর অর্থানুকূলে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল। এর জন্য আমি আসাম সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। উপরন্তু শ্রীযুক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ বিষয়ে তাঁর সহানুভূতি লাভ করেছিলাম।

আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সামান্য কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে, যদিও তা পাঠকের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটাবে না। আশা করি এই সংস্করণটি সুধী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পূর্বের মতই সমাদর লাভ করবে।

বইটি ছেপেছেন বনলতা আর্ট প্রিন্টার্স; ঘোলা, সোদপুর। বনলতা আর্ট প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীশ্যামল রঞ্জন দাস এবং কর্মীদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রেস ও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে শ্রীতপন কুমার বিশ্বাস—তাকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

শ্রীঅজয় কুমার চক্রবর্তী

—)o(—

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ

—ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ—

(প্রস্তাবনা)

"অপারে কাব্য-সংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতি।"

কাব্য-সংসারে কবিরা দ্বিতীয় প্রজাপতি। অর্থাৎ ব্রহ্মা যেমন জগতের সৃষ্টিকর্তা। কবিরাও ঠিক তেমনি কাব্য-জগতের সৃষ্টিকর্তা। কবিরা শুধু সৃষ্টিকর্তা নহেন —

'ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো বি যে তিরে
পুরুরূপং দর্শতং বিশ্ব চক্ষণম্
অপো বাতা ওষধয়স
তান্যেকস্মিন্ ভুবন অর্পিতানি।"

কবিরা তিনটি ছন্দের সাধক। তাঁহারা জরামৃত্যু রহিত। কবিরা তাঁহাদের রচিত কাব্যের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহারা বিশ্বচিত্তের দূত। তাঁহাদের সহস্র চক্ষু। তাঁহারা একটি লোকে বাস করিয়া সর্বলোকের রহস্য দেখিতে পান। যে রস ও রহস্যের, প্রেম ও সৌন্দর্যের, শোক ও বেদনার দুঃখ ও আনন্দের সৃষ্টি দ্বারা এই বিশ্ব-জীবনকে আমরা পাই ও ভোগ করি, সেই সৃষ্টি কবিরা আমাদের দিয়াছেন —

"অমৃত্র সন্নিহ বেত্থেতঃ সংস্তানি পশ্যসি।"

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিও প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টির মতই মনোহর, মনোরম।

তিনি আধুনিক যুগের মহত্তম কবি। উপরন্তু রোমান্টিক।

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত, বাংলা, পালি, প্রাকৃত, অবহট্‌ঠ, ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য—বিশেষতঃ কালিদাসের চিন্তাধারার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

"তস্মাদ্‌গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্‌
গৌরীবক্ত্র-ভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা।"

রবীন্দ্রনাথের "মহুয়া"র "বিজয়ী" কবিতার এই অংশটিকে বার বার স্মরণ করায়—

"কানন-পর ছায়া বুলায়
ঘনায় ঘনঘটা
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা॥"

অথবা—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ-সুখিনোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি।"

পঞ্চমোঽঙ্ক / অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌ / কালিদাস।

এই শ্লোকটির দ্বারা মহাকবি কালিদাস গোচর ও অগোচরের মধ্যে, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে, লোক ও লোকান্তরের মধ্যে মানবচিত্তের রহস্যময় অবচেতনার দ্বারা সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় কালিদাসের এই শ্লোকটির অভিনব সম্প্রসারণ লক্ষিত হয়। বসুন্ধরা কবিতায়—

"জাগে মহাব্যাকুলতা
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলস্থলে অরণ্যের পল্লব-নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়।"

'উর্বশী' কবিতায় ঐ শ্লোকের অনুরণন পাই—

"তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চির বিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে।
পূর্ণিমা-নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূর স্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি
ঝরে অশ্রুরাশি।"

এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের একটি গদ্য রচনায় পাই—

"ভাবুকলোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিমল দুঃখের ভাব অনুভব করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ * * * কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে এই প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে দূর হইতে সংগীতের সুর শুনিলে সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না, সংগীত, বসন্তবায়ু, সুগন্ধের ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন ব্যাকুল হয় কি কারণে?" (বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা, অপ্রচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড)।

রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে এই ভাবটি দীর্ঘকাল ধরিয়া ছিল। তাই "কড়ি ও কোমল" এর 'স্মৃতি'; "মানসীর" 'অনন্তপ্রেম', 'কুহুধ্বনি'; "সোনার-তরী"র 'সমুদ্রের প্রতি': "উৎসর্গে"র 'প্রবাসী' প্রভৃতি কবিতায়, "জননান্তর সৌহৃদানি"র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য যেমন বিপুল ঠিক তেমনি বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গেও। ডাঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতীয় সাহিত্যের মৌলিক বিচারের তিনটি দিগ্‌দর্শনী পাই। ঋগ্‌বেদ-সংহিতা, কালিদাসের কাব্য-নাটক ও বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্র পূর্ব-ভারতীয় সাহিত্যের সমুচ্ছ্রিত ত্রিকূট। এই ত্রিকূট নিঃসৃত কাব্য-প্রেরণার সঙ্গে— কালের গতিকে যতটা সম্ভব— রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনার অন্তর্বাহী যোগ আছে। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের সংযোগ স্বভাবতই অনেকটা শিথিল। ••• বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের যোগসূত্র দুর্লক্ষ্য। ভাষা ব্যবধানও প্রায় দুষ্পার। অতএব বৈষ্ণব পদাবলীতে ও কালিদাসের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ যেমন সহজ ও অবারিত হইয়াছিল বৈদিক সাহিত্যে—অবশ্য উপনিষদ ছাড়া— তেমন নয়।"

(বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস / ৩য় খণ্ড / রবীন্দ্রনাথ, পৃ, ১২)

ঋগ্‌বেদে বর্ষা সঞ্জীবন ঋতু, নবজীবনের আশ্বাসবহ। বৈদিক কবি বর্ষা-মেঘপুঞ্জকে পর্জন্যদূতরূপে কল্পনা করিয়াছেন। মেঘদূতে পর্জন্যের বাহন বিরহ-সন্তপ্তের শরণ হইয়া বিরহিণীর নিকট সমাশ্বাস বহন করিয়া, পথে উদ্‌গৃহীতালকান্তা পথিক বনিতাকে আসন্ন প্রিয়-সমাগমের প্রত্যয় দিতে দিতে চলিয়াছে! বেদে বর্ষা জড় জীবনের ভরসার সিম্বল, মেঘদূতে প্রেম-জীবনের আশার। বৈষ্ণব পদাবলীতে রূপ আরও পরিবর্তিত। যেখানে মেঘ বিরহীকে পরিত্যাগ করিয়া বিরহিণীর অন্তর ছাইয়া ফেলিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষামেঘ বিরহ মিলনের যবনিকা রচনা করিয়াছেন। এখানে বর্ষা যেন দূতী—আশ্বাসনের সিম্বলে পরিণত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ষা জীবনসত্তার নিগূঢ় নির্হেতু ব্যাকুল প্রত্যাশা রূপকের মত। রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা বিশ্বঋতুরঙ্গে জীবলীলা নাটের মাথুরে দৃশ্যের মত। বৈষ্ণব কবির মতই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এভরা বাদর-দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনা-কূলে বিকশিত নীপ মূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়।"

মানসী / পত্র।

রাধাকৃষ্ণ, যমুনা, বাঁশি, মথুরা, রবীন্দ্রনাথের কবি-ভাবনাকে অনেকখানি প্রভাবিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। ১৩২৮ সালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

"বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈয়ারি করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে তেমনি করিয়া তাহারা মিশিয়াছে।"

আলোচ্য গ্রন্থে কবির উপর উপনিষদের প্রভাব কতটুকু তাহা নির্ধারণ করা হইতে আমরা বিরত রহিয়াছি; কারণ কবির 'মনের হাওয়ায়' উপনিষদের প্রভাব কতদূর তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ অনেকখানি হইয়াছে। কিন্তু "বৈষ্ণবীয় হাওয়া" কবি-মানসে কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার যে-আলোচনা অদ্যাবধি হইয়াছে তাহা আলোচ্য গ্রন্থকারের নিকট অপ্রচুর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়-বস্তুটিকে অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ থাকায় এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণবীয় দৃষ্টি ভঙ্গি সম্পর্কে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষুদিরাম বসু, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার, ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ সুধী সমালোচকেরা নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থশেষে ঐ সকল সুধী সমালোচকের নাম ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের নিকট আলোচ্য গ্রন্থকার সকৃতজ্ঞ-চিত্তে ঋণ স্বীকার করিতেছে।

———

— দ্বিতীয় অধ্যায় —

(বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণব পদাবলী)

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আলোচনার পূর্বে বৈষ্ণবতা কি তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে ভগবান বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম ও দর্শন সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই বৈষ্ণবতা।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে—ঋগ্বেদ। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে এবং এক বা বহু দেবভাবনার বিমিশ্র অনুভূতি ও আবেগের মধ্যেই ঋগ্বেদের সূক্তগুলি রচিত।

ঋগ্বেদের প্রধান দেবতাগুলির মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু, রুদ্র, সবিতা, অর্যমা, সূর্য, ভর্গ পর্জন্য, যম, অশ্বিনীদ্বয়, বৃহস্পতি, ত্বষ্টা, বসুগণ, অগ্নি, সোম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেবতাদের প্রতিমা ছিল না। যজ্ঞে যাঁহাদের আহ্বান করা হইত তাঁহারা অলক্ষ্যে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দূত অথবা প্রতিনিধি ছিলেন অগ্নি। দেবতাদের উদ্দেশ্যে 'হবিঃ' অগ্নিতে অর্পণ করা হইত। অগ্নি যথাস্থানে তাহা পৌঁছাইয়া দিতেন। সেই হিসাবে ঋগ্বেদের ধর্মাচরণকে 'অগ্নিযোগ' বা fire cult বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। বৈদিক যুগের পর যে দুইটি দেবতা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সাহিত্যে মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছেন, সেই রুদ্র ও বিষ্ণু বেদের প্রধান দেবতাদের অন্যতম। রুদ্র 'অসুর' দেবতা, বিষ্ণু 'দেব' দেবতা।

বিষ্ণু, কৃষ্ণ, বাসুদেব, মধুসূদন, গোপাল মূলতঃ এক। এই একীকরণ একদিনে হয় নাই। বৈদিক বিষ্ণুর পরিণাম বিষ্ণু-কৃষ্ণ, পরবর্তীকালে বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ হইয়াছে। পুরাণে কৃষ্ণ শিশু ও কিশোর, ঋগ্বেদে বিষ্ণু 'যুবা', 'কুমার' ; পুরাণে কৃষ্ণ "গোপবেশী বিষ্ণু"। ঋগ্বেদে বিষ্ণু "গোপ" নহেন—গোপা —অর্থাৎ রক্ষাকর্তা (বিষ্ণোর্গোপাঃ) গোধনের সঙ্গে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ আগাগোড়া। পুরাণের কৃষ্ণ ব্রজে গরু চড়াইতেন ; ঋগ্বেদের বিষ্ণু "পরম পদে" অর্থাৎ উর্ধ্বতম-লোকে পরবর্তীকালের বৈকুণ্ঠে

আরও পরবর্তী কালের গোলোকে গরু চড়াইতেন। উর্ধ্বতমলোকে প্রচুর বহুশৃঙ্গ লঘুচারী গরু ছিল— "যত্র গাবো ভূরি শৃঙ্গা অয়াসঃ"। পুরাণে বিষ্ণু-কৃষ্ণের নাম—মাধব। মধু দৈত্যকে নিধন করিয়াই তিনি মাধব ও মধুসূদন (মধু পরিবেশক) রূপে খ্যাত—"বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ"। ঋগ্বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সহযোগী, কিন্তু ইন্দ্রের প্রাধান্য বিষ্ণুর উপরে এবং পুরাণে ইন্দ্রের স্থান বিষ্ণুর নীচে। প্রথমাবস্থায় বৈদিক আর্যদের মধ্যে ইন্দ্র-পূজকের সংখ্যা অধিক ছিল, কিন্তু কালক্রমে বিষ্ণু-পূজকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইন্দ্র ও বিষ্ণুর দ্বন্দ্ব লইয়া সেই যুগে কাহিনীও সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দ্র ও বিষ্ণু-কৃষ্ণের বিরোধের দুইটি কাহিনী পুরাণে আছে— "পারিজাত হরণ" ও "গোবর্দ্ধন-ধারণ"।

পারিজাত-হরণ উপাখ্যানের কোনো উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে নাই, গোবর্দ্ধন-ধারণ-কাহিনীর উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের ধারাবর্ষণ হইতে গোকুল রক্ষার জন্য কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্বত ছাতার মত ধরিয়া ব্রজবাসী ও গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন। বৈদিক-কবির কবি-কল্পনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু পৃথিবীর উর্ধ্ব আকাশকে থামের মতো ধারণ করিয়া আছেন (যো অস্কভায়দ্ উত্তরং সধস্থম্) তাহারই তলায় মর্ত্য-অমর্ত্যের বাস। কৃষ্ণলীলার মধ্যে যে কয়েকটি ব্রজ-কাহিনী পৌরাণিক কালে সর্বাধিক সুপরিচিত ছিল তাহার মধ্যে "গোবর্দ্ধন ধারণ" প্রধান। কৃষ্ণের ব্রজলীলা বাক্-শিল্পে গ্রথিত হইবার পূর্বে মূর্তিশিল্পে প্রচলিত হইয়াছিল।

গোবর্দ্ধন ধারণের সঙ্গে আর একটি উপাখ্যান বিজড়িত। কৃষ্ণের অবতারত্বের পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা ব্রজের সমস্ত গোবৎস হরণ করিয়া গোবর্দ্ধন কন্দরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন কৃষ্ণ নকল গোবৎস সৃষ্টি করিয়া— গোমাতা, ব্রজবাসীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া গোবৎস ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম সম্বন্ধে ঋগ্বেদে পাই— (ইদং বিষ্ণুর্বিক্রমে ত্রেধানিদধে পদং")। বিষ্ণু (বিশ্ব) পরিক্রমা করিয়াছেন, তিনি তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদের এই কাহিনীর অংশ-বিশেষ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—ইন্দ্র বিষ্ণু ও অসুরদের যুদ্ধ ও মৈত্রীর মধ্যে। এই কাহিনীর রূপান্তর কাণ্ব-শাখার শতপথ-ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও আছে। সেখানে বিষ্ণু— 'বামন', তবে ত্রিবিক্রম নহেন—শয়ান।

পুরাণে বিষ্ণুর মোহিনীরূপ ধরিয়া অসুরদের বঞ্চনা করিয়া দেবতাদের অমৃত পরিবেশনের যে উপাখ্যান আছে তাহার বীজ, শতপথ-ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও আছে।

বৈদিক-সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে— উপনিষদ্‌। সাধারণ লোকের জীবন ধারায় বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রমেই কমিয়া যাইতে সুরু করে। ধর্মভাবনা ও দৈবচিন্তা নূতন নূতন পথে ধাবিত হইতেছিল। ভারতবর্ষের দর্শন, জ্ঞানের উৎস উপনিষদ্‌। রূপক গল্প (allegory and parable) উপনিষদে উচ্চ-কোটি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে "দেবকী পুত্র" কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বিষ্ণুই বাসুদেব হইয়া পড়িয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে লেখা পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী" গ্রন্থে বাসুদেব ও অর্জুনের উল্লেখ আছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কৃষ্ণ লীলার উল্লেখ আছে।

"সংকর্ষণ দ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্ধতাম্‌"
সংকর্ষণ-সহায় কৃষ্ণের বল বৃদ্ধি হউক।
"জঘান কংসং কিল বাসুদেব"
কংসকে বধ করিলেন কৃষ্ণ।

মহাভারতে কৃষ্ণ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব (অধ্যায় ২৫-৪২) ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা-ধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে রণক্ষেত্রে আসিয়া অর্জুন ও কৃষ্ণের যে সংলাপ হইয়াছিল তাহাই ভাগবদগীতার ও গীতার বিষয়বস্তু।

উপনিষদের ব্রহ্মবোধ ও জ্ঞানযোগের পর ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তায় ভক্তিযোগের সঞ্চার হইয়াছিল। গীতায় ব্রহ্মবোধ ও জ্ঞানযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগের সমন্বয় চেষ্টা আছে, এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যে পুরুষবাদের আরম্ভ তাহা ইতঃমধ্যে যে ব্যক্তি-ঈশ্বরত্বে সমন্বিত হইয়া অবতার-বাদের দিকে ঝুঁকিয়াছিল তাহার প্রতিফলন গীতায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার কিছু সংখ্যক শ্লোক কঠ-উপনিষদ হইতে গৃহীত বা প্রভাবিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। গীতার যে সুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা শেষের দিকে ঋগ্বেদে ধ্বনিত হইয়াছে—"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নি যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"। (১/১৬৪/৪৬) পরবর্তীকালে সেই মহাসত্তাকে সর্বব্যাপী কল্পনা করিয়া তাঁহাকেই "পুরুষ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে— "পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম।" উপনিষদে এই 'পুরুষ' পরিচিত হন— "ব্রহ্ম" নামে। এইখানেই দেখা যায় নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গি। অর্থাথী বা আর্ত হইয়া প্রার্থনা নয়, বিশ্বসত্তাকে জানিবার কৌতূহল দেখা দেয়। এবং সেই প্রার্থনা রূপান্তর লাভ করিয়া দেখা দেয়—

"অপাবৃণু"। হে পূষণ তুমি তোমার আবরণ অপাবৃত কর যাহাতে আমি তোমার সত্যরূপ বুঝিতে পারি—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।" ৫/১৫/১ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

উপনিষদের যুগের পর আসে ষড়দর্শনের যুগ। সেই যুগে পরজন্ম হইতে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টাই প্রতিপাদ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং জ্ঞানমার্গের দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়। ষড়দর্শন-যুগের পর আসে পৌরাণিক যুগ। ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

হরিবংশ মহাভারতের "খিল" পর্ব বলিয়া উল্লিখিত। হরিবংশের "বিষ্ণু পর্বে" "কৃষ্ণ অবতারের" কথা আছে। ভবিষ্য-পুরাণে কৃষ্ণের কৈলাসযাত্রা, পৌণ্ড্র বাসুদেব বধ, হংস ও ডিম্বক প্রভৃতি বিভিন্ন কাহিনী

লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। হরিবংশ যে সময়ে সঙ্কলিত হয় সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় কৃষ্ণ-লীলা প্রচলিত ছিল। সেই গাথা গাহিয়া স্ত্রীলোকেরা নাট্য-গীত করিত। দ্বারকার কৃষ্ণ-বলরাম, যাদবেরা ও পাণ্ডব বন্ধুরা নৃত্যাভিনয় করিত—"চক্রুর্সন্তাশ্চ তথৈব রাসং তদ্দেশ-ভাষাকৃতি-বেষযুক্তম সহস্ততালং ললিতং সলীলং বরাঙ্গনা মঙ্গলসম্ভৃতাঙ্গাঃ"। ২/৪৭/৭ (অর্থাৎ সুন্দরী মেয়েরা মঙ্গল-বস্ত্রাভরণে ভূষিত হইয়া সে দেশের ভাষায় উপযুক্ত বেশভূষা করিয়া হাসিতে হাসিতে ললিত ভঙ্গিতে হাতে তাল দিতে দিতে রাস (নৃত্য) করিত।

বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণ-লীলার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর প্রথম তিন অবতারের কাহিনী লইয়া কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বরাহপুরাণ রচিত। অপরাপর পুরাণের মধ্যেই কথাকাহিনীর জন্য ভগবত-পুরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দে যে ভক্তিধর্ম বাংলাদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার শাস্ত্রভিত্তি গীতা ও ভাগবত। ভাগবত কৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনায় মুখর।

বৌদ্ধ জাতকগুলির মধ্যে "ঘটপণ্ডিত" জাতকের গাথা গুলিতে কৃষ্ণের শৈশবলীলার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটপণ্ডিত জাতকে বলরাম হইয়াছেন—ঘটপণ্ডিত এবং তিনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ। দুই ভাইকে 'কেশব' বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের খরগোস মরিয়াছে, কৃষ্ণ তাহার শোকে মুহ্যমান হইয়া শুইয়া আছেন। ঘট তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন—

"সোবন্নময়ং মণীময়ং লোহময়ং অথ রূপিয়ময়ং
শঙ্খসিলাপ্রবালময়ং কারয়িস্সামি তে সসং ॥
সন্তি অঞ্ঞেপি সসকা অরঞ্ঞে বনগোচরা।
তে পি তে আনয়িস্সামি কীদিসং সসমিচ্ছসি ॥

(সোনার মণিমানিক্যের, লোহার, কিংবা রূপার, শাঁখের পাথরের পলার শশ তোমাকে করাইয়া দিব। অন্য অনেক শশও আছে অরণ্য বনে

পাওয়া যায়—সেই শশ আনাইয়া দিতে পারি। কি রকম শশ চাও) কন্‌হ (কৃষ্ণ) উত্তর দিল—

"ন চাহমেতে ইচ্ছামি মে সসা পথ বিস্‌মিতা।
চন্দতো সসমিচ্ছামি তং মে ওহর কেশব ॥"

(এসব আমি চাহিনা—যে শশ পৃথিবীতে আশ্রিত। চন্দ্র হইতে আমি শশ চাই, হে কেশব, তাই আমাকে আনিয়া দাও)।

প্রাচীন জৈনশাস্ত্রে কৃষ্ণ ও যদু-বীরদের কাহিনী পাওয়া যায়। ঘোষাণ্ডী-শিলালেখ (খৃঃ পূঃ ২০০) এবং 'নানাঘট' শিলালিপিতেও সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের উল্লেখ আছে। মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূত কাব্যে "গোপবেশিবিষ্ণোঃ" ও গিরি গোবর্দ্ধনের উল্লেখ করিয়াছেন। বাণভট্টের কাব্যেও বিষ্ণু-ভক্তদের উল্লেখ আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বিষ্ণু উপাসকেরা ধীরে ধীরে সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে থাকেন এবং তাঁহারা সমগ্র আর্য্যাবর্তে ছড়াইয়া পড়িতে থাকেন। সমসাময়িক পুরাণগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভক্তিমার্গের ক্ষেত্রে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গি স্থান লাভ করিয়াছে। এই যুগে ভক্ত জিজ্ঞাসু মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া পরম-ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে হৃদয়বৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে। উপনিষদের যুগে বিশ্বসত্তা ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক। পুরাণের যুগে সেই নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বসত্তা ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ঈশ্বর হইয়া ভক্তের নিকট আরাধ্য হইতে থাকেন। এই যুগেই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ আছে তাহাই ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে।

মানুষের অন্তরে তিনটি মৌলিক বৃত্তি আছে—বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি এবং সেবাবৃত্তি। যখন হৃদয়বৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে তখনই স্নেহ মমতা প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। প্রীতির সঙ্গে সেবা বৃত্তিও আগাইয়া আসিতে থাকে। যখন সেবাবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে তখন শুদ্ধ ভক্তি নিবেদন করিয়া ভক্তের জীবন চরিতার্থ লাভ করিতে চায় না, ভক্ত তখন

চান যাঁহাকে ভক্তি করেন তাঁহাকে সেবা করিতে। এই দুই বৃত্তির জাগরণের ফলেই অসীম অনন্ত, ভক্তের নিকট ধরা দেন 'সান্ত' বা সসীম হইয়া।

হৃদয়বৃত্তির মাধ্যমে যে সাধন পদ্ধতি গড়িয়া উঠে তাহার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমতে ঈশ্বরের কোনো স্থান ছিল না। "আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ" অবলম্বনের উপদেশ তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তেরা তাঁহার এই বিরস নীতি অবলম্বন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। যে গৌতম বুদ্ধের মতবাদে ঈশ্বরের কোনো স্থান ছিল না, সেই গৌতম বুদ্ধের শিষ্যেরা তাঁহারই মূর্তি নির্মাণ করিয়া মঠে মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। কেন তাঁহার শিষ্যেরা এইরূপ কার্য করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে হৃদয়বৃত্তি সেবাবৃত্তি কোনো নিরাকার বস্তুকে অবলম্বন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। কাজেই প্রয়োজন হইয়াছিল মূর্তির তথা প্রতীকের। বুদ্ধের 'শূন্যবাদ' ও শঙ্করাচার্যের "মায়াবাদ" এর বিরুদ্ধে তদানিন্তন কালের জনসাধারণের মনে একটা প্রচণ্ড অনাসক্তি-ভাব জাগরূক হইয়াছিল। এবং ইহার বিরুদ্ধে বিষ্ণু-ভক্তেরা করিয়াছেন—প্রচণ্ড প্রতিবাদ। উপনিষদের ঋষি-কবি বলিয়াছেন— "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম" ঐ ঋষি-কবি আরও বলিয়াছেন— "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"।

বিষ্ণুভক্তেরা গ্রহণ করিয়াছিলেন উপনিষদের ঐ মহাবাণী। শূন্যবাদ ও মায়াবাদে পিষ্ট নরনারীর অন্তরে বিষ্ণু-ভক্তেরা জাগাইয়া তোলেন আশার বাণী, প্রচার করেন— এই জগৎ মিথ্যা নহে, মায়া নহে— "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" অর্থাৎ এই বিশ্বসৃষ্টি সেই পরম-পুরুষের লীলা; তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্যমান—[redacted]

"আনন্দরূপমমৃতংযদ্বিভাতি"—মুণ্ডক ২/২/৭

শত-সহস্র অপূর্ণতা নানা বিকার বিকৃতি সত্ত্বেও এই মানবজীবন

বিফল নহে, উপেক্ষণীয় নহে, এই জীবনের মধ্য দিয়াই পারমার্থিক মহাজীবন লাভ করা যাইবে—

"তদ্বিভূতিভূতং জগদপি পারমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে—"

এই বস্তুজগৎ ইন্দ্রিয়ময়জগৎ ও জীবন সেই পরম-পুরুষেরই বিভূতি মাত্র, ইহা তাঁহারই লীলা বা বিলাস।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তজ্জলানীতি (ছান্দোগ্য ॥ ৩/১৪/১) —একমাত্র ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা— বৈষ্ণবেরা তাহা বলেন না, এবং স্বীকারও করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন—ব্রহ্মই জগৎ, জগতই ব্রহ্ম, অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা রহিয়াছেন। তৈত্তিরীয় (৩/৬) উপনিষদের "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" বাণীকে বৈষ্ণব-কবি আরও সহজ করিয়া বলিয়াছেন—

"আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।"

ভগবন্ বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কথা হরিবংশ, বিষ্ণু-পুরাণ, ভাগবত-পুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই স্থানে স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া নব-ভাবনার উদ্রেক করিয়াছে। সেই ভাবনাই হইল বৈষ্ণবতা এবং এই বৈষ্ণব ভাবনা রূপে ও রসে অনবদ্য হইয়া পরবর্তীকালে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে - তাহাই হইল বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য।

—ঃঃ পদ ও পদাবলী ঃঃ—

'পদ' শব্দটির ব্যবহার আমরা সর্বপ্রথমে ভারতের নাট্যসূত্রে দেখিতে পাই— "বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্"

• • • • •

"গান্ধর্বং যন্ময়া শ্রেষ্ঠং স্বরতাল পদাত্মকম্
পদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বরতালানুভাবকম্ ॥
যৎ কিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎ সর্বং পদসঞ্জিতম্
নিবন্ধশ্চানিবন্ধশ্চ তৎ পদং দ্বিবিধং স্মৃতম্"

পরবর্তিকালে মহাকবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যে সঙ্গীত অর্থেই 'পদ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন— "মদগোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা" (উত্তর মেঘ/২৫ নং শ্লোক)। আবার মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে 'কাব্যে' 'বাক্যে' অর্থেও 'পদ' শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন। আলংকারিক দণ্ডীও 'পদ' শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন। বৌদ্ধগান ও দোহাগুলিও পদ (চর্যাপদ) নামে পরিচিত।

মধ্যযুগে নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও 'পদ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। সঙ্গীতের ছয়টি অঙ্গ-- স্বর, বিরুদ পদ, তেনক, পাঠ, তাল।

"পদাবলী" শব্দটির ব্যবহার সম্ভবতঃ জয়দেবই সর্বপ্রথম করেন— "মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং— (গীতগোবিন্দ)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এই 'পদাবলী' শব্দটি জয়দেবের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

পদাবলী, গীতিকবিতা, পদাবলী সঙ্গীত, কিন্তু পদাবলী ভক্তজনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। পদাবলীর নাম "মহাজন পদাবলী" অর্থাৎ মহাজনগণের দ্বারা রচিত, মহাজনগণের দ্বারা আস্বাদিত। সুতরাং পদাবলী সাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ; এবং সাধারণ সাহিত্য পদবাচ্য রচনাগুলি হইতে ইহা পৃথক, একথা অনস্বীকার্য।

"শ্রীহরিনামামৃত" ব্যাকরণের টীকাকার জীবগোস্বামী সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন 'সাহিত্য' অর্থে ভগবদ্ভক্তি, সেই 'সহিততা' হইতে 'সাহিত্য' নিষ্পন্ন। সাহিত্যের বিপরীত শব্দ— "রাহিত্য। এ জগতে

কিন্তু সংখ্যক সমালোচক আছেন যাঁহারা কোনো বস্তুতেই সন্তুষ্ট নহেন এবং বিচার করিবার সময় নেতি নেতি পন্থা অবলম্বন করিয়া বস্তু বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদের মত হইতেছে সমস্তই নির্বিশেষ বা রাহিত্যময়, সাহিত্যময় নহে। কিন্তু বৈষ্ণব-রসবেত্তারা তাঁহাদের ঐ নেতি নেতি মূলক বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিকে একেবারেই আমল দেন নাই এবং 'সাহিত্য' শব্দটির উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন— ফলে 'সাহিত্য' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া বৈষ্ণবদের নিকট একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রেম, প্রণয়, বিরহ ও মিলন মানবজীবনের নিত্যকার ঘটনা, ইহা লইয়াই মানুষের সংসার। বৈষ্ণবপদকর্তারা তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে, তাঁহাদের তত্ত্বদর্শনের মধ্যে, ভগবানের পরিকল্পনার মধ্যে, সংসার ও জীবনের এই মূল ব্যাপারটিকে আগাগোড়াই চরম গুরুত্ব দিয়াছেন। রাহিত্যের পরিবর্তে বৈষ্ণব দৃষ্টিতে সাহিত্যের বিশেষ রূপটি এখানে পরিস্ফুট।

অদ্বৈতের লীলাবিলাসই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবেরা সংসারকে এই দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন বলিয়াই গার্হস্থ্য জীবনের প্রেম, ভালবাসা, সুখ, দুঃখ, মান, অভিমান, মিলন, বিরহ সমস্ত কিছুর মধ্যেই অভিনব অর্থ ও তাৎপর্য করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য— "নরনারীর প্রেমের এই যে একটি মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তিবলে সে মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত চন্দ্র, সূর্য, তারা পুষ্প-কানন, নদ-নদীকে একসূত্রে টানিয়া মধুরভাবে উজ্জ্বলভাবে আপনার চতুর্দিকে সাজাইয়া আনে, যে প্রেমের শক্তি আকস্মিক অনির্বচনীয় আবির্ভাবের দ্বারা এতদিনকার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উপেক্ষিত বিশ্ব-জগৎকে চক্ষের পলকে সম্পূর্ণরূপে কৃত-কৃতার্থ করিয়া তোলে, সেই শক্তিকে যুগে যুগে দেশে দেশে মনুষ্য অধ্যাত্ম-শক্তির রূপক বলিয়া অনুভব ও বর্ণনা করিয়াছে, তাহার প্রমাণ সলোমন, হাফেজ এবং বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলী।" (লোক সাহিত্য)।

পদাবলী সাহিত্যের মহাজনেরা অনেকেই প্রকৃত কবি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন লীলাসঙ্গী। তাঁহারা যেমন লীলাদর্শন করিয়াছেন, যেমন আস্বাদন করিয়াছেন, পদে তাহাই বিধৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুগভীর রসানুভূতি, সুনিবিড় ভাব-সম্ভূতি, অকৃত্রিম আকুতি এবং প্রকাশ ভঙ্গির স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি বৈষ্ণব-কবি-গোষ্ঠীর সহজাত সম্পদ।

আত্মগত সাধনা ও তন্ময়তার মধ্য দিয়া তাঁহারা জীবনকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাই সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরহ-মিলনের পদ যখন তাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্তিগত না হইয়া সমষ্টিগত হইয়া পড়িয়াছে।

বৈষ্ণব-কবিতা ধর্মমূলক কবিতা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের এই ধর্ম হইতেছে প্রেমধর্ম। এই প্রেম সাধারণ প্রেম নহে, অসাধারণ প্রেম। এই প্রেমে কোনো কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার কথা নাই। প্রেমের প্রতিদান পাবার আশাও রাখা হয় নাই। এই প্রেমই তাঁহাদের নিকট বাস্তব সত্য এই প্রেমই তাঁহাদের জগৎ।

এই ধর্মীয় প্রেমের অন্তরালে রহিয়াছে সাধারণ জীবনের প্রেম-ভাবনা। তাই বৈষ্ণব-পদাবলী অবৈষ্ণবদের, অহিন্দুদের প্রাণেও সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। "বৈষ্ণব-কবিতায়" রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলিয়াছেন—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবনগাথা—এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে— একি শুধু দেবতার!

— × —

—ঃ তৃতীয় অধ্যায় ঃ—

(পদাবলী সাহিত্যের প্রেক্ষাপট)

"সকল কালের সকল কবির গীতি"র মূলেই হইতেছে প্রেম। তাই কবি বলিয়াছেন—

"একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি।"

পদাবলী-সাহিত্যের মূল কথা হইতেছে— প্রেম। তাই পদাবলী-সাহিত্যের প্রেক্ষাপটের আলোচনা করিতে গেলে সকল কালের সকল গীতি এবং সকল প্রেমের স্মৃতির আলোচনা অপরিহার্য্য।

নদীতে যেমন চর পড়ে, তারপর বৎসরের পর বৎসর পলিমাটি পড়িয়া মাটিকে শস্য-শ্যামলা সুজলা ও সুফলা করিয়া তোলে ঠিক তেমনি, বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যকে বহু যুগের বহু রসধারা সঞ্জীবিত করিয়া একটি প্রেম ও সৌন্দর্যের আকর সৃষ্টি করিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্য একদিনে বা একযুগে সৃষ্টি হয় নাই, বহুযুগ ধরিয়া ধীরে ধীরে এই অনবদ্য রূপ লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণব-কবিতা বা পদাবলী-সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা, সেই ধারণাটি হইল যে বৈষ্ণব কবিতার মূল প্রেরণা ধর্মের মধ্যে। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতার যথাযথ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে আমাদের এই ধারণাটি সত্য নহে। কারণ বৈষ্ণব-কবিতায় ধর্মের প্রেরণা গৌণ এবং কাব্য-প্রেরণাই ছিল মূল। প্রাচীনকালে রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া বহু সংখ্যক প্রেম কবিতা রচিত হইয়াছে। ঐ সকল কবিতার রচয়িতারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না। রাধা-কৃষ্ণ ছিলেন মর্ত্ত-ভূমিরই

অধিবাসী। সেই সকল কবির নিকট রাধা-কৃষ্ণ ছিলেন 'আলম্বন বিভাব' মাত্র। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী আভীর জাতির মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এবং সেই কাহিনীই কালক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। রসজ্ঞ কবিকুল রস নিবেদন করিতে গিয়া রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তবে কালক্রমে স্থানে স্থানে ঐ প্রেম-কাহিনীর উপ- দৈবীভাব আরোপ করা হইয়াছিল— তাহা অস্বীকার করা চলে না।

প্রাচীন কবি-কুলের রচনাকে বাদ দিয়া দ্বাদশ শতাব্দী হইতে প্রেম বিষয়ক কবিতাগুলির আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই- যে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম-কবিতার প্রেক্ষাপটে প্রকীর্ণ-কবিতার প্রভা- অপরিসীম।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃত 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত' গ্রন্থে একটি অধ্যাত্মভাব প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ছিল তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ভারতীয় সভা-সাহিত্যের যিনি উদ্বোধক এবং ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে (বিশেষতঃ বাংলা ও গুজরাটী সাহিত্যের) যাঁহাকে সর্বপ্রথম বন্দন করিতে হয় তিনি হইতেছেন— জয়দেব গোস্বামী। জয়দেব গোস্বামী তাঁহার 'গীত-গোবিন্দে' কি অধ্যাত্ম সুরের উচ্চগ্রামে পৌঁছাইতে পারিয়াছিলেন। তাহা পারেন নাই বলিয়াই পণ্ডিত মহলে অনেকের বিশ্বাস জয়দেব নিজেও কাব্যারম্ভে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্
মধুরকোমলকান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ (১-৩ গীতগোবিন্দ)

অর্থাৎ যদি হরিকে স্মরণ করিয়া মনকে সরস করিতে চাও, অথবা যদি বিলাসকলা সম্বন্ধে কৌতূহলী হও তবে জয়দেব সরস্বতী রচিত মধু-

কোমলকান্ত পদাবলী পাঠ কর। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য— "জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়— তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়।"

জয়দেব যেখানে দশ অবতারের বন্দনা করিয়াছেন সেখানে আদিরসের গন্ধটুকু নাই ঠিক, কিন্তু তাঁহার এমন বহু সংখ্যক পদ রহিয়াছে যেখানে অধ্যাত্মবাদের অন্তরালে বাস্তববাদের রূপটি চাপা পড়ে নাই। রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিলাসের মধ্যেও নরনারীর বিলাস রূপটি প্রস্ফুটিত—

"হরিচরণশরণ জয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী" (৭-১০ গীতগোবিন্দ)

হরিচরণই যাঁহার শরণ এমন জয়দেব কবির কবিতা কোমলকলাবতী যুবতীর ন্যায় সকলের অন্তর জয় করুক।

অথবা—

"দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্" (৮/৬ গীতগোবিন্দ)

(তোমার অধরে এখনো সেই রমণীর প্রেম দংশন চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে, আমার দেহমন ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এখনো তুমি বলিতে চাও যে তোমার আমার দেহ অভিন্ন)। এই আর্তি দৈবীভাবাপন্ন নহে। সম্পূর্ণ মানবিক।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাঠামোটি পূর্ববর্তী প্রেম-কবিতার মধ্য হইতে গৃহীত একথা সত্য। পদাবলী সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে প্রকীর্ণ কবিতার প্রকাশভঙ্গির একটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পদাবলী সাহিত্যে রাধার বয়ঃসন্ধি, মিলন-বিরহ, মান-অভিমান, আক্ষেপ, অভিসার প্রভৃতি ধারার বিভিন্ন পদ রহিয়াছে, প্রকীর্ণ কবিতার মধ্যেও

অনুরূপ ধারা বিদ্যমান। প্রকীর্ণ কবিতার কবিগণ সম্ভোগকেই প্রধান করিয়া প্রেম-কবিতা রচনা করিয়াছেন আর বৈষ্ণব পদকর্তারা বিরহকে প্রধান করিয়া প্রেমের মধ্যে সূক্ষ্মতা এবং গভীরতার পরিচয় দিয়াছেন, উপরন্তু বৈষ্ণব-পদকর্তারা প্রাকৃত প্রেমের উপর একটি অপ্রাকৃত প্রেমের রূপ সৃষ্টি করিয়া দেহ হইতে দেহাতীতে যাত্রার নির্দেশ দিয়াছেন।

রাধা কিভাবে প্রাকৃত অবস্থা হইতে অপ্রাকৃত অবস্থায় উন্নীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করিতে গেলে প্রাকৃত নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে হইবে। প্রকীর্ণ কবিতার প্রাচীনতম সংকলন হইতেছে "অমরুশতক"। অমরুর পরিচয় অজ্ঞাত, ভণিতায়ও অমরুর নামোল্লেখ নাই। অমরুশতকে পাই—

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ,
স্ত্বয়া কান্তে মানঃ কিমিতিসরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাশ্লিষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥ ২৩০

ইহা মানিনীর প্রতি সখীর ভর্ৎসনা। প্রেমের পরিণতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সখীদের বাক্য অবহেলা করিয়া নির্বোধের মত কেন তুমি প্রিয়তমের উপর মান করিলে? বিরহদহনে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা অঙ্গাররাশি তুমি ত নিজেই আলিঙ্গন করিয়াছ, তবে এখন বৃথা রোদন করিয়া লাভ কি? তুলনীয়—

"সুন্দরী তোহে সমঝায়ব কোই
অব রহু নিরজনে বনমাহা রোই"। (গোবিন্দ দাস)

শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত প্রকীর্ণ কবিতার অপর গ্রন্থ "সদুক্তিকর্ণামৃত"। সদুক্তিকর্ণামৃত (কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়) এ পাই—

...ষ্টো ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহা স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যাভিসৃতঃ।

ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভূমি ন গোবর্দ্ধনগিরে
ন কালিন্দ্যাঃ (কূলে) নচ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ ॥ হরিব্রজ্যা, ৩৪।

রাধা মান করিয়াছেন। কৃষ্ণ নির্বিঘ্ন হইয়া রাধার নিকট আসিতেছেন না। রাধা দূতীকে কৃষ্ণ অন্বেষণে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু দূতী কৃষ্ণকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, পরিশেষে দূতী আসিয়া রাধার নিকট নিবেদন করিল যে কৃষ্ণকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমি গোবর্দ্ধনের-তটভূমিতে, কালিন্দী নদীর কূলে, বেতসকুঞ্জে খুঁজিয়া দেখিয়াছি। উক্ত সংকলিত গ্রন্থে পাই—

ধৌতং কেন বিলেপনং কুচযুগে কেনাঞ্জনং নেত্রয়ো
রাগঃ কেন তবাধরে প্রমথিতঃ কেশেষু কেন স্রজঃ
তেনা (শেষজ) নৌঘকল্মধমুষা নীলাব্জভাসা সখি
কিং কৃষ্ণেন ন যামুনেন পয়সা কৃষ্ণানুরাগস্তব। ঐ ৫১২

[স্তনযুগলের বিলেপন কে মুছাইয়া দিল ? চোখের কাজলই বা কে ঘুচাইল, তোমার অঙ্গরাগ কে প্রমথিত করিল, কবরীতে মালাই বা নাই কেন ? সখি (এ কাজ হইয়াছে) সেই অশেষ জন-সমূহের মালিন্য বিধ্বংসী নীলপদ্ম কান্তির দ্বারা, কি কৃষ্ণের দ্বারা ? না যমুনার জলে ? তোমার কৃষ্ণ বর্ণেই অনুরাগ।]

উপরিউক্ত পদটির সঙ্গে জ্ঞানদাসের একটি পদের তুলনা করা যাইতে পারে—

অবহুঁ রভস রস কয়লহুঁ ধাধস
যামর দুপর বেলি
উলটল কবরী, সম্বরে নাহি অম্বরে,
কহ কেবা গারী বা দেলি। ইত্যাদি

কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে "অভিসার-সাধনা"র এই শ্লোকটি আছে—

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দসঞ্চারকং

গন্তব্যা দয়িতস্য মেঽদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্ ।
আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধ-পদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি । ৫১৯

(পঙ্কিল পথে মেঘান্ধতমসার মধ্যে নিঃশব্দ-চরণে আজ আমাকে দয়িতের বাসস্থানে যাইতে হইবে ; এইরূপ স্থির করিয়া জনৈকা মুগ্ধা রমণী নূপুরকে জানু পর্যন্ত তুলিয়া দিয়া, নয়নযুগল করতলে ভালভাবে আচ্ছাদিত করিয়া অতিকষ্টে পদস্থিতি লাভ করিয়া নিজের ঘরেই পথের অভ্যাস করিতেছে ।

গোবিন্দ দাসের অভিসারের একটি পদে ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

"কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চিরহি ঝাঁপি
গাগরি— বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি আঙ্গুলি চাপি ।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি ॥
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে ।
কর কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে ॥

প্রাকৃত প্রেম-কবিতার সঙ্কলনগ্রন্থ হালের 'গাথা সপ্তশতী'তে প্রাকৃত প্রেমের বহু পদ আছে—

ণইউরসচ্ছহে জোব্বণম্মি অইপবসিএসু দিঅসেসু ।
অণিঅত্তাসুঅরাঈসু পুত্তি কিং দড্ঢমাণেণ ॥ ১/৪৫

(রমণীর যৌবন যেন নদীর জল, দিন প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, রাত্রিও যাইতেছে, যাহা যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবেন না, সুতরাং অভিমান করিয়া লাভ কি ?)

তুঃ— কাল বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাটা
তাহারে কেমন রাখি। ইত্যাদি (চণ্ডীদাস)

আরও কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বিষয় বস্তুটিকে যথাযথ বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে—

অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি গণরীএ।
পঢ়ম ব্বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিঁ চিত্তলিও॥ ৩।৮

(নায়িকা প্রবাসী প্রিয়ের জন্য কাল ক্ষেপণ করিতেছে, প্রিয় আজ গিয়াছে, আজ গিয়াছে, এইরূপ গণনা করিতে করিতে দিবসের প্রথমার্ধেই বিরহিণী রেখায় রেখায় দেয়ালটিকে চিত্রিত করিয়া দিয়াছে।

তুঃ— কালিক অবধি করিঅ পিয়া গেল
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল
ভেল প্রভাত কহত সবহিঁ
কহ কহ সজনি কালি কবহিঁ॥ বিদ্যাপতি

বিরহের দিবসগণনার আর একটি পদ—

হত্থেসু অ পাএসু অ অঙ্গুলিগণণাই অইগ আ দিঅহা।
এণ্হিং উণ কেণ গণিজ্জউ ত্তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা॥ ৪/৭

(হাতের এবং পায়ের আঙ্গুল দিবস গণিতে গণিতে শেষ হইয়াছে এখন আর কিভাবে দিবস গণিবে এই কথা বলিয়া মুগ্ধা কাঁদিতেছে।) এই প্রিয় বিরহের দিবস গণনা প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব-পদকর্তার পদে নানা ভাবে পাওয়া যায়—

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি নখর খোয়াওল
বিছুরল গোকুল নাম॥ বিদ্যাপতি

প্রেমের এক প্রকারের বিকার— দেহবিকার ঢাকিতে গেলে অন্যবিকার আসিয়া পড়ে—

"জস্স জহিং বিঅ পঢ়মং তিস্সা অঙ্গম্মি ণিবডিআ দিট্ঠী
তস্ম তহিং চেঅ ঠিআ সব্বঙ্গং কেণ বিণ দিট্ঠং। গাথাপ্রস্তশতী ৩/৩৪

দেহের অপর অংশে দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই, শুধু একদিকেই দৃষ্টিপাত করিয়াছি।

তুঃ— "সখি ভালকরি পেখন ন ভেল"। বিদ্যাপতি

প্রতীক্ষমানা নায়িকার চিত্র হিসাবে পাই—

সাতুহ কএণ বালঅ অনিমং ঘরদারতোরণ-ণিসণ্ণা
ওস্সই বন্দণমালিঅ ব্ব দিঅহং বি অ বরাঈ। গাথা সপ্তসতী/৩/৬২

(তোমার আশাপথ চাহিয়া তোমার প্রিয়া বাসীফুলের মালার মত শুকাইয়া যাইতেছে)

তুঃ— ইহ মধু সময় পুরবে রস খেল
সোঙরি সোঙরি ধনি ঝামর ভেল

অথবা

রথাপইন্নণঅণপ্পলা তুমং সা পড়িচ্ছএ এন্তম
দারণিহিং এহিঁ দোহিঁ বি মঙ্গলকলসেহিঁ ব থনেহিঁ। গাথা সপ্তশতী ২/৪০

(তোমার আসার জন্যই মঙ্গল আয়োজন করা হইতেছে, তোমার আসা পথের দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইয়া আছে এবং তাহার স্তনযুগ যেন মঙ্গল কলসের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তোমাকে জানাইতেছে—সুস্বাগতম্

তুঃ— পিয়া যব আওব ই মঝু গেহে
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে
কনআ কুম্ভ করি কুচযুগ রাখি,
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥ বিদ্যাপতি

"পত্তাণঅম্বপফংসা ণ হাণুত্তিগ্নাএ সামলঙ্গীএ॥
জলবিন্দুএহিঁ চিহুরা রুঅন্তি বন্ধস্স ব ভএণ॥ গাথা সপ্তশতী ৬/৫৫

(স্নানান্তে তরুণীর মুক্ত চিকুররাশি নিতম্বদেশে পড়িয়াছে; ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছে মনে হইতেছে যেন কেশরাশি বন্ধনের ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে)

তুঃ— নাহিয়া উঠিতে নিতম্বতটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি
কালিয়া আঁধার কনক চাঁদায়
শরণ লইল আসি।

বিরহ বিসং ব বিসমা অমঅ মআ হোই সংগমে অহিঅম্
কিং বিহিণা সমঅং বিঅ দোহিং বি পিয়া বিণিম্মঅআ। ঐ

(প্রিয়ার বিরহে গরল ও মিলনে অমৃত, বিধি কি উভয় মিশ্রণ করিয়া তাহাকে নির্মাণ করিয়াছেন)।

তুঃ— নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ। চণ্ডীদাস।

অথবা

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়। চণ্ডীদাস।

'সদুক্তিকর্ণামৃত' এ উদ্ধৃত অমর সিংহের নামে ধৃত শ্লোকে পাই—

কুচৌ ধত্তঃ কম্পং নিপততি কপোলঃ করতলে
নিকামং নিঃশ্বাসঃ সরলমলকং তাণ্ডবয়তি।
দৃশঃ সামর্থ্যানি স্থগয়তি মুহুর্বাষ্প-সলিলং
প্রপঞ্চোঽয়ং কিঞ্চিত্তব সখি হৃদিস্থং কথয়তি। ২/২৫/১

(তোমার কুচযুগ কম্পিত হইতেছে, কপোল করতলে নিপতিত হইতেছে নিঃশ্বাস বায়ু সরল অলককে প্রবলভাবে সঞ্চালিত করিতেছে, মুহুর্মুহুঃ বাষ্পসলিল তোমার দৃষ্টি-শক্তিকে নিরুদ্ধ করিতেছে, এই সকল প্রপঞ্চ হে সখি, তোমার হৃদয়স্থিত (ভাবকেই) বলিয়া দিতেছে)।

শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে পাই—

"গোপায়ন্তি বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরূণাং
কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিসৃতং বাষ্পপূরং রুণৎসি।
নক্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আদ্রীকৃতস্তে
শয্যোপান্তঃ কথয়তি দশামাতপে দীয়মানঃ। (১০৯৫ নং)

(গুরুজনের অগ্রে বিরহজনিত দুঃখ গোপন করিতে করিতে, হে মুগ্ধে, কেন তুমি নয়ন বিগলিত বাষ্প-প্রবাহকে রুদ্ধ করিতেছ? রাত্রিতে রাত্রিতে নয়ন সলিলের দ্বারা আদ্রীকৃত এই যে তোমার শয্যাপ্রান্ত— যাহা তুমি রৌদ্রে দিয়াছ— তাহাই তোমার দশার কথা বলিয়া দিতেছে)

উপরিউক্ত পদ দুইটি পূর্বরাগে বিধুরা রাধার কথাকেই বার বার স্মরণ করাইয়া দেয়—

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব
করতলে সঘন বয়ন অবলম্ব॥
খেনে তনু মোরসি করি কত রঙ্গ
অবিরল পুলক-মুকুলে ভরু অঙ্গ॥

দূরে রহু গৌরব গুরুজন লাজ
গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ ॥ গোবিন্দ দাস

অথবা

কি তহুঁ ভাবসি রহসি একান্ত
ঝর ঝর লোচনে হেরসি পন্থ ॥
কহ কহ চম্পক-গোরী
কাঁপসী কাহে সঘন তনু মোড়ি ॥ রাধমোহন দাস।

সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর অবস্থা সম্বন্ধে পাই—

পদভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং
শ্রোণীবিম্বং ত্যজতি তনুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ।
ধত্তে বক্ষঃ কুচসচিবতামদ্বিতীয়ং চ বক্তুং
তদ্‌গাত্রাণাং গুণ-বিনিময়ঃ কল্পিতো যৌবনেন ॥ ২/২/৪

(পদযুগল চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছে ; লোচনদ্বয় তাহার আশ্রয় লইয়াছে ; শ্রোণীবিম্ব তনুতা ত্যাগ করিয়াছে, মধ্যভাগ (কটিদেশ) এখন তাহাকে সেবা করিতেছে, বুক এখন (মুখকে ত্যাগ করিয়া) কুচযুগের সচিবতা গ্রহণ করিয়াছে, ফলে মুখ এখন অদ্বিতীয় (পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় আবার স্ব-মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দ্বিতীয় বিরহিত। এইভাবে যৌবন আসিয়া তাহার গাত্রসকলের গুণ বিনিময় করিয়া দিয়াছে)।

শতানন্দের আর একটি শ্লোকে পাই—

গতে বাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সায়কহতং
ভয়াদ্বীক্ষৈত্বাস্যাঃ স্তনযুগমভূন্নির্জিগমিষু।
সকম্পা ভ্রূবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং
কৃশং মধ্যং ভুগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ ॥ ২/২/৫

বাল্য গত হইলে চিত্ত কুসুমধনু (মদনের) দ্বারা সায়কহত হইয়াছে,

ইহা দেখিয়া ইহার জঘনযুগল ভয়েই যেন নির্গত বা নিষ্ক্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে, ভয়ে ভ্রূযুগলী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকুহরের দিকে চলিতেছে মধ্যভাগ কৃশ হইয়া গিয়াছে ; বলি বক্রতা লাভ করিয়াছে, নিতম্বযুগল অবসন্ন হইয়াছে।)

তুঃ — সৈসব যৌবন দরসন ভেল
দুহুপথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥
মদনক ভাব পহিল পরচার
ভীনজন ভেল ভীন অধিকার। বিদ্যাপতি

অথবা

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন।
আবে মদন বঢ়াওল দীঠ
সৈসব সকলি চমকি দেলপীঠ।" বিদ্যাপতি।

বিরহের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে বিরহিনীর মধ্যে বৈরাগ্যের ভা- প্রসরতা দেখা দিয়াছে। রাজশেখরের পদে পাই—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনং চেদমিদ চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতিতে
তদ্‌ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভো কিংবা বিয়োগিন্যসি ॥

(তোমার আহারে বিরত, সমস্ত বিষয় গ্রামে পরা নিবৃত্তিঃ আর তোম নাসাগ্রে নয়ন, মন একতান, এই তোমার মৌন, এই যে অখিল বি- তোমার নিকট শূন্য বলিয়া আভাত হইতেছে, হে সখি আমাদের • তুমি কি তাহা হইলে যোগিনী হইলে, না বিয়োগিনী (বিরহিনী) হইলে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কৃত অনুবাদ]

তুঃ— "বিরতি আহারে রাঙা বাস পড়ে
যেমতি যোগিনী পারা" —চণ্ডীদাস

দামোদর মিশ্রের (? সদুক্তিকর্ণামৃতে ধর্ম্মপাল রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে)—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগর-ভূধরাঃ'

তুলনীয়—

"চীর চন্দন উরে হার ন দেল"
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেল" —বিদ্যাপতি।

মম্মট ভট্টের 'কাব্য প্রকাশে'র অষ্টম উল্লাসে পাই—

অপসারয় ঘনসারং কুরু হারং দূর এব কিং কমলৈঃ
অলমলমালি মৃণালৈরিতি বদতি দিবানিশং বালা॥

তুঃ— "শঙ্খ কর চূর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডারহে॥"

তুঃ— আলোকমলকাবলিং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎ কুণ্ডলম
কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং শীকরৈঃ

তুঃ— বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদ বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণ দুলিত ভেল,
ঘাম তিলক বহি গেলা॥ —বিদ্যাপতি

তন্ব্যা যৎ সুরতান্ততান্তনয়নং বক্ত্রং রতিব্যত্যয়ে
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ॥

অবহট্‌ঠ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই উত্তরাপথের সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী

সাধুভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাষায় জৈনদের পুস্তকও রচিত হইয়াছে। বাংলা দেশের বৌদ্ধ বজ্রযানিক ও শৈব নাথপন্থীযোগী সিদ্ধাচার্য্যেরা এই ভাষায় তাঁহাদের শিক্ষাপদ, কড়চা, বহু ছড়া-গান রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল রচনার মধ্যেও পদাবলী সাহিত্যের পূর্বাভাস লক্ষিত হয়—

"রাঈ দোহড়ী পঢ়ণ শুনি হসিউ কণ্হ গোআল
বৃন্দাবন ঘনকুঞ্জ-ঘর চলিউ কমণ রসাল।"

(রাধার ছড়া আবৃত্তি শুনিয়া কৃষ্ণ গোপাল হাসিতে লাগিলেন এবং রসাল পদক্ষেপে বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জ-গৃহে প্রবেশ করিলেন)
রাধাকৃষ্ণ কাহিনী অবহট্‌ঠে যে ছিল ইহাই তাহার প্রমাণ। পদবলী সাহিত্যে রাধার বয়ঃসন্ধির বর্ণনার পূর্বাভাসও পাই অবহট্‌ঠে রচিত কবিতায়—

থনহি উংচউ কিঅউ রাউল
তরুণা জোবত্ত করই গো বাউল
পহিরণ ফরহয়ে পর সোহই
রাউল দীসত সউ জণু মোহই জ
জহি ঘর অইসী উলগ পইসই॥
তংঘরু বাউল জইসঙ দীসই॥"

(জনদ্বয়ের যে রক্তিমতা উচ্চতা তাহা তরুণের দৃষ্টিতে পড়িলে তাহাকে পাগল করে········ ······পরিধানে সূক্ষ্ম (?) বস্ত্র, অত্যন্ত শোভা পায়, রক্তি দেখিলে সবজন মোহিত হয় * * যাহার গৃহে এমন (তরুণী) ভোগের জন্য প্রবেশ করে, সে ঘর যেন রাজবাড়ীর মত দেখায়—

অনুবাদ— ডঃ সুকুমার সেন
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড

রূপানুরাগের পূর্বাভাস—

সুতের হার রোমাবলি কলিঅউ
জানি গাঙ্গহি জনু জউণহি মিলিঅউ
রড়ু দেখি তারউ সব জনু খীজই
ধবল রে কাপড় উঢ়িঅল কইসে
মুহ-শসি জোণ্হ পসারেল জইসে
তাইসী গউড়ি জ রাউলে পইসই
সো জনু লাছি মা ডেউ দীসই"

(সুতার হার রোমাবলীতে লাগিয়া আছে; যেন গঙ্গা হইতে জল (ধারা) যমুনায় মিলিয়াছে * * তাহার রূপ দেখিয়া সকলে খেদ করে। শাদা কাপড় কেমন পড়িয়াছে, যেন মুখশশী জ্যোৎস্না বিস্তার করিয়াছে। এমন গৌড়দেশী কন্যা যে রাজকুলে প্রবেশ তবে সে (রাজকুল) যেন লক্ষ্মীদ্বারা মণ্ডিত দেখায়"।

(অনুবাদ : ডঃ সুকুমার সেন
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / ১ম খণ্ড)

কাঅ হউ দুব্বল তেজ্জি গরাস
খণে খণে জানিঅ অচ্ছ ণিসাস।
কুহুরব তার দুরন্ত বসন্ত
নিন্দঅ কাম কি নিন্দঅ বসন্ত।"

(শরীর দুর্বল, আহার্য পরিত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে নিঃশ্বাস পড়িতেছে, কুহুরব তীব্র, কান্ত দুরন্ত। কাম নিন্দ'য় কি কান্ত নিন্দ'য় বুঝিতে পারিতেছি না।" অনুবাদ ডঃ সুকুমার সেন, ঐ।

পদাবলী সাহিত্যে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

"বিরহ অনলে দাহি বিবরণ অঙ্গ
বিষম বসন্ত তাহে মদন তরঙ্গ

রোই রোই কি কথয় কুচ-নাই জান
জনু পরলাপ কবিশেখর ভাণ॥" —কবি শেখর

গজ্জই মেহ কি অম্বর সামর
ফুল্লই নীব কি বুল্লই ভামর।
একল জীঅ পরাহিণ অম্মহ
কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ।

(মেঘ গর্জন করিতেছে. অম্বর কি শ্যামল? নীপ ফুটিয়াছে ভ্রমরগণ কি গুঞ্জরণ করিতেছে আমার জীবন পরাধীন ও আমি একলা, প্রাবৃষ ক্রীড়া করুক এবং মদনদেব করুন— ক্রীড়া)

তুলনীয়—

গগনে গরজে মেঘ ফুকরে ময়ূর
একলি মন্দিরে হাম পিয়া বহুদূর।
শুন সখি আমারি বেদন
বড় দুখ দিল মোরে দারুণ মদন"। —বিদ্যাপতি

প্রেমের ধারায় সখিরা প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে। পদাবলীর কৃষ্ণ যে রাধার পা ধরিয়াছে— তাহাও নূতন নহে। কারণ জয়দেবের কৃষ্ণ— "দেহিপদপল্লবমুদারম্" বলিয়াছেন, দুষ্মন্তও শকুন্তলার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন। অমরু শতকে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রকীর্ণ কবিতায় মান-অভিমানের যেমন পদ আছে, তেমনি অভিসারের পদের অভাব নাই—

"ক্ব প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয় মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
নম্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ॥" কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় ৫০১

(এই ঘন নিশীথে, হে, করভোরু তুমি কোথায় যাইতেছ?

অভিসারিণী উত্তর দিল— প্রাণের অধিক প্রিয় যেখানে আছে সেখানে যাইতেছি।

প্রশ্ন— হে বালা, তুমি একাকিণী যাইতে ভয় পাইতেছ না কেন?

উত্তর— কেন! পুঙ্খিতশর মদনই আমার সহায় রহিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতায় যেমন অভিসারের কথা বলিতে গিয়া দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, সদুক্তিকর্ণামৃতেও অনুরূপ অভিসারের পদ রহিয়াছে—

"অবলোক্য নর্তিতশিখণ্ডিমণ্ডলৈ—
র্নবনীরদৈরভিনিচুলিতং নভস্থলম।
দিবসেঽপি বঞ্জু নিকুঞ্জমিত্বরী
বিশতিস্ম বল্লভবতংসিতং রসাৎ॥ ২ / ৬৩ / ১

(ময়ূর মণ্ডলের নৃত্য-প্রবর্তক নবীন মেঘের দ্বারা নভস্থল আবৃত দেখিয়া অভিসারিকা দিবসেই রসবশে বল্লভভূষিত বঞ্জুলকুঞ্জে প্রবেশ করিল)।
তুলনীয়—

গগণাহি নিমগন দিনমণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনপাতি॥
ঐছন জলদ করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার।
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥ গোবিন্দ দাস।

এমনি করিয়া রাগ, অনুরাগ, বিরহ-মিলন প্রভৃতি বৈষ্ণব-পদের সর্ব প্রকারের পদের সঙ্গে আমরা প্রাকৃত অবহট্‌ঠি, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষায় রচিত কবিতাগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখান যাইতে পারে এবং সাদৃশ্যই প্রমাণ করে যে বৈষ্ণব-পদের উপর ঐ প্রেম-কবিতাগুলির প্রভাব অপরিসীম।

বৈষ্ণব-কবিতার দূতী যে প্রাকৃত-কবিতার সখীর রূপান্তরিত সংস্করণ তাহাও অনুমান করিতে কোনো অসুবিধার কারণ নাই। ইহাই শাশ্বত ভারতীয় রীতি। প্রেম-তরুর অংকুরকে জল-সিঞ্চন করিয়াই ফল-ফুল সম্ভারে বর্ধিত করা হইয়াছে। সখীরা প্রেমের অংশীদার নহে, তাঁহারা প্রেমকে গড়িয়া ভাঙিতে এবং ভাঙিয়া গড়িতে সিদ্ধ; এবং এই ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়াই প্রেম-রসকে দূর হইতে আস্বাদ করিতে তাহারা লালায়িত। ভারতীয় সাহিত্যের সেই সখীদের লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের লীলা-সহচরী সখীগণের এবং এই সখীভাবের সাধনা। প্রেমের খেলায় সখীরা যে কৃষ্ণকে দিয়া রাধার পা ধরাইয়াছে তাহাও কিছু নূতন নহে— "দেহি পদপল্লবমুদারম্" ভারতীয় নায়কদের চিরন্তন অনুনয়। সদুক্তিকর্ণামৃতে পাই—

সুতনু জহিহি মৌনং পশ্য পদানতং মাং
ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবং বিধোঽভূৎ
ইতি নিগদতি নাথে তির্যগামীলিতাক্ষ্যা
নয়নজলমনল্পং মুক্ত মুক্ত ন কিংচিৎ॥ ২/৫০/৫

(হে সুতনু তোমার মৌন ত্যাগ কর, পদানত আমার দিকে চাহিয়া দেখ; তোমার ত কোনদিন এইরকম কোপ হয় না। নাথ এই কথা বলিলে তির্যক ভাবে ঈষৎ অমীলিতাক্ষী প্রচুর অশ্রু মোচন করিল,—কিছুই বলিতে পারিল না। অনুবাদক— ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত)। জয়দেব হইতে সুরু করিয়া পরবর্তীকালের সমস্ত বৈষ্ণব পদকর্তারা ঐ ধারারই উত্তর-সাধক। এ সম্পর্কে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের এই মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—

"রাধা হইল ভারতীয় কবি-মানস ধৃত নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যত শৃঙ্গার বর্ণনা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণই ভারতীয়

কাব্য-সাহিত্য এবং রতি শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। * * * পরবর্তীকালে গৌড়ীয় গোস্বামীগণ কর্তৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়া সহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, কায়া ও ছায়া অবিনাবন্ধভাবে একটা মিশ্র রূপের সৃষ্টি করিয়াছে।"

("শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে)।

চতুর্থ অধ্যায়

[রাধা-কৃষ্ণ কাহিনী ও রাধাবাদ]

রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী

পদাবলী সাহিত্য ধর্মীয় সাহিত্য এবং মূল বিষয়বস্তু হইতেছে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস কাহিনী। বৈষ্ণবদের নিকট কৃষ্ণ ভগবান্ এবং রাধা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। অথচ প্রাচীন বৈষ্ণব-শাস্ত্রে রাধার কোনো উল্লেখ নাই। পদ্মপুরাণ মৎস্যপুরাণ, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই পুরাণগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই প্রশ্ন হইতেছে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী কিভাবে গড়িয়া উঠিল? এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী একদিনে বা একযুগে গড়িয়া উঠে নাই। শ্রীরাধাও একদিনে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে প্রবেশ করেন নাই। কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে রাধা সম্পৃক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন— আভীর গোপজাতির মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই যুবক কৃষ্ণ এবং চপল গোপযুবতীদিগকে লইয়া আদিরসাত্মক প্রণয়-কাহিনী প্রচলিত ছিল। এবং কৃষ্ণ ও গোপীকাদের এই প্রেম-কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই প্রেম-কাহিনী সঙ্গীত ও ছড়ার মধ্যে দিয়াই সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দে সংগৃহীত সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে পাই— "বৎস ত্বং নবযৌবনোঽসি চপলাঃ প্রায়েণ গোপস্ত্রিয়ঃ (" কৃষ্ণ যৌবনম্ ৩।)

কৃষ্ণ-প্রিয়তমা প্রধানা গোপীর প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আলবারগণের গানগুলি স্মরণযোগ্য। আলবারগণ ঠিক কখন

যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। তবে তাঁহারা সপ্তম হইতে নবম শতাব্দী মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন— ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন।[১]

আলবারগণ আপনাকে নায়িকা এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নায়ক মনে করিয়া রাগমার্গে ভজনা করিতেন। আলবারদের রচিত গ্রন্থে বিষ্ণুর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার বহুস্থানেই বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারে বৃন্দাবন-লীলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কৃষ্ণের গোপীদের সহিত লীলার কথাও ঐ সকল গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। আলবারগণ রচিত গানগুলির মধ্যে গোপীমুখ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই গোপীমুখ্যা, রাধা নহেন— নাপ্পিন্নাই নাপ্পিন্নাই একটি ফুলের নাম এই নাপ্পিনাই কৃষ্ণের নিকট আত্মীয় এবং নাপ্পিন্নাই যে লক্ষ্মীর অবতার তাহারও নিদর্শন আছে—
Daughter of Nandagopal, who is like A lusty elephant who fleeth not with shoulders strong : Nappinnai thou with hair Diffusing fragrance, open thou the door.

* * * *

O Lady Nappinni, with tender breasts like unto little cups with lips of red, and slenden : waist, Laksh'mi awake from sleep".[১]

(Hymns of the Alvars : S. M. Hooper)

নাপ্পিন্নাই রাধার মত গজগামিনী, গৌরী এবং সৌন্দর্য্য প্রতিমা।

আমরা প্রাচীন সাহিত্যে রাধার প্রথম উল্লেখ পাই হালের গাথা সপ্তশতীতে।[২] হাল সাতবাহন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠানপুরে রাজত্ব করিতেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া ঐ প্রেম-কবিতা-গ্রন্থ সঙ্কলন

---

১. *Early History of Vaisnavism in South India. S Ayenger & the Divine Wisdom of the Divine Wisdom Govindacarya.*

২. "গাহা—সত্তসঈ"।

করাইয়াছিলেন।[১] তিনি নিজে সঙ্কলয়িতা কিনা ইহা লইয়াও মতভেদ আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কবি বাণভট্ট তাহার কাব্যে হালের উল্লেখ করিয়াছেন।

হালের ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণের ব্রজলীলা সম্পর্কে কয়েকটি পদ আছে এবং একটি পদে রাধার উল্লেখ আছে—

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো
এতাণং বলবীণং অন্নাণং বি গোরঅং হরসি''। ১৮৯

(হে কৃষ্ণ তুমি মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজ (ধূলিকণা) অপনয়ন করিয়া এই বল্লবীগণের ও অন্য সকল নারীগণেরও গৌরব হরণ করিতেছ।)

(অনুবাদক : ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত / শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— দর্শনে ও সাহিত্যে) পৃঃ ১২৪.

পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে যে যুগলমূর্তি আছে তাহা রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার বহু দৃশ্যের সঙ্গে এই যুগল-মূর্তিটির সাদৃশ্য আছে। পুরুষ মূর্তিটি যে কৃষ্ণের— এ বিষয়ে কেহই কোনো সংশয় প্রকাশ করেন নাই তবে নারী মূর্তিটি রাধার মূর্তি, কি রুক্মিণীর মূর্তি না সত্যভামার মূর্তি তাহতে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

বেণী-সংহার নাটকের নান্দী শ্লোকে নাট্যাকার ভট্টনারায়ণ কালিন্দী পুলিনে রাসের সময় কেলিকুপিতা, অশ্রুসিক্তা রাধা এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—

"কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্" ॥

১। তাঁহার আবির্ভাবকাল সঠিক নির্ণীত হয় নাই এ সম্পর্কে মতদ্বৈত আছে।

আলংকারিক বামন তাঁহার অলংকার গ্রন্থে ভট্টনারায়ণের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় ভট্টনারায়ণ বামনের পূর্ববর্তী কবি। বামন নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আনন্দ বর্ধন ধ্বন্যালোকে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ।

(হে ভদ্র, সেই গোপবধূগণের বিলাস-সুহৃদ এবং রাধার গোপন সাক্ষী কালিন্দী-তীরবর্তী লতাগৃহগুলির কুশল ত ? স্মরশয্যা কল্পনবিধির জন্য ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। (ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়েও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ৫০১ নং)

ধ্বন্যালোকে অপর এক অজ্ঞাত কবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সেই পদটি রাধার বিরহের পদ—

যাতে দ্বারবতীং পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভি র্জলচরৈরুৎকণ্ঠমাকূজিতম্" ॥

(মধুরিপু কৃষ্ণ দ্বারাবতী চলিয়া গেলে তাঁহারই বস্ত্র দেহে জড়াইয়া এবং কালিন্দী-তটকুঞ্জের বঞ্জুল লতাগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া সোৎকণ্ঠা রাধা এমন গুরুবাষ্পগদ্গদ্কণ্ঠে বিগলিত তারস্বরে গান গাহিয়াছিল যে তাহাতে যমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া কূজন আরম্ভ করিয়াছিল।

(অনুবাদ ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত/শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে।)

নলচম্পু রচয়িতা ত্রিবিক্রম ভট্ট (৯১৫ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার কাব্যের একটি শ্লোকে রাধার নামোল্লেখ করিয়াছেন—

"শিক্ষিতবৈদগ্ধকলাপ-রাধাত্মিকা পর পুরুষে
মায়াবিনি কৃতকেশিবধে রাগং বধ্যাতি"

(কলা-কৌশল-চতুরা রাধার পরম পুরুষ মায়াময় কেশিহন্তার প্রতি অনুরক্তা)।

মাঘের "শিশুপালবধ" কাব্যেও রাধার উল্লেখ আছে। 'চম্পু' লেখক সোমদেব সূরির যশস্তিলক গ্রন্থেও রাধার উল্লেখ রহিয়াছে। এবং সেখানে প্রশ্ন করা হইয়াছে—

রাধা কি নারায়ণের অনুরাগী ছিলেন না? কাশ্মিরী আলংকারিক ক্ষেমেন্দ্র রচিত দশাবতার চরিতে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে। ক্ষেমেন্দ্র জয়দেবের পূর্ববর্তী কবি। তাঁহার রচিত একটি শ্লোকে পাই—

ললিতবিলাসকলাসুখখেলন ললনালোভনশোভন যৌবন
মানিতনবমদনে
অলিকুলকোকিলকুবলয়কজ্জল কালকলিন্দসুতাবিব লজ্জল
কালিয়কুলদমনে।
কেশিকিশোরমহাসুরমারণ দারুণগোকুলদুরিতবিদারণ
গোবর্দ্ধনধরণে
কস্য ন নয়নযুগং রতিসঙ্গে সজ্জিত মনসিজতরলতরঙ্গে
বররমণীরমণে. দশাবতার চরিত্র / ১৭৩

"ধেনুদগ্ধকলসানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বষ্কয়িণীকুলে পুনরিয়ং রাধা
শনৈর্যাস্যতি ॥ (হরিবংশ / ৪১)

(গাভীদুগ্ধের কলস লইয়া গোপীগণ গৃহে যাও, যে গাভীগুলি এখনো দোহন করা হয় নাই সেইগুলি দোহন করা হইলে রাধাও তোমাদের পরে যাইবে।)

আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাক্-পতি-লিপিতে—

"তদ্রাধাবিরহাতুরং মুরারিগোবেল্লদ্বপুঃ পাতুবং

(এমন যে মুরারিপুর রাধা বিরহাতুর কম্পিত বপু তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।")

"সরস্বতী কণ্ঠাভরণ এর লেখক ভোজরাজ, জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। হেমচন্দ্র তাঁহার "কাব্যানুশাসনে" রাধাকৃষ্ণ-প্রেম সম্বলিত আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ শ্লোকটি শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে রহিয়াছে। "রাধা-বিপ্রলম্ভ" নামে একখানি নাটকের কথা রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র লিখিত "নাট্যদর্পণ" গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি সাগরনন্দী তাঁহার "নাটকলক্ষণ-রত্নকোশ" গ্রন্থে রাধা নামক একখানি "বীথি" জাতীয় নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন। "ছন্দ-গ্রন্থ প্রাকৃতপৈঙ্গল" গ্রন্থে একটি শ্লোক—'রাধামুখমধুপান' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে—

"চাণুর বিহণ্ডিঅ ণিঅকুল মণ্ডিঅ
রাহা-মুহমুহ পাণ করে জান ভমরবরে"।

উক্ত গ্রন্থের অপর একটি শ্লোকে কৃষ্ণের নৌকা বিলাসের উল্লেখ করা হইয়াছে

"অরেরে বাহহি কাণ্হ ণাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি
তুহ' এখনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি।"

(ওহে কৃষ্ণ নৌকা বাহিয়া চল, চঞ্চল ডগমগির কুগতি আমাকে দিও না। নদী পাড়ি দাও, তারপর তুমি যাহা চাও তাহা নাও)।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থটি পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। চৈতন্যপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে যে দুইখানি গ্রন্থকে "মহারত্নসম" মনে করিতেন তন্মধ্যে একখানি হইতেছে "কৃষ্ণকর্ণামৃত" এবং অপরখানি হইতেছে— "ব্রহ্মসংহিতা।" কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের দুইটি পাঠ পাওয়া যায়—একটি বঙ্গদেশে—ডঃ সুশীল কুমার দে কর্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপরটি—দাক্ষিণাত্যে। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত গ্রন্থের বহু জায়গায় রাধার উল্লেখ আছে, বাংলাদেশের পাঠেও রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়—

"তেজসে হস্ত নমো ধেনুপালিনে লোক-পালিনে
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে।" ৭৬

(যিনি ধেনুর পালক এবং লোক পালক রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত, শেষনাগের উপর শায়িত, সেই তেজরূপকে নমস্কার।)

কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থটি মূল্যবান্। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার টীকায় এই সকল স্থলেই রাধার উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রন্থখানির একটি নকল করাইয়াছিলেন—

কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লইল।
কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম-জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি॥
যে জানে সে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥ চৈতন্যচরিতামৃত / মধ্য/৯ম।

কৃষ্ণকর্ণামৃতের রাধাবরোধস্মথ অংশের প্রভাবে যে পরবর্তীকালে দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয় তাহা খুব অসঙ্গত হইবে

বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার "সারঙ্গরঙ্গদা"র টীকায় বলিয়াছে—

"দান পুষ্পাহরণ বত্মর্ন্যাদৌ রাধয়া মোহবরেধি"। কৃষ্ণকর্ণামৃতে রাধা যেন লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছেন— তাহা শেষ-শয়নে শায়িত কৃষ্ণ যে রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত হইতেই অনুমতি হয়। জয়দেবের গীত-গোবিন্দেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

এই যুগের রচিত কাব্যগুলিতে রাধা ও লক্ষ্মীর পার্থক্য রহিয়াছে তাহা পরবর্তীকালের রচনায় স্পষ্ট। অর্থাৎ রাধা যখন বৈষ্ণব-গ্রন্থাদিতে প্রথম গৃহীতা হন তখন কিছুদিন প্রাচীন লক্ষ্মীবাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই ছিলেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং গীতগোবিন্দে লক্ষ্মী বা রমার বর্ণনা এবং রাধার বর্ণনা পাশাপাশি স্থান লাভ করিয়াছে। এবং উভয়েই সমভাবে কৃষ্ণপ্রিয়া—

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিত বনমাল
জয় জয় দেব হরে। ১ / ১৭

(কমলার কুচ মণ্ডলে যার আশ্রয়, কুণ্ডলধারী, সুমধুর বনফুলের মালায় শোভিত কণ্ঠদেশ, হে হরি, তোমার জয় হোক্)

ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধি রচনজাতম্॥ ১০ / ১০ গীতগোবিন্দ।

(এই ভাবে মুরারি চটুল-চাটু-বচনে শ্রীমতী রাধাকে বন্দনা করিলেন।)

এই সময়কার কবিতা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে রাধা-কৃষ্ণ সীতারামের পরবর্তী অবতার—

"এতে লক্ষ্মণ জানকীবিরহিণং মাং খেদয়ন্ত্যম্বুদা
মর্মাণীব চ খণ্ডয়ন্ত্যলমমী ক্রূরাঃ কদম্বানিলাঃ
ইত্থং ব্যাহৃতপূর্বজন্মবিরহো যে রাধয়া বীক্ষিতঃ
সের্ষং শঙ্কিতয়া স বঃ সুখয়তু স্বপ্নায়মানো হরিঃ॥
(শুভাঙ্ককবিকৃত, সদুক্তিকর্ণামৃত, কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্

রাধা ও লক্ষ্মীর একীকরণ করা হইয়া থাকিলেও রাধা যে লক্ষ্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন তাহা সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি "উৎকণ্ঠা" শীর্ষক পদে পাই—

"রাধাং সংস্মরতঃ শ্রিয়ং রময়তঃ খেদো
হরেঃ পাতু বঃ

(শ্রীকে রমণ করিবার সময়েও হরি রাধাকে স্মরণ করিতেছেন, অথচ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাধার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিতেছেন না,— ইহাতেই তাঁহার খেদ।

জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতিধর তাঁহার একটি রচনায় বলিয়াছেন যে লক্ষ্মীর অবতার রুক্মিণীকে লইয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় আছেন। এবং যমুনাতীরবাণীর কুঞ্জে রুক্মিণী সহ গাঢ় আলিঙ্গন অবস্থা থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ আভীর গোপরমণীদের স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন—

বিস্মং পায়ান্ মস্‌ৃণযমুনাতীরবাণীরকুঞ্জে
স্বাভীরস্ত্রী-নিভৃতচরিতধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ ॥
সদুক্তিকর্ণামৃত (পদ্যাবলীতে ধৃত।)

লক্ষ্মীর প্রেম অপেক্ষা গোপীদের প্রেম যে শ্রেষ্ঠ এ কথা ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রেমধনে শ্রীমতী রাধা যে শীর্ষস্থানীয়া এ কথা এই যুগের রচনায় বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্তীযুগে ইহারই বিস্তৃততর রূপ পাওয়া যাইবে তাহা অনুমান করিয়া লইতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এবং সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে দেখা যায়— লক্ষ্মী, নারায়ণের সঙ্গে নানাভাবে প্রেমলীলা করিয়াছেন, এমনকি নিধুবনে লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রেমলীলার উল্লেখও আছে। ইহাতে ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে যে লক্ষ্মী একটি দার্শনিক শক্তিরূপপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমেই

মধুর রসাশ্রিতা হইয়া পড়িতেছেন। এবং এই মধুর রসের আশ্রয়েই পূর্ব্ববর্তী লক্ষ্মী পরবর্ত্তী রাধার সহিত "একাত্ম" হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে রাধার জন্ম ইতিহাস লক্ষ্মীর জন্ম ইতিহাসের সঙ্গে একীকরণ করিয়াছেন। পুরাণাদির মতে রাধার পিতা হইলেন—কৃষ্ণভানু গোপ এবং মাতা হইলেন কলাবতীদেবী বা কার্তিকাদেবী। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লিখিয়াছেন—

"তে কারণে পদুমা উদরে
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥"

'পদুমা' [পদ্মা] রাধার মাতা এবং রাধার পিতা—সাগর। লক্ষ্মী সাগরসম্ভূতা, অতএব রাধার পিতা সাগর ঠিকই হইয়াছে— উপরন্তু রাধা পদ্মজাতা এবং রাধার মাতা—পদুমা বা পদ্মা। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মর্তব্য যে অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল আদি রসাত্মক কবিতা রচিত হইয়াছিল তাহা যে শুধু রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল তাহা নহে, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং হরপার্ব্বতীকেও অবলম্বন করিয়া বহু আদি রসাত্মক কবিতা রচিত হইয়াছিল। কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি পর্যন্ত হর-পার্ব্বতীর বা হর-গৌরীর শৃঙ্গার লীলা ভারতীয় সাহিত্যে রস-সম্পদে কম রসদ যোগান নাই। কিন্তু কালক্রমে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কাহিনীই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। এবং ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা বিহার উড়িষ্যার একটি বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতি রচিত হইয়াছে। তবে বেশীর ভাগ কবিরই আদর্শ ছিল—জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

ঃ রাধাবাদ ঃ

পদাবলী-সাহিত্যের মূলে বিষয়বস্তু হইতেছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই প্রেমলীলার দুইটি দিক আছে— প্রথমতঃ তত্ত্বের দিক, দ্বিতীয়তঃ কাব্যোপাখ্যানের দিক। রাধা হইতেছেন—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার।"

চৈতন্যচরিতামৃত/কৃষ্ণদাস কবিরাজ

অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের 'শক্তি' সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে রাধাবাদের বীজ নিহিত আছে ভারতীয় শক্তিবাদে। এই শক্তিবাদই বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে। যিনি ছিলেন বিশুদ্ধ শক্তিরূপিনী তিনিই আবার পরিবর্তিত হইয়া দেখা দিলেন প্রেম-রূপিনী হিসাবে। এই পরিণতিতে পূর্ণভাবে ইন্ধন যোগাইয়াছিল বহু লৌকিক প্রেম-কাহিনী। লৌকিক প্রেম কাহিনীগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলেই বৈষ্ণবধর্মে ও দর্শনে একটি নব-ভাবনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

শক্তিবাদের দেশ ভারতবর্ষ। সৃষ্টিতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া একটি আদিদেবীর কল্পনা বহির্ভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই আদি দেবীর উপর মাতৃত্বের রূপ আরোপিত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ এই শক্তি-তত্ত্বের উপর অধিকতর বিশ্বাসী। শক্তিবাদের প্রভাব ভারতবর্ষের শক্ত বা শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বৌদ্ধ জৈনদের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শৈব বা শাক্ত সম্প্রদায়ের বাহিরে যে অপর সম্প্রদায়গুলি আছে তাঁহাদের মধ্যেও এই শক্তিবাদের কথা আছে।

বিষ্ণুর শক্তি— লক্ষ্মী—ইহা সর্বজন বিদিত। রাম-ভক্তদের নিকট সীতা লক্ষ্মীর আসন গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ভক্তদের নিকট রাধা সেই

স্থান দখল করিয়াছেন। শিবের শক্তি—দুর্গা, পার্বতী, উমা বা গৌরী। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে কোন দেবতা বা 'উপদেবতা একক নহেন। প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি শক্তি-রূপিনী দেবী আছেন। কার্তিকের পত্নী ষষ্ঠী, বহ্নির পত্নী স্বাহা, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা, বায়ুর পত্নী স্বস্তি, গণেশের পত্নী পুষ্টী, অনন্তের পত্নী তুষ্টী, যমের পত্নী ক্ষমা, মদনের পত্নী রতি, সত্যের পত্নী উক্তি, চন্দ্রের পত্নী রোহিনী, সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা, ইন্দ্রের পত্নী শচী, বৃহস্পতির পত্নী তারা ইত্যাদি। ইহাই হইতেছে পুরুষ-প্রকৃতি। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ; প্রকৃতি খণ্ড / ১ম অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

সাধানার ক্ষেত্রেও পাই—

"বিনা শক্তি ন পূজাস্তি মৎস্য মাংস বিনা প্রিয়ে
বিনা পরক্রিয়া দেবি জপেদ্ যদি তু সাধকঃ
শতকোটী জপেনৈব তস্য সিদ্ধির্ণজায়তে"

শাক্ত-তন্ত্র-পুরাণে পূজাপার্বন প্রভৃতির ভিতরে শক্তিবাদের যে পরিচয় পাই তাহার মূলকাণ্ড হইতেছে— ঋগ্বেদের "দেবীসূক্ত" (১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তটি)। এই শক্তিবাদের মধ্যে আর্যেতর জাতির অবদান যে আছে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে আদিতে শক্তিবাদের মধ্যে আর্যেতর প্রভাব যতটুকু থাকুক না কেন ইহার উন্নত দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক মতবাদ সৃষ্টিতে আর্য ঋষিদের অবদান বিরাট। "দেবীসূক্ত"টি বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী ঋষিকন্যার উক্তি। ব্রহ্মস্বরূপা তিনি, তিনি রুদ্র, বসু আদিত্য এবং তিনিই বিশ্বদেবরূপে বিচরণ করিতেছেন। তিনি বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতিকে ধারণ করিতেছেন। তিনিই জগতের একমাত্র অধিশ্বরী, ধনদাত্রী, যজ্ঞের আদি স্বরূপা, জ্ঞানরূপা, বহুভাবে অবস্থিতা। তাঁহাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পালন করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছায় সব হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছায় কেহ ঋষি, কেহ সুমেধা হইতেছেন।

তিনিই দ্যুলোক ও ভূলোকে অধিষ্ঠিতা এবং তাঁহারই দেহের দ্বারা স্পৃষ্ট আরম্ভমাণ বিশ্বভুবনকে বায়ুর ন্যায় তিনিই প্রবর্তিত করিতেছেন, ইহাই তাঁহার মহিমা— "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি ১০ / ১২৫ / ১-৮ ঋগ্‌বেদ।

এইখানেই উদ্‌গীত হইয়াছে আত্মস্বরূপ পরমব্রহ্মেরই মহিমা— ও এক সর্বব্যাপিনী শক্তির কথা। এইখানেই ভারতীয় দার্শনিক শক্তিবাদের বীজ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে "সপ্তশতী" অংশে চণ্ডীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার মূল ভিত্তি ঐ সূক্তটি। রুদ্র দেবতার দুই ভাব— প্রসন্ন ও ক্রুদ্ধ। শিবভাবে তিনি আরোগ্যের দেবতা, পশু-মানুষের "ভিষকতম্"। রুদ্রভাবে তিনি ধ্বংসের দেবতা— বিশেষ করিয়া— পশুরা।

দেবী-দুর্গা নামের বীজও ঋগ্‌বেদে নিহিত। দুর্গমপথে অর্থাৎ রণে বনে যিনি রক্ষা করেন— তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। ঋগ্‌বেদের উষাসূক্তটিও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। বৈদিক-কবি উষাকে 'দানদেবী' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট ধন মান পুত্র কামনা করিতেন। উষাকে মাতৃভাবনাও করা হইয়াছে—

"উচ্ছন্ত যা কৃণোষি মংহনা মহি প্রখ্যৈ দেবি স্বর্দৃশে।
তস্যাস্তে রত্নভাজ ঈমহে বয়ং স্যাম মাতুর্ন সূনবঃ॥" ৭ / ৮১ / ৪

হে সতীদেবী প্রভাত হইতে হইতে (তুমি আমাদের) অবলোকন কর এবং সূর্যালোক দেখাও। সেই তোমার ধনাধিকার প্রার্থনা করি (আমরা) যেমন পুত্রেরা মাতার (ধনাধিকার) বাঞ্ছা করে। (অনুবাদ :— ডঃ সুকুমার সেন— ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।)

অথর্ববেদের "পৃথিবী-সূক্তে" (১২ / ১) পৃথিবীকে বিশ্বজননী দেবী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নারায়ণোপনিষদেও পৃথিবীকে "শ্রী" দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুর ভূ-শক্তির যে কল্পনা পরবর্তীকালে করা হইয়াছে তাহার অথর্ব বেদের বর্ণিত ঐ শক্তির কথাকেই স্মরণ করাইয়া

দেয়। ব্রহ্মশক্তিই যে আসলশক্তি এবং সেই শক্তিই যে অগ্নিবায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতাগণের ভিতর দিয়া ক্রিয়মানা এবং তিনিই যে বহু-শোভমানা হৈমবতী উষারূপে আকাশে আবির্ভূতা হইলেন তাহা "কেন-উপনিষদে" পাওয়া যায় (৩ / ১২)। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে" (১ / ৪ / ৩) পাই— আত্মাই আদিতে একাকী অবস্থান করিতেছিলেন। সেই একক আত্মা কখনো একা রমণ করিতে পারেন না, এবং তিনি দ্বিতীয় কাহাকেও ইচ্ছা করেন। তাঁহার এই ভাব স্ত্রী-পুরুষের গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ একীভুত ভাব। তিনি নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করিলেন— স্ত্রী ও পুরুষ রূপে। ইহাই "আদি মিথুন-তত্ত্ব"। এই আদি মিথুন তত্ত্বেরই প্রকাশ জগতের সর্বপ্রকার মিথুনের মধ্যে।

পরবর্তীকালে শক্তিতন্ত্রে এবং বৈষ্ণবমতেও এই মূল তত্ত্বটি গভীরভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এই আত্মরতি এবং তাহার জন্য অভেদে ভেদ কল্পনা ব্যতীত বৈষ্ণবদিগের লীলাতত্ত্বের অস্তিত্ব থাকে না। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও (২ / ১৩ / ২) মিথুনতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-দর্শন-শাস্ত্রে বিষ্ণু-শক্তির আলোচনার মধ্যে "শ্বেতাশ্বতরোপ-নিষদের" দুইটি শ্রুতি খুবই উল্লেখযোগ্য—

> ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
> ন তৎসমাশ্চাভ্যাধিকশ্চ দৃশ্যতে
> পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
> স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" ৬ / ৮

তাঁহার কার্য কারণ কিছুই নাই, তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকও কেহই নাই। বিবিধ পরাশক্তির কথা শ্রুত হইয়া থাকে এবং ইহার জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

অপরটি হইতেছে—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ ৪ / ১০

মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, মায়ীকে জানিবে মহেশ্বর। তাঁহার অবয়বভূত-বস্তু দ্বারাই এই সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিকশিত শক্তিবাদের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে শক্তি বা দেবী 'শ্রী' বা লক্ষ্মীরূপেই বৈষ্ণবধর্মে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ঋগ্বেদের 'দেবীসূক্তের মধ্যে যেমন 'দেবী'র মূল, ঠিক তেমনি ঋগ্বেদের শ্রীসূক্তের মধ্যে বিষ্ণু-শক্তি-শ্রী বা লক্ষ্মীর উৎপত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শ্রীসূক্তটি হইতেছে ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তে 'খিল'সূক্তস্থ পঞ্চদশটি ঋক্-মন্ত্র ইহার রচয়িতা হইতেছেন— আনন্দ, কর্দম, শ্রীদ প্রভৃতি ঋষিগণ—

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীয়ং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্॥

[জাতবেদ অগ্নির নিকট লক্ষ্মীকে আহ্বান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন— "হে জাতবেদ অগ্নি তুমি আমার জন্য হিরণ্যবর্ণ হরিতকান্তি অথবা হরিণীরূপ ধারিণী সুবর্ণ রজতের পুষ্পমালা ধারিণী, চন্দ্রবৎ প্রকাশমানা হিরন্ময়ী লক্ষ্মীকে আহ্বান কর।]

এই সূক্তটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় দেখা যায় লক্ষ্মীকে হরিণী, আদ্রা, পদ্মস্থিতা, পদ্মবর্ণা, পদ্মিনী, পুষ্পমালিনী বলা হইয়াছে—

"আদ্রাং পুষ্করিণীং, পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্।" "অহির্বুধ্ন্যং-সংহিতার ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়ে "হিরণ্যবর্ণ" শব্দটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং

বলা হইয়াছে যে শ্রী-শক্তিই পরমামৃতা দেবী—

"হিরণ্যবর্ণা সা দেবী শ্রী-শক্তিঃ পরমা হ্মৃতা।"

পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বলা হইয়াছে—

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং বিষ্ণোরনপগামিনীম্ ॥

*　　*　　*　　*

"ঈশ্বরীং সর্বভূতানাস্তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম"

এবং—

ঋক্-সংহিতায়াস্তু স্তূয়মানা "মহেশ্বরী" ২২৭/২৯-৩৯

অগ্নিপুরাণেও এই "হিরণ্যবর্ণাং" এর স্তুতিগান করা হইয়াছে।

বৈদিক লক্ষ্মীদেবী 'শ্রী' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করায় পুরাণাদিতেও 'শ্রী' হিসাবে খ্যাত হইয়াছেন—

"শ্রীফলা শ্রীমতী শ্রীশা শ্রীনিবাসা শিবপ্রিয়া।
শ্রীধরী শ্রীকরী কল্যা শ্রীধরাধশরীরিণী" ॥ কূর্মপুরাণ ১২/১৮০-৮১

ব্রহ্মপুরাণ (বঙ্গবাসী সং) ৪৯ / ১০ এ বলা হইয়াছে—

"প্রিয়ঃ কান্ত নমস্তে হস্তু শ্রীপতে পীতবাসসে
শ্রীদ শ্রীশ শ্রীনিবাস নমস্তে শ্রীনিকেতন।"

ব্রহ্মপুরাণ ৪৯/১০ (বঙ্গবাসী সং)

অগ্নি পুরাণ (বঙ্গবাসী সং) ২৮/৪/৫ এ পাই—

শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রীনিবাসঃ শ্রীধরঃ শ্রীনিকিতনঃ।
শ্রিয়ঃ পতিঃ শ্রীপরম এতৈঃ শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ॥

গরুড়-পুরাণ (বঙ্গবাসী সং) ৩০/১০/১৫ এ পাই—

"শ্রীনিবাসায় দেবায় নমঃ শ্রীপতয়ে নমঃ
শ্রীধরায় সশাঙ্গায় শ্রীপদায় নমোঃ নমঃ"

শতপথ-ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও 'শ্রী' দেবীর পূজার উল্লেখ আছে ১১/৪/৩। মহাকবি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণ মহাকাব্যে একাধিকবার শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ করিয়াছেন—

"শোভয়িষ্যামি ভর্তারং যথা শ্রীর্বিষ্ণুমব্যয়ম্"
(অযোধ্যাকাণ্ড / বোম্বাই নির্ণয় সাগর সং ১১৮/২০)

কিছুসংখ্যক শিলালিপি রাজকুল মুদ্রা এবং বৌদ্ধ-কেন্দ্রগুলিতেও শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রী শুধু বিষ্ণু-পত্নীই নহেন, তিনি শস্য, সৌন্দর্য, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপেও বন্দিত।

বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী সম্বন্ধে অপর একটি বস্তু লক্ষ্য করিতে হয়— বিষ্ণু যেখানে কৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। সেখানে লক্ষ্মীর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন— রুক্মিণী। খিল হরিবংশের রুক্মিণীকে লক্ষ্মীর মতই বর্ণনা করা হইয়াছে। হরিবংশ মতে কৃষ্ণের আরও স্ত্রী বর্তমান। তাঁহারা— কালিন্দী, মিত্রবৃন্দা, নাগ্নজিতী, জাম্ববতী, রোহিণী, লক্ষ্মণা, সত্যভামা রুক্মিণীকে লইয়া কৃষ্ণের এই অষ্টপত্নী।

বিষ্ণুই হইয়াছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের এই অষ্ট পত্নীদের মধ্যে রাধার উল্লেখ নাই। অবশ্য পত্নী হিসাবে রাধার উল্লেখ থাকিতেও পারে না। তবুও রাধা-কৃষ্ণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই রাধার সৃষ্টি কিভাবে এবং কখন হইল তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। কাব্যাদিতে রাধার নাম বহু পূর্ব হইতেই আছে, কিন্তু ধর্মমতের সঙ্গে তত্ত্বাশ্রিত ভাবে শ্রীরাধার আবির্ভাব ঘটে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে। তত্ত্বরূপে শ্রীরাধার পরিপূর্ণতা বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধ্যানে ও মননে। এই পরিপূর্ণতা লাভের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত করা হইল।

বৈষ্ণবধর্মের সারগ্রন্থ ভাগবত-পুরাণে স্পষ্টত: রাধার কোনো উল্লেখ নাই। এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণের একাধিক স্থানে

রাধার উল্লেখ পাই। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে জয়ন্তী ব্রতমাহাত্ম্য-খ্যাপন প্রসঙ্গে 'রাধাষ্টমী ব্রতের' উল্লেখ রহিয়াছে—

"ভাদ্র মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞকে তিথৌ
বৃষভানোর্বজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা।" ৪০ / ৪১

এই অংশে রাধার প্রেম-কাহিনী নাই। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে বলা হইয়াছে— রাধা কৃষ্ণপ্রিয়া, রাধা আদ্যাশক্তি এবং রাধিকার কলার কোটিকোট্যংশ হইল দুর্গাদি ত্রিগুণাত্মিকা দেবীগণ। রাধার পাদরঞ্জন স্পর্শ হইতে কোটি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—

"তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥
তস্যাঃ পাদরজঃস্পর্শ কোটি বিষ্ণু প্রজাতয়ে।
(কেদারনাথ ভক্তি-বিনোদ সম্পাদিত পদ্মপুরাণ)

রাধা ও কৃষ্ণ স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত—

"রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতম্"।

ললিতাদি সখীরা হইল— প্রকৃতির অংশ ; রাধা হইল মূল প্রকৃতি—

ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যংশা মূলপ্রকৃতি রাধিকা।

(ঐ / পাতালখণ্ড / ৩৯ অংশ)

পদ্মপুরাণের পরবর্তী অধ্যায়ে পাই নারদ— বাল-কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলেন— ইনি ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার, এবং গোপভানু গৃহে সুলক্ষণা গৌরী কন্যাকে দেখিয়া মনে করিলেন যে ইনিই কৃষ্ণবল্লভা, লক্ষ্মীর অবতার ইনি মহেশ্বরী, রমা, 'আদ্যাশক্তি' মূল প্রকৃতি, ইচ্ছা জ্ঞানঃ ক্রিয়া-শক্তি। এবং এই রাধা-বৃন্দাবনেশ্বরই হইলেন পুরুষ প্রকৃতি—

"পুরুষ-প্রকৃতি চাদৌ রাধার-বৃন্দাবনেশ্বরৌ"॥

বিশেষজ্ঞেরা পদ্মপুরাণের রচনা-কাল লইয়া সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন

এবং এই অধ্যায়টির বহু অংশই যে পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছিল তাহাও বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন। তাঁহাদের এই অনুমান অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন নহে। কারণ পদ্মপুরাণের রচনাকাল যদি সপ্তম / অষ্টম শতাব্দী হয় তাহা হইলে রাধা-বাদের এইরূপ স্পষ্ট প্রকাশ কখনই হইতে পারে না। রাধা-বাদের উৎপত্তি অনেক পরে।

"নারদ পঞ্চরাত্র" গ্রন্থটির উপরও বিশেষ কোনো গুরুত্ব স্থাপন করা যাইতে পারে না। কারণ ঐ গ্রন্থে "রাধা" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহাও প্রাচীনতার দাবী করিতে পারে না। এই গ্রন্থে সর্ব-স্বরূপ শক্তি-মূর্তির সহিত রাধাকে এক করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণরোসি যা রাধা যদ্বামাংশেন সম্ভবা
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে সা চ নারায়ণোরসি
সরস্বতী সা চ দেবী বিদুষাং জননী পরা
ক্ষীরোদসিন্ধু-কন্যা সা বিষ্ণুরসি চ মায়য়া।" (২ / ৬ / ১৪)

(রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ; বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত।)

মৎস্য-পুরাণে বলা হইয়াছে— দ্বারকায় রুক্মিণী কৃষ্ণপ্রিয়া এবং বৃন্দাবনে রাধা হইতেছেন কৃষ্ণপ্রিয়া। বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, নারদীয় পুরাণেও রাধার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও রাধার উল্লেখ আছে এমনকি রাধ-কৃষ্ণের বিবাহ দেওয়ার কথাও আছে। সেইজন্য বিশেষজ্ঞেরা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্র" গ্রন্থে বলিয়াছেন— "ইহার রচনা প্রণালী আজি-কালিকার ভট্টাচার্য্যদিগের রচনার মত।"

আমরা পূর্বে কৃষ্ণের যে-অষ্টপত্নীর কথা বলিয়াছি— ঐ অষ্ট পত্নীই হইতেছেন— স্বরূপভূত বিভিন্ন শক্তিরই বিগ্রহ। ইহার ভিতরে রুক্মিণী

ভগবান্ কৃষ্ণের প্রকাণ্ড অনুরূপত্ব হেতু স্বয়ং লক্ষ্মী। সত্যভামা ভূশক্তি, মতান্তরে তাঁহার "প্রেমশক্তিপ্রচুর ভূশক্তিত্ব।" বৃন্দাবনে ভগবানের স্বরূপশক্তি প্রাদুর্ভাবরূপা হইলেন— ব্রজদেবীরা, সুতরাং তাঁহারাই হইলেন বৃন্দাবন লক্ষ্মী। হ্লাদিনীর রহস্য-লীলার প্রবর্তক— ব্রজ-বধূগণ। ইহারাই "নিত্যসিদ্ধা"। হ্লাদিনীর সারবৃত্তি—'প্রেম'। সেই প্রেমই ব্রজদেবীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং ব্রজদেবীরা ছিলেন—"আনন্দচিন্ময় রসপ্রতিভাবিতা।" ইহাদের ভিতরে এই প্রেম প্রাচুর্যের প্রকাশ হেতু ভগবানেরও ইহাদের মধ্যে পরমোল্লাসের প্রকাশ। সেই উল্লাসই জন্মায় ভগবানের—রমণেচ্ছা। ব্রজ-গোপীদের মধ্যে মুখ্যা হইলেন—রাধা। এই রাধার মধ্যেই—"প্রেমোৎকর্ষ-পরাকাষ্ঠা"।

শক্তিতত্ত্বে শক্তিকে আনন্দরূপিনীও বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত মতবাদে ইহার উল্লেখ আছে। কাশ্মিরী শৈবসিদ্ধান্তে, 'আনন্দশক্তি শিবের পঞ্চশক্তির মধ্যে একটি পৃথক শক্তি বলিয়া স্বীকৃত। এই শক্তিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণের চরমোৎকর্ষপ্রাপ্তা শক্তি 'রাধা' হ্লাদিনী-রূপত্ব লাভ করিয়াছে।

তন্ত্রগ্রন্থে শক্তিকে "ষোড়শ কলাত্মিকা" বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের "ষোড়শাত্মিকা" শক্তি হইতে ষোড়শ গোপী। তন্ত্রগ্রন্থ ও যোগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রেরও ষোড়শকলা আছে। এবং তাহা "বিকারাত্মিকা অর্থাৎ 'পরিবর্তনশীলা'। উপরন্তু চন্দ্রের আর একটি কলার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে 'সপ্তদশীকলা'। এই সপ্তদশীকলা হইতেছে—পরমানন্দময়ী, অমৃতরূপিণী এবং ইহাই "প্রবৃত্তিরাজ্যের" বস্তু ; এবং ইহাই বৈষ্ণবদের নিকট বৃন্দাবনধামের বস্তু বলিয়া খ্যাত।

যে আত্মা, মায়া বা যোগমায়া অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমলীলা সাধনা করেন তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রে "পৌর্ণমসী" রূপ ধারণ করিয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণেরলীলার ভিতর বৈশাখী-পূর্ণিমা, ঝুলন-পূর্ণিমা, রাস-পূর্ণিমা, দোল-পূর্ণিমা প্রভৃতির মাহাত্ম্য এত বেশী সূচিত হইয়াছে।

ভারতীয় শক্তিবাদে অভেদের মধ্যে ভেদ স্থাপন করিয়া লীলা স্থাপন করা হইয়াছে। বৈষ্ণবেরাও এই অভেদ ভেদ স্থাপন করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অভেদের মধ্যে ভেদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লীলাকে সত্য এবং নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই "লীলা স্মরণ" এবং "লীলা-আস্বাদন" গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট 'সাধ্য সাধন' বস্তু।

বিষ্ণু লক্ষ্মী ও রাধাকৃষ্ণের মধ্য পার্থক্য হইতেছে বিষ্ণু লক্ষ্মীতত্ত্বে সৌন্দর্য-মাধুর্য বৃহৎ এবং রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে প্রেম-মাধুর্য-ই মুখ্য। এই প্রেম বৈষ্ণবদের নিকট সার, এবং প্রেমভাবই হইতেছে 'মহাভাব'। এই মহাভাব-স্বরূপিণী হইলেন মূর্তিমতি শ্রীরাধিকা। এইখানে দেখি "রাধাতত্ত্ব", শক্তি তত্ত্ব হইতে গঠিত হইয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। রাধাতত্ত্ব যে শক্তি-তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পদাবলী সাহিত্যে রাধাপ্রেম এমনি অভিনব ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে রাধাতত্ত্ব যে শক্তিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত তাহা চেনা বা বুঝা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পুরাণাদিতে গোপীগণকে ব্রজধামে এই লীলার প্রসার এবং শ্রীরাধিকার সাহিত এই লীলার পরিপূর্ণতা।

পঞ্চম অধ্যায়

(প্রাক্ চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্ম)

পুরাণে ও সাহিত্যে রাধা কিভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করিয়াছি। রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-ধর্ম সৃষ্টি হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম ও দর্শন মূলত গড়িয়া উঠিয়াছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া। মহাপ্রভু প্রবর্তিত ধর্মমতের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার পূর্বে প্রাক-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণবধর্ম কিরূপ ছিল তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন।

বিষ্ণু-বাসুদেব-মধুসূদনই রূপান্তরিত হইয়াছেন কৃষ্ণে। বিভিন্ন পুরাণে কৃষ্ণ-লীলা বিবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তিবাদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করাচার্যের প্রভাবে উত্তর ভারতের বৈষ্ণবধর্ম হীনবল হইয়া পড়ে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম যে মাথা উঁচু করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল তাহার প্রমাণ আলবার সম্প্রদায়ের মতবাদ ও তাঁহাদের সাধন সঙ্গীতগুলি। রামানুজ এই আলবার সম্প্রদায়েরই লোক। রামানুজই প্রচার করেন "বিশিষ্টাদ্বৈত" মতবাদ। এবং এই বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ হইতে বৈষ্ণবধর্ম, দার্শনিক ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রামানুজ ঃ বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী বা শ্রী, রামানুজ প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। সেইজন্য অনেকে অনুমান করেন যে রামানুজ প্রবর্তিত ধর্মে "শ্রী" বিশিষ্ট স্থান লাভ করায় রামানুজ মতাবলম্বী সম্প্রদায়কে 'শ্রী-সম্প্রদায়" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা হৃদয়ে ও বাহুযুগলে গোপীচন্দন-মৃত্তিকা দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের প্রতিরূপ চিহ্ন ধারণ করেন। এবং ঐ শঙ্খাদির মধ্যস্থানে একটি রক্তবর্ণ রেখা অঙ্কিত করেন। এই রেখা লক্ষ্মীর প্রতীক বলিয়া খ্যাত। রামসীতার উপাসনাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। "ভারতীয় উপাসক

সম্প্রদায়" শীর্ষক গ্রন্থে অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা "শ্রী-ভাষ্য" নামে খ্যাত। এই ভাষ্যে তিনি "মায়া" সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। মায়াকে রামানুজ কখনো মিথ্যা বলেন নাই, এইখানেই শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। রামানুজের মতে মায়া "ব্রহ্মাশ্রিতা" সুতরাং ব্রহ্মশক্তিই বটে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এই মায়ারই রূপ, এই প্রকৃতি হইতেই সকল সৃষ্টি। ইহা 'গীতার' পুরুষোত্তম-বাদেরই পরিপোষক। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও যাহা কিছু চিৎ এবং অচিৎ বস্তু আছে তাহা ব্রহ্মের শরীর। রামানুজের মতে জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু ব্রহ্মের মত নিত্য ও সত্য নহে। এই জন্যই তাঁহার মতবাদকে বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদ বলা হয়। ভগবানের দেহ মানবদেহের মতো নহে, তিনি অনন্ত গুণের অধিকারী। এই গুণকে যাহারা স্মরণ করেন তাঁহারাই 'ভক্ত' নামে খ্যাত। এবং স্মরণকে বলা হয় "ভক্তি"। তাঁহার মতে মুক্তি অর্থে ব্র লয় নহে, ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্তি। তাঁহারা ভগবানের স্মরণাপন্ন হন এবং কায়াকে তাঁহারা অতিক্রম করেন। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন—মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে—শরণাগতি ও নিষ্কাম ভাবে শাস্ত্রীয় বিধির অনুসরণ। সূর্য ও সূর্য-কিরণের যে সম্পর্ক ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক অনুরূপ। রামানুজ ব্রহ্মকে করুণাময় ও ভক্ত বৎসল বিষ্ণুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি বিষ্ণুপুরাণকেই অবলম্বন করিয়াছেন, ভাগবতকে নহে।

নিম্বার্ক : দ্বৈতাদ্বৈতবাদ :— নিম্বার্ক স্বামী খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজের কিছু পরে দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হন। তাঁহার রচিত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য "বেদান্ত-পারিজাত সৌরভ" নামে পরিচিত। তিনিও ভক্তিধর্মে বিশ্বাসী। তাঁহার দার্শনিক মত "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" নামে পরিচিত। তাঁহার মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ রহিয়াছে। এই ভেদাভেদ নিত্য এবং স্বাভাবিক। ব্রহ্ম—অচিন্ত ও অনন্ত। তাঁহার মতে বিষ্ণু বা কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, তিনি করুণাময় এবং দোষবিরহিত। পরমাত্মা, অংশী ; জীবাত্মা তাঁহার অংশ। সুবর্ণপিণ্ড ও তাহা হইতে প্রস্তুত অলং-

কারের মধ্যে যে সম্পর্ক, তাঁহার মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেইরূপ। ব্রহ্ম 'কারণ' জগৎ কার্য''। প্রকৃতি ব্রহ্মার অংশ এবং জগৎ এই প্রকৃতিরই পরিণাম। সুতরাং জীব ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বৈত ও অদ্বৈত দুইই। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান, শরণাগত জনকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি দেন। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গোপীগণও ভক্তের উপাস্য এবং রাধাকৃষ্ণই উপাস্য দেবতা। পঞ্চরসের যে কোনো একটিকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মতবাদের সঙ্গে নিম্বার্ক-প্রবর্তিত মতবাদের অনেকটা মিল আছে। তিনি শঙ্করাচার্যকে সমর্থন করেন নাই।

মাধবাচার্য ঃ দ্বৈতবাদ ঃ— খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য ভক্তি-দর্শন প্রচার করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মানুষ। তিনি বেদান্তসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যকে বলা হয়— "দ্বৈতাভাষ্য"। তাঁহার মতে জীবজগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সত্য এবং উভয়ই স্বতন্ত্র। কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদ আছে। সেই জন্য তাঁহার মতবাদকে "দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ" বলা হয়। বিষ্ণু বা ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব। তিনি আনন্দময় এবং তাঁহার ঐশ্চর্য্য অনন্ত। তিনি পাঁচ প্রকার ভেদের কথা বলিয়াছেন— জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ, জীবে ও জীবে ভেদ, ঈশ্বর ও জড়ে ভেদ, জীবে ও জড়ে ভেদ, জড় ও জড়ে ভেদ। অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব ও জগতের ভেদ অনাদি এবং তিনি জীবজগৎ ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। মাধবাচার্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে "মাধবী সম্প্রদায়" বলা হয়। এবং তাহার মতবাদকে "ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের" মত বলা হয়। মাধবাচার্য কৃষ্ণের মাধুর্যলীলার উল্লেখ কোথাও করেন নাই, তিনি ঐশ্চর্য্যলীলার কথাই বলিয়াছেন।

বল্লভাচার্য ঃ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ঃ— বল্লভাচার্য ভক্তি দর্শনের আর একটি মতবাদ প্রচার করেন। তিনিও বেদান্তসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সত্য ; জীব ও জগৎ সত্য। তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদকে স্বীকার করেন নাই। তিনি "বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ" স্থাপন করেন। তিনি বলেন যে 'গোপীজনবল্লভ' শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম ও পরম তত্ত্ব। ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত ; তাঁহার দুইটি লীলা— মাধুর্যলীলা ও ঐশ্চর্য্য-

লীলা। কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ লাভই হইতেছে ভক্তি-সাধনার শেষ কথা। তাহার মতে ভক্তিপথ দ্বিবিধ—মর্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ। যে ভক্তেরা শাস্ত্রীয় বিধিপথ গ্রহণ করিয়া ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারা "মর্যাদা মার্গপন্থী" এবং যাঁহারা 'কৃষ্ণ' ও তাঁহার ভক্তের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন ও তাঁহার মাধুর্যলীলার আস্বাদন করিতে চাহেন তাঁহারা "পুষ্টীমার্গী"। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রবর্তিত "বৈধীভক্তি" ও "রাগানুগা" ভক্তির সঙ্গে মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্ঠীমার্গের তুলনা করা যাইতে পারে।

বল্লভাচার্যের মতবাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের কিছুটা মিল আছে। বল্লভাচার্য চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন অথবা কিছুকাল পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন :— খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে ভাগবতের আদর্শ অনুযায়ী কৃষ্ণলীলা, কোনো রূপ ধারণ করিয়াছিল কি না তাহার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালের আটদশ খানা ভূমিদান-পত্র ও তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে যে প্রশস্তিবচন ছিল তাহা পাঠ করিলে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে বিষ্ণু উপাসনা খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণ তখন অবতার বলিয়া একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে একটি যুগল মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। পুরুষ মূর্তিটি কৃষ্ণের এবং নারী মূর্তিটি শ্রীরাধার বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ভট্টনারায়ণের "বেণীসংহার" নাটকেও রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ভট্টনারায়ণ বাঙালি ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও বিষ্ণু-নারায়ণকে শ্রদ্ধা করিতেন। নারায়ণ পাল বিষ্ণুর মন্দির ও গড়ুর স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী শিব ও কৃষ্ণ বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

"শ্রীঃ শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতং
ভুজেনাগম্।
দধতং কং দামজটালম্বং শশিখণ্ড মণ্ডনং বন্দে"

অর্থাৎ লক্ষ্মী যাঁহার কণ্ঠাশ্রিত, অথবা কৃষ্ণ শোভা যাঁহার কণ্ঠে, কৃষ্ণ যিনি ভুজে কালিয়নাগকে ধরিয়াছে, অথবা যাঁহার হস্তে ফণি-বলয়, যিনি সুন্দর বন মালাধারী অথবা যিনি সুন্দর জটাজুট ধারী ও বর্হাপীড় অথবা শশিকলা মণ্ডিত তাঁহাকে বন্দনা করি।

সমতটের ভোজবর্মের শাসনে ঢাকা জেলার বেলার গ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে ব্রজলীলার উল্লেখ আছে। ভোজবর্মা একাদশ শতাব্দীতে ছিলেন

"সোহপীহ গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণোঃ মহাভারতসূত্রধারঃ

অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / ১ম খণ্ড / পৃ ১৬, ডঃ সুকুমার সেন)

সেই গোপীশত কেলিকার, মহাভারত নাট্যের সূত্রধার পরম পুরুষ কৃষ্ণ রূপে এখানে ভূমিভারোদ্ধারকারী অংশাবতার রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এই শিলালিপিতে কৃষ্ণকে মহাভারতের সূত্রধার, ভগবতের "গোপীশত কেলিকার" বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হন নাই, কারণ তাঁহাকে অংশাবতার বলা হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর মন্দির গাত্রে খোদিত প্রশস্তিতে পাই—

"গাঢ়োপগূঢ়-কমলাকুচ-কুম্ভপত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্দেবতোপহসিতোহস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ।

(কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁহার কুচকুম্ভপত্র-লেখার ছাপ যাহাতে লাগিয়াছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে, অভিনব বনমালা যেন নষ্ট না হয় এই বলিয়া বাগ্দেবতা যাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন, এমন হরি তোমাদের শ্রীর হেতু হউন)। (ডঃ সুকুমার সেন / বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃ ১৭)

বাঙ্গালাদেশের সেন রাজারা বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন— তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। কবি উমাপতিধর বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের মহামন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিজয় সেনের প্রশস্তি রচয়িতা ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন নিজেও পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

বাঙ্গলাদেশে রাধাকৃষ্ণ-লীলার পূর্ণরূপ পাই—জয়দেবের গীতগোবিন্দে। বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যে রাধা এখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিতা। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে একমাত্র জয়দেবের গীত-গোবিন্দে যে রাধার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে একথা বলা চলে না। জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালাদেশে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটা সাহিত্য-যুগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জয়দেব নিজেই তাঁহার কাব্যে উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধনাচার্য কবির উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবি-গোষ্ঠী বাঙ্গালাদেশের সেন রাজবংশের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে এই সকল কবির রচনা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে জয়দেব রচিত কিছু ছুটক পদও সংকলিত হইয়াছে—যাহা গীতগোবিন্দে নাই। তবে ঐ জয়দেব আর গীতগোবিন্দের জয়দেব একই ব্যক্তি কিনা তাহা বলা দুষ্কর।

সদুক্তিকর্ণামৃতে যে সকল বৈষ্ণবপদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য রসের কবিতা আছে। উমাপতিধরের কৃষ্ণের কৌমার-লীলা বিষয়ক পদে পাই কৃষ্ণ কুমার অবস্থায় কালিন্দীপুলিনে অথবা শৈলে বা উপশৈলে (গ্রামের প্রান্তে) অথবা বটবৃক্ষ তলে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেন তেমনি রাধার পিতার গৃহ-প্রাঙ্গণেও আনাগোণা করিতেন—

"কালিন্দীপুলিনে ময়ানন ময়া শৈলোপশলো নন
ন্যাগ্রোধস্য তলে ময়া নন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গণে দৃষ্ট কৃষ্ণ ইতি — × × ×"

উমাপতি ধরের হরিক্রীড়ার পদে পাই—কৃষ্ণ যখন পথ দিয়া যাইতেছিলেন তখন গোপ-রমণীরা ঈষৎ হাসি ও কটাক্ষের দ্বারা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছেন এবং দূরে হইতে তাহা দেখিয়া যেন গর্ব জনিত অবহেলায় রাধার আনন বিনয়শ্রী ধারণ করিয়াছে—

"ভ্রূবল্লীশ্চলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত—জ্যোৎস্না-বিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি। গর্বোদ্ভেদ কৃতাবহেলাবিনয়শ্রী ভাজি রাধাননে সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ।"

অভিনন্দ কবির পদে দেখি—নবযৌবন উপনীত কৃষ্ণের, রাধার সহিত নর্ম ক্রীড়ার লুব্ধচিত্ত অথচ যশোদার ভয়ে ভীত হইয়া যমুনা কূলের নির্জন লতাগৃহে প্রবেশের ইঙ্গিত করিতেছে—

রাধায়ামনুবন্ধনর্মনিভৃতাকারং যশোদাভয়া—
দভাগে'র্যাতিনির্জনেষু যমুনারোধোলতাবেশ্মসু'' কৃষ্ণযৌবনম্ ২।

লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেনের কবিতায় পাই—

"আহূতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥ পদ্যাবলী / ৪

(আমি আজ রাত্রিতে ইহাকে উৎসবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি এ ঘর শূন্য রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ভৃত্যগুলিও মাতাল, এখন একাকিনী কুলবধূ কি করিয়া যাইবে? বাছা তুমিই তাহা হইলে ইহাকে ঘরে লইয়া যাও। যশোদার এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের যে মধুরস্মেরালস দৃষ্টি সমূহ তাহাদের জয় হোক। ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত—অনুবাদক)।

আচার্য গোপীক কর্তৃক রচিত একটি পদে আমরা পাই—গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ রাধার গৃহের নিকট আসিয়া কোকিলাদির নাদের দ্বারা অভিসারের জন্য সঙ্কেত করিয়াছিলেন, এই সঙ্কেত শুনিয়া রাধা দ্বার মোচন করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, এমন সময় জটিলা "কে, কে" বলিয়া চীৎকার করিলে কৃষ্ণ ব্যথিত সন্তপ্ত চিত্তে কেলিবিটপীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন—

'সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনাদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো
দ্বারম্মোচনলোলশঙ্খবলয়শ্রেণিস্বনং শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীনাদেন দূনাত্মনো
রাধা প্রাঙ্গণকোণকেলিবিটপি ক্রোড়ে গতা শর্বরী॥"

প্রশ্নোত্তর-ছলে রাধা-কৃষ্ণের শ্লেষপূর্ণ রহস্যালাপ ও রসিকতার নিদর্শনও কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে পাই—

রাধা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "এই রাত্রে তুমি কে ? কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—"আমি কেশব (শ্লেষার্থ কেশবহনকারী)।

রাধা—"মাথার কেশের দ্বারা আর কি গর্ব করিতেছ

কৃষ্ণ—ভদ্রে, আমি শৌরি (শূরের পুত্র)

রাধা—পিতৃগত গুণের দ্বারা কি হইবে ?

কৃষ্ণ—"হে চন্দ্রমুখী, আমি চক্রী (শ্লেষার্থ কুম্ভকার)

রাধা—"বেশ আমাকে, কলসী, ঘটি, দুধ

দুহিবার ভাঁড় কিছু দিতেছ না কেন

কস্তুং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্বায়সে ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্য কিং স্যাদিহ। চক্রী চন্দ্রমুখী প্রবচ্ছসি ন মে কুণ্ডীং ঘটীং দোহিনী—

মিথঃ গোপবধূহৃতোত্তরতয়া দুঃস্থা হরিঃ পাতু বঃ ॥"

(এই পদটি পদাবলি গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরম্/৩)

শতানন্দ কবির পদে পাই গোবর্ধন ধারণে কৃষ্ণের কষ্ট হইতেছে, রাধা সেজন্য ব্যথিত, কৃষ্ণকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি শূন্য গগনে হাত তুলিয়া গোবর্ধন ধারণ করিতেছেন বলিয়া দেখাইতেছেন—

"শৈলোদ্ধারসহায়তাং জিগমিষোরপ্রাপ্তগোবর্ধনা
রাধায়াঃ সুচিরং জয়ন্তি গগনে বন্ধ্যাঃ কর ভ্রান্তয়ঃ ॥

(গোবর্ধনোদ্ধারঃ, ৩)

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতে শুরু করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মধুর রসাত্মক কবিতার মূল উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এই প্রেমলীলা চিত্রনে দুইটি দিক দেখিতে পাই—একদিকে দেবলীলা-বর্ণনার আত্মপ্রসাদ,

অপর দিকে মানবিক প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসবিচিত্র-লীলাকে রূপদান করিবার প্রয়াস ঐ যুগের কবিদের প্রচেষ্টা। এই ভাবেই ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়— "কানু ছাড়া গীত" নাই। বাংলায় প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণই ছিলেন মূল বিষয়বস্তু।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে একটি সুসংগত রূপদান করেন জয়দেব। জয়দেবের অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেন বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যটি রচিত হয় প্রাক্-চৈতন্যযুগে এবং সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভোগের কবি। কাব্যটি আদি রসাত্মক। এই কাব্যে একদিকে জয়দেবের প্রভাব যেমন লক্ষণীয় অপর দিকে তেমনি বাৎসায়নের কামসূত্র ও সংস্কৃত প্রাকৃত, উদ্ভট শ্লোকাবলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু পুরাণেরও কিছু প্রভাব আছে।

জন্মখণ্ডে বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবতের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে—

"কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে"

কংসের অত্যাচারে সৃষ্টি ধ্বংস হইবে মনে করিয়া দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে শ্রীহরি স্তব করেন। স্তবে প্রীত হইয়া শ্রীহরি বলেন যে বাসুদেবের ঔরসে এবং দেবকীর গর্ভে "শুক্লকেশ" রূপে বলরাম এবং 'কৃষ্ণকেশ' রূপে শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন—

"ধলকাল দুই কেশ দিল নারায়ণে"

ভাগবতে পাই—

"ভূমে সুরেতরররূবিমন্দী তায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সীতকৃষ্ণকেশঃ

বিষ্ণুপুরাণে পাই— "এবং সংস্তুয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ
উজ্জহারাত্মন ঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে।"

রাধার জন্মবৃত্তান্ত কোনো পুরাণ হইতে গৃহীত হয় নাই। রাধার বয়োবৃদ্ধি কুমার সম্ভবের উমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তুলনীয়—

"দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা
পুরিব যেহেন চন্দ্রকলা"— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

"দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষাণ্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি।" —কুমারসম্ভব

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে রাধার অপর নাম—চন্দ্রাবলী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়াছেন এবং কৃষ্ণের নাম—রাম, বুদ্ধ ও কল্কীর পর দেখাইয়াছেন—

"শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বাঁধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধরূপে ধরিআঁ চিন্তিলে নিরঞ্জন।
কলকীরূপে তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্ট জন।
এবেঁ উপজিলা কংস বধের কারণ।"

ভাগবতে শারদ-রাস বর্ণনায় পাই—গোপীগণ কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশায় কাত্যায়ণী পূজা করিতেছেন। শারদ রাসে কাত্যায়ণী ব্রত-পরায়ণা কুমারী-গণের মনোবাসনা পূর্ণ করাই ব্রজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরহ খণ্ডে দেখি, কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য বড়ায়ি রাধাকে চণ্ডীপূজা করিতে বলিতেছে—

"বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে মানিআঁ
তবে তার পাইবেঁ দরশনে।"

বড়ু চণ্ডীদাসের বহু পদে জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"নীল উৎপল তোর নয়নে।
এ হাত মোরপাশু লাখ দানে।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন / দানখণ্ড

তুলনীয়—

"নীলনলিপাভমপি তন্বি তব লোচনম্
ধারয়তি কোকনদ রূপম ॥" গীতগোবিন্দ / ১০ / ৬

"তিন ফুল জিনী নাসা কম্বু সমগলে
কনক যূথিকামালা বাহু যুগলে।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

তুলনীয়—

"বন্ধু কদ্যুতিবান্ধবোহয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি—
গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রী মোচনং লোচনম্।" গীতগোবিন্দ ১০০১৫

তুলনা মূলক বিচারের জন্য অনুরূপ বহুপদ উভয় কবির রচনা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্যবোধে তাহা পরিত্যাগ করা হইল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রেম-লীলা কোনো পুরাণ সম্মত নহে। এখানে লৌকিক প্রেম-কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কাব্যটিতে কৃষ্ণের ঐশ্চর্যরূপ প্রকাশের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, সঙ্গে রহিয়াছে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য। কৃষ্ণকে কামুক ও ইন্দ্রিয়াসক্ত রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এবং তাঁহার বিভূতি ও ঐশ্চর্যের কথা বার বার উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া রাধাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে—

"আহ্মে দেব সংসারের উপরে।"

* * *

বেদ উদ্ধারিলো ক্রীড়া সাগর জলে
লীলএ আহ্মে মুরারী
দৈত্য দানিলোঁ আসুর সংহারিলোঁ
শঙ্খচক্র গদাধারী।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে স্থূলতা, অশ্লীলতা থাকা সত্বেও কতকগুলি পদে কবির গভীর সৌন্দর্যবোধ ও শালীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।—

"নিশি আন্ধি আরি তাহাতে কেমনে নারী ॥"
জিত্র সে যাহার পাশত পুরুষ নাহী।" (বিরহ খণ্ড)

"তার শুভদিন ভৈল সেসি পদুমতী
যে নারীক সঁঞা কাহ্ন ভুঞ্জে সুখ রাতী।" (বিরহ খণ্ড)

কিছু সংখ্যক পদে আধ্যাত্মিকতার অভাব নাই—

"বাঁশরী শবদে চিত্ত বে-আকুল বড়ায়ি
যাইবোঁ তার অনুসারে"

অথবা—

"দহ বুলি ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল
মোঞেঁ নারী বড় অভাগিনী"

এই পদগুলিতে যেন চির বিরহীর আকুল ক্রন্দন ধ্বনি জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

এই জাতীয় পদগুলির মধ্যে চৈতন্যোত্তর যুগের মহাভাবময়ী রাধার রূপটির পূর্বরূপ অনুভব করতে পারা যায়। শৃঙ্গারের পরিবর্তে ভক্তিরসের স্পর্শ সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমাপ্তির মধ্যেই বৈষ্ণবপদাবলীর পদযাত্রা সুরু হইয়াছে। বিশেষতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধার বিরহেতে বৈষ্ণবপদাবলীর অরুণোদয় পর্ব সুরু হইয়াছে— ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মিথিলা-রাজ শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্তী কবি। বিদ্যাপতি জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন—

শিরীষ কুসুম কোঁঅলী
অদভুত কনক পুতলী॥ (জন্মখণ্ড। বড়ু চণ্ডীদাস)

তুলনীয়—

"শিরিষ কুসুম তনি
অতি সুকুমার ধনি॥ বিদ্যাপতি।

"লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি ল লো
রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ॥ দানখণ্ড।

তুলনীয় ঃ—

"লুনিক পুতলি তনু তায়।
আতপ তাপে মিলায়।" বিদ্যাপতি।

* * *

কাহ্নাঞি বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন। [বংশীখণ্ড]

তুলনীয়—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী।" বিদ্যাপতি।

আর তুলনামূলক পদ উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করা হইল।

বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা হইলেও বিদ্যাপতি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না। তাঁহার ধর্মমত ছিল অন্য। তিনি ছিলেন শিল্প-প্রবুদ্ধ চিত্তের অধিকারী। তাই খাঁটি রসকাব্য রচনার জন্য রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেই তিনি তাঁহার আলম্বন বিভাব হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির, রাধাকৃষ্ণের লীলারহস্য বর্ণনার মধ্যে আমরা পাই— প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে যাত্রা। এই অপ্রাকৃত প্রেম চৈতন্যোত্তর যুগে যতটা পরিস্ফুট, বিদ্যাপতির রচনায় ততটা পরিস্ফুট নহে। বড়ু চণ্ডীদাসের মতো তাঁহার পদেও আদিরসের প্রাচুর্য রহিয়াছে। "বয়সন্ধি" শীর্ষক পদগুলিতে এই ভাবটি স্পষ্ট। তাঁহার পূর্বরাগের পদগুলিও মানবীয় রসে পরিপূর্ণ। বিদ্যাপতির রচনায় ততটা পরিস্ফুট নহে। বড়ু চণ্ডীদাসের মতো তাঁহার পদেও আদিরসের প্রাচুর্য রহিয়াছে। "বয়সন্ধি" শীর্ষক পদগুলিতে এই ভাবটি স্পষ্ট। তাঁহার পূর্বরাগের পদগলিও মানবীয় রসে পরিপূর্ণ। বিদ্যাপতির রাধা চতুরা ও প্রগল্‌ভা। কৃষ্ণ দর্শনের পর রাধা মুগ্ধা। কৃষ্ণ দর্শনলাভের আশায় উদ্‌গ্রীব। স্নান সমাপন করিয়া ফিরিবার পথে কৃষ্ণ-দর্শন অভিলাষে রাধা হার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—

"তঁহি পুন মোতি হার তোড়ি ফেকল
কহত হার টুটি গেল
সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশন ধনি লেল।"

বিদ্যাপতির রাধার দুইটি রূপে আমরা পাই— বয়ঃসন্ধিতে তারুণ্যে ভরপুর, পূর্বরাগে কিছু ভীতি বিহ্বল, কিছু ব্রীড়া-কুণ্ঠিতা, কৃষ্ণের আহ্বানে দেহধর্ম সম্পর্কে অর্ধচেতন বা পূর্বচেতন এবং রতিক্রিয়াতে ভীতি ও আর্তনাদ দর্শন। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত বিহ্বল।"

রাধার দ্বিতীয় রূপটি হইতেছে বিদগ্ধ রসবতী নারী; যাঁহার বচনে চাতুরী, আঁখিতে কটাক্ষ, ভূষণে বিদ্যুৎচ্ছটা, শিঞ্জিনীতে আহ্বান। সেইজন্য চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তা চণ্ডীদাসের রাধার সঙ্গে বিদ্যাপতির রাধার পার্থক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মানের অবসানে বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"তহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ
মদন সাখী করি খত লেখি দেহ।"

রাধা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া চুক্তি সম্পাদন করিতে চাহিতেছেন; ইহা পদকর্তা চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের রাধা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। এই না পারার মধ্যে রহিয়াছে দুইটি যুগের ভাবধারা। এই দুইটি যুগ হইতেছে প্রাক্‌চৈতন্য যুগ এবং চৈতন্যোত্তর যুগ। বিদ্যাপতি প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদকর্তা হইলেও তাঁহার পদে আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনার অভাব নাই—

"বরিস পয়োধর ধরণী বারিভর
রয়নী মহাভয়ভীমা।"

• • • •

অংকুর তপন তাপে যদি জারব
কি করবি বারিদ মেহে।
ঈ নব যৌবন বিরহে গোমায়ব
কি করব সো পিয়া নেহে॥

* * * *

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।
গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি
যব তহুঁ করবি বিচার
তহুঁ জগন্নাথ জগত কহাওসি
জগ বাহির নহো মুঞি ছার॥

বিদ্যাপতির বহুপদে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হইলেও তাঁহার পদে অতৃপ্ত একটা 'জিজ্ঞাসা' ধ্বনিত হইয়াছে—

"তহুঁ কৈছে মাধব কহ তহুঁময়।

× × × ×

"সখি কি পুছসি অনুভব ময়।"

বিদ্যাপতির আক্ষেপ পদে জীবন অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করায়—

"আধ জনম হাম নিদেঁ গোমায়লু
জরা শিশু কতদিন গেলা"

এ যেন মাইকেল মধুসূদনের "আত্মবিলাপ" এর পূর্বাভাস—

"রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি।"

তাই আমরা দেখি— চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গিটী বিদ্যাপতির রচনায়ও সম্যক ভাবে পরিস্ফুট নহে। ইহার কারণ, বিদ্যাপতি কবি, ভক্ত নহেন, তিনি ভোক্তা, দৃষ্টিতে তাঁহার ছিল— আসক্তি।

— ভবানন্দ —

ভবানন্দ হরি-বংশের রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হরিবংশের রচনাকাল সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই। হরিবংশ, বাংলা ১৩৩৭ সালে শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সতীশ চন্দ্র যে পাঁচখানা পুঁথি অবলম্বনে গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি গ্রন্থের লিপিকাল ৩৫০ শত বৎসর পূর্বের। তবে ইহা মূল নহে। ময়মনসিংহ শ্রী অঞ্চলের পুঁথি। গোয়ালপাড়া জিলায় (বিশেষতঃ এই গ্রন্থকারের নিকটও) এই পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ফলে অনুমান করা যাইতে পারে যে গ্রন্থকার আরও ১০০ / ১৫০ পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এবং তিনি প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি। এই অনুমান করার অপর কারণ হইতেছে—ইহা একান্ত ভাবেই আদি রসাত্মক উপরন্তু চৈতন্যপ্রভুর কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবও দৃষ্ট হয় না। লেখক বলিয়াছেন—

"সত্যবতী সুত বাস নারায়ণ অংশ
সংক্ষেপে রচিল পুণ্য শ্লোক হরিবংশ"

এই "হরিবংশের" কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

— রূপ গোস্বামী —

বাংলাদেশের রামকেলি নগরে অবস্থান কালে রূপ গোস্বামী "পদ্যাবলী" সংকলন করেন। ইহাতে বাঙালি কবি রচিত কৃষ্ণের ব্রজ-লীলা-ঘটিত ও দ্বৈতবাদী ভক্তি সংকলিত বহু প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক সংগৃহীত করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েক জন কবির রচনাও এই সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে— জগদানন্দ রায়, কেশব ভট্টাচার্য, কেশব ছত্রী, গোবিন্দ ভট্ট, মুকুন্দ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কৃষ্ণভক্তির আদর্শে পদগুলি সংকলিত। গোবিন্দ ভট্টের একটি পদে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনির মোহিনী শক্তির কথা পাওয়া যায়। ভক্তির সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাও তিনি করিয়াছেন। পরবর্তী-কালে রূপ গোস্বামী যে বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র লিখিয়াছেন তাহা যেন এই

সঙ্কলিত গ্রন্থের আদর্শেই রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ভাব বিদ্যমান—

সত্যং জল্পসি দুঃসহাঃ খলগিরঃ
সত্যং কুলং নির্মলং সত্যং
নিষ্করুণোঽপ্যয়ং সহচরঃ সত্যং সুদূরে সরিৎ
তং সর্ব্বং সখি বিস্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্জায়তে
চেদুন্মাদ-মুকুন্দ-মঞ্জু মুরলীনিঃশ্বান রাগোদ্গতিঃ।

(সখি তুমি যথার্থই বলিতেছ, খলবাক্য দুঃসহ, ইহাও সত্য যে আমার কুল নিষ্কলঙ্ক, ইহাও সত্য এই সহচর নিষ্ঠুর, এবং যমুনাতীর অনেক দূর। তথাপি সখি এ সমস্তই আমি তখন ভুলিয়া যাই,—যে মুহূর্তে মুকুন্দের মধুর মুরলী নিঃসৃত উন্দামরাগিণী আমার কর্ণে প্রবেশ করে। অনুবাদক—ডঃ সুকুমার সেন / পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাস / ১ম খণ্ড ২৭২।

কেশব ভট্টাচার্য্য মাথুর বিরহের পদ রচনা করিয়াছেন। উদ্ধবকে দিয়া রাধা মথুরায় কৃষ্ণকে এই অনুনয় বাণী প্রেরণ করিতেছেন—

"আস্তাং তাবদ বচনরচনাভাজনত্বং বিদূরে
দূরে চাস্তাং তব তনুপরীরম্ভসম্ভাবনাপি
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিন্তু যাচে বিধেয়া
স্মারং স্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা মমাপি।"

সাক্ষাতে পরস্পর বাক্যালাপের অবকাশ দূরে থাকুক, তোমার তনু স্পর্শলাভের সম্ভাবনা সুদূর হউক কেবল বার বার প্রণতি করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি তুমি স্বজন গণনার কালে আমার নামে একটি রেখাপাত করিও। ডঃ সুকুমার সেন কৃত অনুবাদ। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড / পৃঃ ৭২)

সর্ববিদ্যাবিনোদ রচিত একটি শ্লোকে (পদ্যাবলীতে সংগৃহীত) দূতী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতির সঙ্কেত জানাইতেছেন—

"পন্থাঃ ক্ষেমময়োঽস্তু তে পরিহর প্রত্যূহসম্ভাবনাম্
এতন্মাত্রমধারি সুন্দরী ময়া নেত্রপ্রণালীপথে

নীরে নীলসরোজমুজ্জলগুণং তীরে তমালাঙ্কুরঃ
কুঞ্জে কোঽপি কালিন্দ-শৈলদুহিতঃ পুংস্কোকিলঃ খেলতি"

(তোমার পথ মঙ্গলমত হউক। বিঘ্নের লেশমাত্র আশংকা করিও না। সুন্দরি আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম, কালিন্দী নীরে, একটি উজ্জ্বল নীলপদ্ম, তীরে একটি নবীন তমালতরু এবং কুঞ্জে একটি পুং কোকিল খেলা করিতেছে)।

উপরিউক্ত আলোচনাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রাক্‌চৈতন্যযুগে ভক্তিভাব তখনো গাঢ় হইয়া উঠে নাই। এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাতে অধ্যাত্মবাদ অপেক্ষা বাস্তববাদ অধিকতর প্রকটিত। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যে ভক্তিরসের স্রোত প্লাবিত হইয়াছিল তাহার প্রবর্তয়িতা হইতেছেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।

— চৈতন্য অবতার —

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মালাধর বসু ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তার কথা সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এইরূপ সহজ ও সরলভাবে বাংলা ভাষায় প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে আর কেহ বলেন নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণভক্তির স্রোত নূতন খাতে বহিতে সুরু করে। এই গতিপথে যে একটা বাঁধ ছিল, মাধবেন্দ্রপুরী তাহার আগলমুক্ত করিয়া দিয়া একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটান। মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতমতে দীক্ষিত সন্ন্যাসী অথচ কৃষ্ণ-রসে পরিপূর্ণ।

ভাগবতীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় মাধবেন্দ্র তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন—

এবংব্রতঃ স প্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তি
উন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ"।

[ভাগবত ১১ / ২ / ৩৮]

এই নিষ্ঠা লইয়া তিনি প্রিয়ের নাম কীর্তন করিতে করিতে অনুরাগ ভাবে আকুলচিত্ত হইয়া অট্টহাস্য করেন, রোদন করেন, বিলাপ করেন, গান করেন। সংসার ত্যাগী পাগলের মতো নৃত্য করেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর মুখ্য এবং প্রিয় শিষ্য ছিলেন ঈশ্বরপুরী। এই ঈশ্বরপুরী চৈতন্যদেবের দীক্ষা গুরু। চৈতন্যদেবের অধ্যাত্ম-জীবন সুরু হয় তাঁহার সংস্পর্শে। মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণ-বিরহে তাপিত হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন—

"অয়ি দীনদয়াদ্র' নাথ হে মথুরানাথ
কদাবলোক্যসে হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং দয়িত
ভ্রাম্যতি কি করাম্যহ্যম্ ॥"

(ওগো দীনদয়াল স্বামী, ওগো মথুরানাথ, তুমি কবে দেখা দিবে ? হে প্রিয়, তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় যে মথিত হইয়া যাইতেছে, হে নাথ, বল আমি কি উপায় করি)।

চৈতন্য প্রভুর জীবনে ইহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। চৈতন্যপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম একটি অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় পথে যাত্রা করিয়া সমগ্র বাঙালি জাতির হৃদয়কে মথিত ও দ্রবীভূত করিয়াছে।

প্রাক্-চৈতন্যযুগে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার মধ্যে আদিরসের যে ছড়াছড়ি ছিল তাহা চৈতন্য-প্রভু দিব্য উন্মাদনার মধ্য দিয়া সেই আদিরসের আবিলতাকে একেবারে বিদূরিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার কারণ স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ

অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধিকা আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন সেই অদ্ভুদ মাধুর্যই বা কিরূপ, আর আমার অনুভব জনিত সুখধারা শ্রীরাধার অন্তরে কিভাবে আস্বাদিত হয়, তাহা জানিবার জন্য লোভবশতঃ রাধাভাব সম্পন্ন হইয়া শচীগর্ভরূপ সমুদ্রে চৈতন্যচন্দ্র জন্মলাভ করিয়াছেন। ইহাকেই পদাবলী সাহিত্যে বলা হইয়াছে—

"রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ
তিন সুখ আস্বাদিতে হয় অবতীর্ণ ॥

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ স্বরূপ আর বলা হইয়াছে।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ, কলৌ
সমর্পয়িতুমন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। (রূপ গোস্বামী)

চির অনর্পিত যে মধুর রসাশ্রিত ভক্তি-সম্পদ, তাহা সম্যকরূপে প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়া কলিযুগে এই ধরা-ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১১ / ৫

পণ্ডিতগণ সেই কৃষ্ণবর্ণ অথচ জ্যোতিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর বর্ণ সেই ভগবানকে সংকীর্তন মহোৎসবরূপ যজ্ঞের দ্বারা ভজনা করিয়া থাকেন। বেদাদি শাস্ত্রে এবং বিবিধ পুরাণে শ্রীভগবানের নামগুণ লীলা-কীর্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিতে শ্রীভগবানের নাম কীর্তন একমাত্র ধর্ম—

"সত্যে যদ্ ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ"।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞে, দ্বাপরে
পরিচর্য্যায় এবং কলিতে হরি কীর্তনে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"।

(হরি নাম শুধু হরিনাম, কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন গতি নাই)

নাম করিতে গেলে নামীর কথা উঠে। সেই নামীর রূপের কথা, গুণের কথা, তাঁহার বিবিধ লীলার কথা স্মৃতি পথে আসিয়া জাগরূক হয়। নিষ্ঠা সহকারে গান করিলে সর্বসিদ্ধি হইবে— ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। নাম-গুণ লীলার মধ্যে রূপের কথা মাখামাখি হইয়া আছে। লীলাগানের কথায় শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরমদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবৎ।

(হে নৃসিংহ, তোমার চরণযুগল আশ্রয়কারী, মহাজ্ঞানী ভক্তগণের সঙ্গবলে রাগাদি পরিহার প্রিয় সুহৃদ ও পরম দেবতা স্বজন তোমার বিরিঞ্চি-গীত মহিমময়ী লীলাকথা কীর্তন করিয়া আমি সমস্ত দুঃখ তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞানে অতিক্রম করিব।) চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার
কলিযুগে ধর্ম নামসংকীর্তন সার॥"

সংকীর্তন প্রচার চৈতন্যবতারের মূলসূত্র। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে কীর্তনের সৃষ্টিকর্তা বলিয়াছেন—

ভট্টাচার্য কহে তোমার সুসত্য বচন
চৈতন্যর সৃষ্টি এই নাম সংকীর্তন।"

চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে চৈতন্যদেব ও প্রভু নিত্যানন্দকে বন্দনা করিয়া বলা হইয়াছে—

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ

অর্থাৎ যাঁহাদের ভুজযুগ আজানুলম্বিত, নির্মল কণক-কান্তি যাঁহাদের দেহ, নয়ন যাঁহাদের কমলায়ত, যাঁহারা সংকীর্তনের প্রবর্তক, যুগধর্মপালক ও প্রেম-ভক্তি দ্বারা বিশ্বপোষক, সেই দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ জগত মঙ্গলকার, করুণাবতার শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করি।

কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাবের পূর্বেও এ দেশে কীর্তন প্রচলিত ছিল। তবে এমন সমবেত ভাবে, সমাজের এমন অভিনব সমতলে ব্রাহ্মণ, চণ্ডালে মিলিয়া কীর্তন গানের প্রচলন ছিলনা। ইহার সত্যকারের প্রবর্তক হইতেছেন— মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। চৈতন্যপ্রভু এবং নিত্যানন্দের পূর্বে কীর্তনকে এইরূপ ভাবে জাতি গঠনের জন্য কেহ প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে— "সংকীর্তনৈকপিতরৌ" বলা সার্থক।

সত্যই মহাপ্রভু সমাজের ভেদাভেদের উপর কুঠারাঘাত হানিয়া সমাজে ভেদনীতি দূর করিয়াছিলেন। মুসলমান অভিযানের সময়ে বাংলাদেশে আর্য ও অন-আর্যদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহার অবসান ঘটাইয়া বাঙালি জাতিকে একীকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৪ সালে "চিঠিপত্র"তে বলিয়াছেন—

"আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই চৈতন্যদেব জন্মিয়াছিলেন—তিনি বিস্তৃত মানব-প্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনতো সাম্যভাব, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলির সৃষ্টি হয় নাই।"

চৈতন্যপ্রভু প্রবর্তিত কীর্তন গানের মূল প্রতিপাদ্য হইতেছে—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্" ॥

এই কীর্তন অর্থে সাধারণতঃ কৃষ্ণের গুণ কীর্তনকেই বুঝায়। কথকতা, ভাগবৎ পাঠও কীর্তন পদবাচ্য হইয়া থাকে। তবে বৈষ্ণব যুগের পর হইতেই 'কীর্তন' বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, এই বিশিষ্ট অর্থ হইতেছে পদাবলী সঙ্গীত। ইহার ধ্যান-ধারণা আলাদা এবং অপরাপর সঙ্গীত হইতে পৃথক। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে কীর্তন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

নামলীলা-গুণাদীনা উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"

(নামলীলা ও গুণাবলীর উচ্চভাষণকে কীর্তন বলে।) তাই কীর্তনের দুইটি রূপ নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন।

অধ্যাপনার সময়েও চৈতন্যদেবের অন্তরে ভাবের উদয় হইত। তিনি ছাত্রদের অনেক সময় পড়াইতে পারিতেন না, বলিতেন তোমরা অন্যত্র গিয়া অধ্যয়ন কর। আমি অধ্যাপনা করিতে পারিব না।"

অধ্যাপনা কালেও সর্বশাস্ত্রের মূলাধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চৈতন্যপ্রভুর মনে পড়ে, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দেখেন যে তিনি মুরলী বাজাইতেছেন ছাত্রেরা চৈতন্যপ্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন—

"তোমার মুখেতে শুনিলাম যে ব্যাখ্যান
জন্ম জন্ম হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান।"

(চৈতন্য ভাগবত)

শিষ্যেরা বলিতেন— তাঁহাদিগকে দয়া করিয়া কীর্তনগান শিখাইয়া দেন। চৈতন্য ভাগবতে তাহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—

"শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্তন
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ মধ্যখণ্ড

পূর্বে কীর্তন ছিল, পদাবলী ছিল, সঙ্গীত ছিল কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যেভাবে কীর্তনে দেশ মাতাইয়া ছিলেন তাঁহার পূর্বে আর কেহ এইরূপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কীর্তনে পাষণ্ড, বিধর্মী, নাস্তিক, ভণ্ড, সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের হৃদয়াভিষিক্ত কীর্তন গান মর্তমানবের বিরহ-মিলনের হাসি-কান্নাকে ঊর্ধ্বলোকে বৈকুণ্ঠের পথে পাঠাইয়া দিয়াছে। কীর্তনের সুরে ফুকারিয়া উঠিল দেহপাশবদ্ধ বিরহী মানবাত্মার ব্যাকুল বেদনা; যাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— "অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দন ধ্বনি। বিজন-কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটি মাত্র বিরহিনীর বৈঠকী কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দন ধ্বনি।"

—০—

—ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ—

[চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম]

— প্রেম —

চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল হইতেছে—প্রেম ও ভক্তি। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চৈতন্যদেবের ধর্মমত সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতামিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

ব্রজনন্দন কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র আরাধ্য দেবতা, তাঁহার ধাম বৃন্দাবন। ব্রজগোপীগণ যে ভাবে উপাসনা সুরু করিয়াছেন সেই মনোমুগ্ধকর শ্রুতিমধুর উপাসনাই একমাত্র উপসনা। শ্রীমদ্ভাগবত তাহার শাস্ত্র এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—

"পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন" চৈতন্য চরিতামৃত / মধ্যলীলা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃষ্ণ-প্রেমকেই পরম পুরুষার্থ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কলিযুগে চৈতন্যপ্রভু এই ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা এবং ইহাকেই ব্যাখ্যা করিয়া চৈতন্যদেব জগতের কাছে ধর্ম মতের একটি বিচিত্র আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরে ভক্তি সকল ভক্তিরই প্রতিপাদ্য বিষয়। বৈষ্ণবেরা তাহাকেই বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে (শাণ্ডিল্যসূত্র)।

'নারদে" এ বলা হইয়াছ— "সা কস্মৈ পরম-প্রেমরূপা"।

এই পরমানুরক্তি পরমপ্রেমরূপ ভক্তি, কিরূপ? এই ভক্তিই হইতেছে— প্রেম। এই প্রেমই হইতেছে পূজা,—যার নাম প্রেম তার নাম পূজা। প্রেমাস্পদকে পূজা করাই বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ। এই

প্রেমধর্ম বা প্রেমাত্মক-দর্শন ভারতীয় জীবনে লইয়া আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের প্রভাবে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তিতে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করে। এই প্রেম ও ভক্তিতে কোন জাতি নাই, শ্রেণী নাই, কুলের কথা নাই, ভক্তি ও প্রেম মানুষের পরিচয়, শ্রেষ্ঠ সম্পদ—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বাপচাধমঃ"।

হরিভক্ত চণ্ডাল দ্বিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু এই বাণী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধ্যে জীববাদের সমুচ্চ আদর্শ স্থাপন করে।

ধর্মে যে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও সর্বজনীন রূপ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের ধ্যান ও জ্ঞান; বৈষ্ণব ধর্মের মধ্য দিয়া তাহাই প্রতিষ্ঠিত করেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। সহজ কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহনা চিনয়ে তারে।
প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে
সেই সে বুঝিতে পারে।

বৈষ্ণবদের এই প্রেমধর্ম ও মন্ত্র তদানিন্তন কালের মায়াময় অলীক সৃষ্টিকে সত্য সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, বিন্দুকে সিন্ধুর মহিমা দান করিয়া মর্তলোককে অমর্তালোকের মহিমা দান করিয়াছে; অপরদিকে আমাদের ঘরোয়া জীবনের ছোটখাট স্নেহ প্রেম ও ভক্তি বাৎসল্যাদি হৃদয়-বৃত্তি গুলিকে এক অপরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রদান করিয়াছে। ব্যক্তি-জীবনে, নিত্যজীবনে প্রকাশিত এই সকল হৃদয়বৃত্তিই ঈশ্বরোপলব্ধির অব্যর্থ পাথেয় রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ "পঞ্চভূত" এর 'মনুষ্য' শীর্ষক নিবন্ধটিতে বৈষ্ণবদের এই প্রেম সম্পর্কে বলিয়াছেন— "যাহাকে আমরা ভালোবাসি" কেবল তাহারই মধ্যে-অনন্তের পরিচয় পাই এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা। সমস্ত বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।

বৈষ্ণবধর্ম সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন সে আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্চর্য অনুভব করিয়াছে। তাই গোপীগণ ভগবানকে বলিয়াছেন—

"প্রেষ্ঠো ভবান্ তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।"

অর্থাৎ তুমি সকলের পরম প্রিয়, বন্ধু এবং আত্মাস্বরূপ। মানুষ আত্মাকে যেমন ভালবাসে, এমন আর কোনো বস্তুকে ভালবাসে না। পুত্র কলত্র সমস্তই "আত্মনস্তু কামায় প্রিয়ো ভবতি"। কিন্তু আত্মা কাহারো জন্য প্রিয় নহে, সেই জন্য আত্মাকে বলা হইয়াছে— "নিরুপাধি প্রেমাস্পদ"। তাই বলা হইয়াছে— আমরা তোমার নিকট কোনো কামনা বাসনা লইয়া আসি নাই। তোমাকে একান্ত ভালবাসি, তোমার চেয়ে আর আমাদের প্রিয় কিছুই নাই, তাই জাতি কুলমানে তিলাঞ্জলি দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি তোমার কাছে— ইহাই গোপী প্রেমের মূলসূত্র। এই প্রেম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে লাভ করা যায়, চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়"!

ব্রজগোপীদের নিকট কৃষ্ণ ব্যতিত আর কিছুই নাই। তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণই একমাত্র প্রিয় এবং একমাত্র "কান্ত" সেখানে কোনো ঐশ্চর্য-বুদ্ধি নাই। ঐশ্চর্যবুদ্ধি থাকিলে প্রেমের বিকাশ ঘটিতে পারে না। কারণ সেখানে জাগতিক বুদ্ধিই প্রাধান্য লাভ করে, সূক্ষ্ম অনুভূতির কোনো স্থান সেখানে থাকিতে পারে না। এই কথাকে অবলম্বন করিয়া কবিরাজ কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

"ব্রজলোকের ভাব পাই তাঁহার চরণ।
তারে ঈশ্বর করি না মানে ব্রজজন॥
কেহ তারে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে কান্ধে"

চৈতন্য-চরিতামৃত।

মাধুর্যভাবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ইহাই। চৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাই—

"নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য গোপীভাববর্য॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার,
কৃষ্ণ সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥

গোপীরা নিজ সুখ প্রার্থী নহেন, তাঁহারা সর্বদা কৃষ্ণ সুখপ্রার্থিনী।

বৈষ্ণবদের নিকট কৃষ্ণ অনন্ত ঐশ্চর্যের অধিকারী নহেন, নিগুর্ণ পরমব্রহ্মও নহেন, তিনি বৈষ্ণবদের পরমাত্মীয়—

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণ পতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

চৈতন্য-চরিতামৃত / আদিলীলা

স্বামী বিবেকানন্দ এই গোপী প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

'প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই কেবল তোমরা গোপী প্রেম কি, তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিস যে সব ত্যাগ না হইলে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। × × × কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই গোপীপ্রেম শিক্ষা। × × গোপীপ্রেম ঈশ্বর রসাস্বাদের উন্মাত্ততা ঘোর উন্মাত্ততা মাত্র বিদ্যমান। × × × যখন সমস্ত জগৎ তোমার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোনো কামনা থাকিবে

না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্ত শুদ্ধি হইবে তখনই তোমারা গোপীপ্রেমের অহৈতুকী প্রেমের শক্তি বুঝিবে। যখন এই প্রেম পাইবে, তখন সব পাইবে।"

প্রেমাদর্শে বৈষ্ণবদের নিকট ভগবান কৃষ্ণ যেমন ঐশ্চর্য বর্জিত আত্মার আত্মীয় প্রাণের প্রাণ, রাধা মূর্তিও অনুরূপ। বৈষ্ণব দৃষ্টিতে রাধা অখণ্ড বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে প্রণয়লীলা রত। কৃষ্ণ যেমন প্রিয়ের বেশে ভক্তচিত্তের যাবতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা, আকুতি পরিপূর্ণ করেন, রাধাও ঠিক তেমনি ভক্তচিত্তের অশান্ত ও অফুরন্ত কামনা-বাসনা ও ব্যাকুল বেদনার মূর্ত প্রতিমূর্তি। পদাবলী-সাহিত্যের রস—মধুর। এবং ইহা আলংকারিদের 'শান্ত' রসের সমগোত্রীয়। কিন্তু যে বংশীধ্বনি বারবার আকর্ষণ করিয়া গোপনারীদের কাছে টানিয়া আনিতেছে, তাহাও মিলনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ মিলনের মধ্যেও বিরহ— "দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"।

অথবা— "নিমিখে মানয় যুগ, কোরে দূর মানি"।

এ বেদনা কিসের? ভাবসম্মিলনের উল্লাসের মধ্যেও সেই কারুণ্য। যে মিলনের জন্য রাধা—

'চীর চন্দন উরে হার ন দেলা
সো অব গিরিনদী আতর ভেলা"

তুঃ— "হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ ॥"

(১০৭১ / দামোদর গুপ্ত / কাব্যপ্রকাশ / মম্মটের অষ্টম উল্লাসেও ধৃত।)
(যাঁহার সঙ্গে ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে বলিয়া অর্থাৎ নিবিড় আলিঙ্গনে বাধা হইবে বলিয়া বক্ষে বসন, চন্দন এবং হার পর্যন্ত রাখি নাই, আমার সেই প্রিয়তম ও আমার মধ্যে এখন কত গিরি নদীর ব্যবধান হইয়াছে (তবুও বাঁচিয়া আছি)। এই যে হাহাকার, এই যে আর্তি, এই যে আকুলতা— একি শুধু কালিন্দীর এপার ওপার! যাঁহাকে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল"।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন ন গেল।" বিদ্যাপতি

ইহাতে অতৃপ্তির বাণী। এই অতৃপ্তি হইতেছে. যে-প্রেম সম্ভোগে তৃপ্তি পায় না, বিরহের মধ্যে যাহার দীপ্তি অম্লান রেখ, সেই প্রেমের কথা, সেই অতৃপ্ত প্রেমের কথা। মানব জীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, সসীমতা, অসহায়তা, আকুলতা ও বেদনার সুরই পদাবলী-সাহিত্যে ধ্বনিত হইয়াছে। তাই পদাবলী মানবাত্মার ট্র্যাজেডি। সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে"।

এই বেদনার তুলনা নাই। শরৎচন্দ্র "পথ নির্দেশ" উপন্যাসে বলিয়াছেন—

"যখন জানবে অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই যে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণব-প্রাণ, কেন যে প্রেম মিলনের অভাবে সুসম্পূর্ণ, ব্যাখ্যাতেই মধুর"— তাই এই ট্র্যাজেডি সাধারণ ট্র্যাজেডি বা Unhappy ending নহে। এই বেদনার তুলনা নাই, প্রেমেরও তুলনা নাই—

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি"। চণ্ডীদাস

রাধা যেমন কৃষ্ণের জন্য আকুল, কৃষ্ণ ঠিক তেমনি রাধার জন্য আকুল। কৃষ্ণ ভগবান— কিন্তু তিনি তাঁহার ঐশ্চর্য পরিত্যাগ করিয়া পরম অনুরাগে রাধাকে বলিয়াছেন—

রাই তুমি যে আমার গতি
তোমার কারণ রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি ॥

তাই কৃষ্ণ রাধার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছেন—

"স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহিপদপল্লবমুদারম্ "গীত গোবিন্দ / জয়দেব"।

রাধাও তেমনি প্রিয়তম কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া বলিয়াছেন—

"তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার"

× × ×

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥ চণ্ডীদাস।

বৈষ্ণব-দর্শন বা বৈষ্ণবতা এইভাবে প্রেমের দিব্য মন্ত্রে দেবতার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে এবং এই প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণবেরা প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের পথে যাত্রা করিবার এক সেতু তৈয়ার করিয়াছেন—

"স সেতুঃ বিধৃতিরেষাং লোকানাম
অসম্ভেদাচ"— উপনিষদের এই বাণী উপপত্তি মিলিয়াছে— বৈষ্ণব-জগতে। বৈষ্ণবেরা প্রেমাদর্শে-বিধি-বিদ্রোহী, আচার-অতিক্রমী মূর্তি, একদিকে যেমন স্বর্গের দিব্যাসন হইতে দেবতাকে টানিয়া আনিয়াছে একেবারে পারিবারিক জীবনের অন্তঃপুরে, তেমনি অপর দিকে এই অসামাজিক নীতি-বিগর্হিত ও প্রথানিন্দিত মানবীচত্তের প্রেমকে বেদনার জলে ধুইয়া দুঃখের দাহনে দহিয়া এক অভিনব, অচিন্তনীয় রূপদান করিয়াছে।

এই প্রেম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"The very idea of Love, the love that wants nothing love that even does not care for heaven, love that does not care for anything in this World, through this love of the Gopis has been found only solution

of the conflict between the personal and impersonal God.

(The Sages of the India, Madras Lectures)

পদাবলী-সাহিত্যের রাধা কৃষ্ণ প্রেম-মহিমার আদর্শ ও সত্য রূপটি হইতেছে—

"আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার
কৃষ্ণ-সুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥"

বিখ্যাত দার্শনিক Plato-র রসচেতনার মধ্যে গোপী প্রেমের এই রূপটি দেখিতে পাওয়া যায়— "A pure love frees man from himself and from his acts, if we would know this, we would yeild to the Divine × × × for love cannot die"

তুঃ— "For love beauty and delight
There is no death, nor change"
Sensative Plant / Shelly.

এই প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"When love becomes unbounded it carries away all oppositions before it. The sense of shame, or the fear of public denunciation can have no force to check its course. To the lover his love, then becomes all in all in whole univers".

বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল"।
× × ×
জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল।

কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিলু দুঃখ
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক" ॥

এই প্রেমাকর্ষণে দিবা রাত্তি কোনোটাই নাই—

"কিবা রাতি কিবা দিন, কিছুই না জানি
জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যামরূপ খানি ॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে ॥ বলরাম দাস

বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে প্রেমকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—স্বকীয়া ও পরকীয়া।

স্বকীয়া—

স্বকীয়া পরকীয়াশ্চ দ্বিধা তাঃ পরিকীর্তিতাঃ
করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ
পতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহঃ ॥

উজ্জ্বলনীলমণি / রূপ গোস্বামী।

স্বকীয়া **ঃ-** দ্বারকা পুরীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া মহিষী ছিল—ষোল হাজার একশত আট। ("পদাবলী পরিচয়" / হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পৃঃ / ১৩৭)। সখিগণ মহিষীতুল্যা গুণ-শালিনী, দাসীগণ তদপেক্ষা কিঞ্চিন্যূন্যা। মহিষীদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা সৌভাগ্যে বরণীয়া। ব্রজধামে কাত্যায়নী ব্রতপরা গোপকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে গন্ধর্বমতে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারাও স্বকীয়া কিন্তু প্রকাশ্যে বিবাহ হয় নাই বলিয়া তাঁহারা পরকীয়ার ন্যায় আচরণ করিতেন।

পরকীয়া **ঃ**—যে নারী ইহকাল পরকাল সম্বন্ধে কোনো ধর্মভাব না রাখিয়া অত্যাসক্তি বশতঃ পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করেন—তিনিই পরকীয়া। পরকীয়া আবার দুই প্রকার—কন্যাকা ও পরোঢ়া। কন্যাকা—যে নারীর বিবাহ হয় নাই অথচ পরপুরুষে আসক্ত, তিনিই কন্যাকা। কন্যাকারা প্রায়ই "মুগ্ধা" গুণান্বিতা। ইঁহাদের মধ্যে ধন্যা প্রভৃতি কতিপয় ব্রজকুমারী শ্রীকৃষ্ণকে পতিলাভ কামনায় কাত্যায়নীর অর্চনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহাদের কামনাও পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ইঁহারাও কৃষ্ণ বল্লভা।

পরোঢ়া ঃ—যে গোপনারীদের শাস্ত্র-বিধি অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহ হওয়া সত্বেও তাঁহারা কৃষ্ণ সম্ভোগ লালসা পোষণ করিতেন, সেই গোপনারীরা পরোঢ়া। ইহাদের গর্ভে কোন সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। ইহারা শোভা, সদ্‌গুণ ও বৈভবে, প্রেম-মাধুর্যে, সৌন্দর্যাতিশয্যে লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও সৌভাগ্য-শালিনী।

পরোঢ়া তিন প্রকারের—সাধন-পরা, দেবী, নিত্যপ্রিয়া। 'সাধন-পরা' দুই প্রকারের— যৌথিকী ও অযৌথিকী। যৌথিকীগণ— ঋষিচরী ও শ্রুতিচরী।

এই স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

"অতএব মধুর রস কহি তার নাম
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান"।

বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে পরকীয়া-প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন, কারণ নীতির দিক থেকে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। এবং যাঁহারা স্বকীয়া পরকীয়া উভয়বিধ প্রেমকে স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা তত্ত্বের দিক দিয়া পরকীয়া প্রেমকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। সাধক কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার"।

× × × ×

"রস-রত্নসার" গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

"পরকীয়া রাগ অতি রসের উল্লাস
স্বকীয়াতে রাগ নাহি, কহিল আভাস"। পৃঃ ৬৫

× × × ×

"পরকীয়া রসে হয় রসের উল্লাস
স্বকীয়া যে অল্প, তাহা জানিহ নির্যাস"

"সুধামৃত-কণিকা" পৃঃ ১৮

পরকীয়া প্রেম বা অদাম্পত্য-প্রেম, বৈষ্ণব রসসাহিত্যে কি ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিল ? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে আবহমান কাল হইতে যে অদাম্পত্য প্রেমধারা চলিয়া আসিয়াছে তাহার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

বৈদিক-সাহিত্য মূলতঃ ধর্ম-সাহিত্য। কিন্তু সেখানে কিছু লৌকিক আখ্যান ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং নিষিদ্ধ প্রেমের কথাও বর্ণিত হইয়াছে। যম ও যমী—ভ্রাতা ও ভগ্নী। ভগ্নী হইয়াও যমী যমকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে, কারণ যমী যমকে ভালবাসিয়াছে।

পুরাণে প্রজাপতি ব্রহ্মার কন্যার প্রতি আসক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে—

"চতুর্মুখ-মুখাম্ভোজ বনহংসীবধূর্মম
মানসে রমতাং নিত্যং সর্বশুক্লা সরস্বতী।"

হালের "গাথা-সপ্ত-শতী"তেও দেখিতে পাই—দেবর ভ্রাতৃজায়ার প্রতি অনুরক্ত ঃ

"ণবলঅপহরং অঙ্গে জহিং জহিং
মহই দেবরো দাউ রোমাঞ্চৎরাট
তহিং তহিং দীসই বহূত্র" ১/২৮

(নায়িকার অঙ্গের যে যে স্থানে দেবর নূতন লতাদ্বারা প্রহার দিতে আকাঙ্ক্ষা করে, বধূর সেই সেই স্থানে রোমাঞ্চ কণ্টকরাজি দৃষ্ট হয়।—
অনুবাদ—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক)

অর্যা-সপ্তশতী, সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও অনুরূপ নিষিদ্ধ প্রেম-কাহিনীর উল্লেখ আছে। কিশোর কৃষ্ণেরও অনুরূপ চরিত্র সম্বন্ধে কাহিনী বিচিত্র হইয়াছে। চর্যাগীতিতেও নিষিদ্ধ প্রেমের উল্লেখ আছে।

"ব্রাহ্মণ মনুস চণ্ডালি'এ তুট্ঠা"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই—রাধা মাতুলানী সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতেছে—

"লাজ না বাসসি তোঞ' গোকুল কাহ্ন
সোদর মাউলানীত সাধ মহাদান।"

ভবানন্দের হরিবংশেও পাই, রাধা কৃষ্ণের মাতুলানী এবং রাধা কৃষ্ণের প্রেম নিবেদনে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছেন—

"মাতুল বনিতা মঞি সুনরে কানাই
পথ ছাড়ি দেহ ঘরে জল লয়া যাই।"

মধ্যযুগের বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগুলিতেও এই নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র রহিয়াছে— শিবের পরনারীর প্রতি আশক্তি দেখিয়া চণ্ডী বিলাপ করিতেছেন—

"চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাই ওর
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর"।

মনসা-মঙ্গলে দেখি স্বর্গে বেহুলাকে দেখিয়া শিবের কামোন্মাদনা জাগিয়াছে—

"যৌবন দান কর মোরে ভজ মোর ঠাই"

নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলে দেখি মাতুলানী দেবী চণ্ডিকা ভাগিনা নারদের সঙ্গে আদিরসাত্মক রসিকতা করিতেছেন—

নারদে দেখিয়া চণ্ডী ঢাকিলা দুই স্তন
বোল পরিহাস্য করিতে ভাগিনার গেল মন।
বুঝিলাম ভাগিনা তোমার কামনা
এহি বেলাত তিনবার করিলা আনাগোনা।'

দুর্লভ মল্লিক কৃত গোপীচন্দ্রের গানে দেখি—

"সৎ মায়ে ভজিব তোরে দেখিয়া জোয়ান।
তাহার কারণে তোঞি পাইবা অপমান"।

কুমারী নারী ও বারবণিতার প্রেমের কথা প্রাচীন সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। নৈষধ চরিতে নল-দময়ন্তী কাব্যে, চর্যা-গীতিতে, মৃচ্ছকটিক নাটকে, গাথা সপ্তশতী কাব্যে, সদুক্তি-কর্ণামৃত কাব্যে বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "সত্যকাম ও জাবালার" আখ্যানও নিষিদ্ধ প্রেম-কাহিনী।

রূপ গোস্বামী রচিত "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থে— রাধা, তাঁহার

সখিদিগকে কৃষ্ণ মিলনের জন্য পাঠানর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে পাই—

"যদ্যপি সখীর ক�ৃষ্ণ-সঙ্গম নাহি মন
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম।
নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়
আত্মসুখ সঙ্গম হইতে কোটি সুখ পায়।
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥

আবহমান কাল হইতে যে লোক-সাহিত্যগুলি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ; সেই লোক-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার প্রেমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইব যে সেখানে প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়াছে অদাম্পত্য ও বিধি বহির্ভূত ভাবের স্থলে। কাঞ্চনমালা মিনতি করিতেছে—

"দূরে বাজে মনের বাঁশী ঐনা কলাবনে
তোমার সঙ্গে অইব দেখা রাত্রি-নিশা কালে"।

মইষাবন্ধু, মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি লোক-গাথায় এইরূপ প্রেমের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

এই নিষিদ্ধ অশাস্ত্রীয় প্রেম-ধারার সঙ্গে সহজিয়া মতবাদের মিশ্রণ ঘটিয়া পদাবলী-সাহিত্যে একটি বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ সহজিয়াদের নিজস্ব কতগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত ছিল, সেই মূল সিদ্ধান্তের অনুরূপে বৈষ্ণবদের রাধা-তত্ত্বটি একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

সহজিয়া সাধনার ধারাটি ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে একটি অতি প্রাচীন-ধারা। এই সাধন-পদ্ধতি বিভিন্নযুগে বিভিন্ন-ধর্মমতের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কোথাও ইহা তান্ত্রিক সাধনারূপে প্রচলিত, কোথাও বা ইহা বৌদ্ধ-সহজিয়ার ভিতরে রূপান্তরিত

হইয়াছে। আবার সেই সকল সাধন-প্রণালী বৈষ্ণবীয়-ভাবধারার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বৈষ্ণব-সহজিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

নর-নারীর পরস্পর মিলিতভাবে একটি ধর্ম-সাধনার ধারা ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত।*

এই সাধনার বিভিন্ন পরিণতিতেই বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা বৌদ্ধ-সহজিয়া সাধনা, বৈষ্ণব-সহজিয়া সাধনা প্রভৃতি উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু অনৈক্য থাকিলেও ভিতরে একটা গভীর ঐক্য অনুভূত হয়। এই সকল সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের মূলে দেখিতে পাওয়া যায় — অদ্বয়-আনন্দ-তত্ত্ব হইল পরম বস্তু। ইহাই "মিথুনতত্ত্ব" বা "যামল-তত্ত্ব" বা "যুগল-তত্ত্ব"। বৌদ্ধদের নিকট ইহাই "যুগনদ্ধ-তত্ত্ব" তান্ত্রিকদের নিকট "কেবলানন্দ-তত্ত্ব"॥

শিব ও শক্তিকে ঘিরিয়াই অদ্বয় তত্ত্বের ধারা গঠিত। তান্ত্রিক মতে শিব-শক্তির মিলন জনিত কেবলানন্দই হইল পরম সাধ্য। শিব শক্তি-তত্ত্ব সাধনার মধ্যে একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা হইতেছে — নরনারীর মিলন সাধনা। এই সাধনার সাধকদের বিশ্বাস, শিব-শক্তির নিত্যতত্ত্বটি পার্থিব জগতে নরনারীর মধ্যে দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। এবং এই জন্যই বলা হয়, পুরুষ শিব-তত্ত্বের, এবং নারী শক্তিতত্ত্বের প্রতীক। সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম সাধনা হইল এই— পুরুষ ও নারী উভয়ের ভিতরে সুপ্ত শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বের পূর্ণ জাগরণ করা। পুরুষের ভিতর শিবতত্ত্ব এবং নারীর ভিতর যখন শক্তিতত্ত্ব পরিণত এবং জাগ্রত হইবে তখনই পরস্পরে শিব-শক্তিতত্ত্বের আস্বাদন লাভ করিতে পারিবে। অর্থাৎ নারী নিজেকে "শক্তি" এবং পুরুষ নিজেকে "শিব" মনে করিবে। নরনারীর এই মিলনের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে চরম আনন্দ। তন্ত্রের ভাষায় এই আনন্দ হইতেছে— "সামরস সুখ"। বৌদ্ধদের ভাষায় "মহাসুখ" এবং বৈষ্ণবদের ভাষায়— "মহাভাব স্বরূপ"। তাই রাধা হইয়াছে—

---

*ঋগ্বেদে আছে— কোন বিবাহিত নারী পরপুরুষের সঙ্গে একাসনে বসিয়া যদি সাধনা করেন; তবে সেই নারী সমাজে ঘৃণিতা বা নিন্দিতা হইবেন না।

"মহাভাব-স্বরূপা-রাধা ঠাকুরাণী"।

বৈষ্ণবধর্ম হইল প্রেম-ধর্ম। এবং এই প্রেমের মূলাধার হইতেছেন—রাধা-কৃষ্ণ।

বৈষ্ণব-সহজিয়া মতে "যুগল-তত্ত্ব"ই হইল পরমতত্ত্ব। এই যুগলেই হইল মহাভাব রূপ 'সহজে'র স্থিতি। এই "সহজে"ই হইল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত চরম সত্য, ইহা হইতেই জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি, ইহাতেই সকল কিছুরই স্থিতি, ইহাতেই আবার লয়। এই সহজ হইল 'নিত্যের দেশের' বস্তু। পদকর্তা চণ্ডীদাস 'নিত্যের' নিকট হইতেই সকল সহজতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, নিত্যের উপদেশেই তিনি সহজ সাধনায় রত হইয়াছিলেন এবং নিত্যের আদেশেই তিনি "সহজ জানাবার তরে" পদ রচনা করিয়াছিলেন আর এই নিত্য-বিহারের মধ্য দিয়া নিত্য প্রবাহিত হইয়াছে— সহজ রসের ধারা—

"রস বই বস্তু নাহি এ তিনভুবনে"

এই রসই হইতেছে প্রেমরস বা পিরিতি-রস। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"সই পিরিতি না জানে যারা
এ তিন ভুবনে জনম জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা॥

অথবা

"পিরিতি পিরিতি সবজন কহে পিরিতি সহজ কথা
বিরিখের ফল নহে পিরিতি নাহি যথা তথা"॥

তাই চণ্ডীদাসের নিকট পিরিতি সার বস্তু—

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
এ তিন ভুবনে সার।

স্বকীয়া প্রেম হইতে পরকীয়া প্রেমকে বৈষ্ণব-দর্শনে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কারণ—

স্বকীয়া রমণী করি সংসারিয়া জনে
কামে উন্মত্তা করে ইন্দ্রিয় পোষনে
নিজদেহ প্রীত করি শৃঙ্গার করয়
স্বকীয়া বেদের উক্তি নাহি তাহে ভয় " ॥— রত্নাসার

"রস-সার" গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

স্বকীয়ার ধর্ম সেই শুন তাহা কহি
লোক বেদ ধর্ম্মভয় পতিগতি এহি ॥ পৃঃ ১৯

পরকীয়া সম্বন্ধে বিবর্ত-বিলাস গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

প্রণয় করহ তাকে সঙ্গে না রাখিবে
এই মোর মিনতি প্রণতি যে শুনিবে,
সঙ্গেতে রাখিলে হবে অনুরাগহীন
পরকীয়া বহুদূরে, স্বকীয়া অধীন ॥ পৃঃ ১৫৫

পরকীয়া প্রেমের মতই এক প্রেম সম্বন্ধে প্লেটো বলিয়াছেন—

"Every one who feels desire, desires that which lies not ready for his enjoyment that which is not present with him such things only being the objects of love and desire". Selections of Plato. Pg. 73

বস্তুতঃ পরকীয়া প্রেমে যে মাধুর্য আছে স্বকীয়া প্রেমে তাহা নাই। কারণ স্বকীয়া হইতেছে নিজস্ব বস্তু, যখন ইচ্ছা তাহাকে (সেই নারীকে) ভোগ করা যায়, অচিরাৎ বাসনা চরিতার্থ করা যায়; ফলে এই প্রেম ক্ষণস্থায়ী এবং উন্মাদনা বিহীন। স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে প্রশ্ন ভারতবর্ষের বাহিরেও দেখা দিয়াছিল—

"In 1176 A. D. the question was brought before a a Court of love by a Baron and a Lady of Champagne, whether love is compitable with marriage. Not said the Baron, I admire and respect the sweet intimacy

of married couples, but I cannot call it love. "Love deserves obstacles, mystery and stolen favours. Now husbands and wives boldly avow their relationship they possess each other without contradiction and without reserve. It cannot be love that they experience, (The psychology of Sex ; H. Ellis vol. VI, pgs. 516-517).

'রসসার' গ্রন্থেও ঠিক অনুরূপ একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে—

"শুন পূর্বে দেখ দুঁহে কৌমারের কালে
বেতসীর বনে লীলা কৈল কুতুহলে
দৈব সংযোগে দুহার বিবাহ হইল
বিবাহ হইতে সেই সুখ না জন্মিল ।।"

"পদ্যাবলী" গ্রন্থে পাই—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে । ৩৮৬ নং

অর্থাৎ যিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছেন, তিনিই আমার অভিপ্সিত বর। সেই চৈত্রমাসের রাত্রি, সেই উন্মিলিত মালতী সুরভি প্রৌঢ় কদম্ববনের পরিণত বা বর্ধিত বায়ু, আমিও সেই আছি তথাপি সেই রেবানদী তটের বেতসীতরুতলে যে সকল সুরতব্যাপারের লীলা তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

ইহা অভিধা অর্থ ; কিন্তু লক্ষণা অর্থ স্মরণ করাইয়া দিতেছে—কৈশোরের বিগতদিনের স্মৃতি। সেই চারিচক্ষের সহসা মিলন সঞ্জাত প্রেম। নর্মদার বেতসতরুকুঞ্জে সেই বহু প্রতীক্ষিত ঈপ্সিত প্রথম সমাগম। তাহার পর দীর্ঘদিনের অদর্শন........।

মহাপ্রভু নীলাচলে রথযাত্রার সময় এই শ্লোকটি গাহিতেন বলিয়া কথিত। সত্যই কি মহাপ্রভু এই আদি রসাত্মক শ্লোকটি গাহিতেন? ইহার বাচ্যার্থ যাহাই হউক না কেন ব্যঞ্জিত অর্থ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বরূপ দামোদর এই ব্যঞ্জিত অর্থ জানিতেন। সেই সময়ে রূপ গোস্বামী ছিলেন সেখানে, তিনি মহাপ্রভুর নিকট হইতে উহার ব্যঞ্জার্থ জানিতে পারেন। এবং তিনি ঐ ভাবার্থকে অবলম্বন করিয়া একটি শ্লোক রচনা করেন—

> "প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত—
> স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
> তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
> মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি। ৩৮৭/পদ্যাবলী

বহুদিনের অদর্শন, কৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরায়, তথা হইতে দ্বারকায়। মনে হয় যেন কতযুগ যুগান্তর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর পুনরায় এই কুরুক্ষেত্রে মিলন। সূর্যগ্রহণ; সেইজন্য ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে তীর্থস্থান উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গিয়াছেন। সঙ্গে অগণিত যাদব-মেলা, উগ্রসেন, বসুদেব প্রভৃতি যাদবগণ। জননী দেবকী, রোহিণী ও মহিষী রুক্মিণী আদি পুরমহিলারাও আছেন। আর আসিয়াছে গোপীপরিবৃতা শ্রীরাধা। তিনি কৃষ্ণকে দেখিলেন, মিলনে সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু তবুও যেন কোথাও ব্যবধান রহিয়া গেছে— দর্শনে তৃপ্তি নাই, মিলনে আনন্দ নাই, তিনি বৃন্দাবনের জন্য উতলা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—সহচরি, সেই আমার প্রিয় দয়িত কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি, আজি সেই রাধা, সেই আমার সঙ্গম-সুখ, তথাপি মুরলীর পঞ্চম সুর অন্তরকে তরঙ্গায়িত করিতেছে, কালিন্দীর পুলিগত-ব্রজবনস্থলীর জন্য আমার মনে স্পৃহা জাগিতেছে। ইহাই পরকীয়া ভাব, পরকীয়া রস।

এই প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার "লোকসাহিত্য" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

এইরূপ প্রেমগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপদজনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর মনে হইতে পারে। কিন্তু ফলতঃ তাহা সম্পূর্ণ

সত্য নহে। মানব প্রকৃতিকে সমাজ একেবারে উন্মূলিত করিতে পারে না। তাহা কাজে কথায় কল্পনায় আপনাকে নানা প্রকারে ব্যক্ত করিয়া তোলে। তাহা একদিক হইতে প্রতিহত হইয়া আর এক দিক দিয়া প্রবাহিত হয়। মানব প্রকৃতিকে অযথা পরিমাণে সম্পূর্ণভাবে রোধ করাতেই সমাজের বিপদ। সে অবস্থায় যখন সেই বদ্ধ প্রকৃতি কোনো একটা আকারে বাহির হইবার পথ পায় তখনই বরঞ্চ বিপদের কতকটা লাঘব হয়। আমাদের দেশে যখন বন্ধহীন প্রেমের সমাজ বিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন একেবারেই বন্ধ অথচ তাহাকে শাস্ত্রচাপা দিয়া গোর দিলেও তো সে যখন ভূত হইয়া মধ্যাহ্নরাত্রে রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্র মধ্য দিয়া দ্বিগুণতর বলে লোকালয়ে পর্যটন করিয়া বেড়ায়, তখন বিশেষরূপে আমাদের সমাজের সেই কুলমান গ্রাসী কলঙ্ক অঙ্কিত প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে সুপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য, বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে. অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসার পথ হইতে মানব পথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদের সমাজের সেই ক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবন্ধর কল্পনার বিবিধ পরশ-পাথর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় যে ইন্দ্রিয়বিকার স্থান পায় নাই, তাহা বলিতে পারিনা, কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে, তেমনি সৌন্দর্য এবং ভাবের বেগে সেই সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে"।

বৈষ্ণব-সাহিত্য ও দর্শনে প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ হইতেছেন— রাধা ও কৃষ্ণ। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে বৈষ্ণব-দর্শনে পরকীয়া প্রেম বলা হইয়াছে। এই পরকীয়া প্রেম দুই প্রকারের— বাহ্য পরকীয়া এবং মর্ম পরকীয়া। আবার মর্ম পরকীয়াকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে— জ্ঞানী পরকীয়া এবং শুদ্ধ পরকীয়া। জ্ঞানী পরকীয়া. ভগবানের ঐশ্বরিক অতি আশ্চর্য এবং রহস্যময় শক্তির মধ্য দিয়া প্রকটিত হয়—

"ভগবানের পরকীয়া ভক্তি মুখে শুনি
শুদ্ধ পরকীয়া নহে, পরকীয়া জ্ঞানী।
জ্ঞানমার্গে পরকীয়া ভগবান্ কৈল।

× × ×

জ্ঞানী পরকীয়া ধর্ম কহে মায়াশ্রিতে
ইহার প্রমাণ দেখ শ্রীমৎ ভাগবতে ॥"

গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে লীলারত ছিলেন, তখন তাঁহাদের স্বামীরা ঘরে বসিয়া 'তাঁহাদের' স্ত্রীদের চোখের সম্মুখে দেখিতে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা ইহা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

জ্ঞানী পরকীয়ার অপর একটি লক্ষণ হইতেছে—

"নিষ্কাম ধর্ম-পরকীয়া রতি হয় নিষ্কাম কৈতব" ভৃঙ্গরত্নাবলী, পৃঃ ১৪ নিষ্কাম কিরূপে হওয়া যায়? আনন্দ-ভৈরব বলিয়াছেন— যে নিজের সুখ, দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর দৃষ্টি নিপতিত করিতে পারিলেই 'নিষ্কামতা' অর্জ্জন করা যাইবে। সহজ-কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী—
সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

বৈষ্ণব-দর্শনে 'পর' শব্দটির অর্থ করা হইয়াছে— "পরমাত্মা"—
"পরমাত্মা বিনে পর অন্য পর নয়"।

তুঃ

"নারায়ণঃ পরা বেদা নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ
নারায়ণঃ পরা মুক্তি নারায়ণঃ পরাগতিঃ
নারায়ণঃ পরঃ — বিষ্ণুপুরাণ

উপনিষদের ব্রাহ্মণ খণ্ডে বলা হইয়াছে—

"পরঃ পরাণাঃ পুরুষঃ"

রসরত্নসার গ্রন্থে পাই—

পরমাত্মা জ্ঞান পূর্ণ প্রীতির আধার।
সেই প্রীতি জীবের পরিণাম সার ॥ পৃ ৫০

'পর' শব্দটির অর্থ করা হইয়াছে— পরমাত্মা। পরমাত্মাকে জানাই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য— "সহজ বস্তু পরমাত্মা জানিহ নিশ্চয়"।

পরমাত্মা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ গ্রন্থে পাই—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ
সোঽনুবীক্ষ নান্যদাত্মনোঽপশ্যাতৎ……… ১ / ৪ / ১

এই জন্য পুরুষাকার আত্মরূপেই ছিল। তিনি আলোচনা করিয়া আপনা হইতে ভিন্ন অপর কিছু দেখিলেন না। তিনি প্রথমে "আমি সেই" এই কথা উচ্চারণ করিলে—

"স বৈ নৈব রেমে-তস্মাদেকাকী ন রমতে স
দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ" বৃহদারণ্যকোপনিষৎ— ১ / ৪ / ৩

তিনি মোটেই আনন্দিত হইলেন না। তিনি সঙ্গীর অভিলাষ করিলেন, অর্থাৎ একাকী থাকিতে ইচ্ছুক নন—

স হৈতাবানাস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ

স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ
পতিশ্চ পত্নীশ্চাভাবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমব
স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ
স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং সম ভবৎ।
ততো মনুস্যা অজায়ন্ত। ১ / ৪ / ৩

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১ / ৪ / ৩

স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গিত হইয়া যে পরিমাণ হয় তিনি সেই পরিমাণ হইলেন। তিনি সেই দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহা হইতে পতি ও পত্নী জাত হইলেন। এই জন্যই নিজদেহ অর্ধ বিদ্বলের ন্যায়

(পত্নী গ্রহণের পূর্বে) এ কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। এই জন্যই (পুরুষের অসম্পূর্ণ দেহরূপ) এই আকাশ পত্নীর দ্বারাই পূর্ণ হয়। তিনি তাহাতে উপগত হইলেন, ফলে মনুষ্যগণ জাত হইলেন। বৈষ্ণব দর্শনেও অনুরূপ পাই—

পরম পুরুষ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি
ইচ্ছা হৈল তিহোঁ চান মায়া প্রতি

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের পতি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া "মায়া"র দিকে দৃষ্টিদান করিলেন। ইহারই ফলে 'মায়া' প্রসব করিলেন 'ডিম্ব'। ডিম্ব হইতে চতুর্দ্দশ-ভবনের সৃষ্টি হয়।

গোলক বৈকুণ্ঠ হইতে কারণ ইক্ষণ
তেজরূপী পরমাত্মা প্রবেশ তখন।
গর্ভধান হয় সহজ মানুষের জন্ম
দেহে আসি পরমাত্মা হন অবতীর্ণ
সুখময় পরমাত্মা সুখের নিধান
সুখ বিনু দুখ আদি কিছু নহে আন"। নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী পৃ-২

তুঃ— "তদৈক্ষত বহু স্যাং
প্রজায়েতি তত্তেজোঽসৃজতে তত্তেজ-ঐক্ষত
বহু শ্যাং। প্রজায়েতি তদাপোঽসৃজত
তস্মাদ যত্র কচ শোচতি স্বেদতে বা
পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে"। ছন্দোগ্যোপনিষৎ— ৬/২/৩

নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

চৌদ্দ ভুবনের জন্ম পরমাত্মা হইতে হয়।
দেহ মধ্যে অধিকারী পরমাত্মা মহাশয়।
পরমাত্মা পরম পুরুষ অধিকারী
দেহমধ্যে যত্তাকিছু অনুগত তারি"॥ পৃ ৩

× × ×

শরীরের মধ্যে আছে দুই মহাশয়
জীব আত্মা বলি আর পরমাত্মা হয়।
শরীরের রাজা এই পরমাত্মা গণি।

ভগবান্ বা পরমাত্মা সর্বভূতে। গ্রহ, নক্ষত্র, স্থাবর, জঙ্গম, কীটপতঙ্গ নরনারী সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা রহিয়াছেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ গ্রন্থে পাই, তিনি বলিয়াছেন—

"অহং ব্রহ্মাস্মীতি"— আমি ব্রহ্ম।
একোঽহং বহু শ্যাং— আমিই এক, আমিই বহু
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তাহ্যস্য হরয় শতাদশ। ২ / ৫ / ১৯

অর্থাৎ পরমেশ্বর বিভিন্ন রূপের অনুযায়ী রূপান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার এই রূপ-তত্ত্ব প্রকাশের জন্য। পরমেশ্বর মায়া বশতঃ বহুরূপে অনুভূত হন, কারণ ইহার (অর্থাৎ জীবাত্মার) দেহে দশটি, এমনকি শতশত ইন্দ্রিয় সকল সংযোজিত আছে। এই আত্মার ইন্দ্রিয়বৃন্দ, ইনিই দশ ও বহু সহস্র, অনন্ত। তিনি অপূর্ব, অনবদ্য অনন্তর, ও অবাহ্য। এই সর্বানুভবকারী আত্মাই ব্রহ্ম।

বৈষ্ণবদের নিকট এই ব্রহ্মই কৃষ্ণ। তিনি অনাদি, অনন্ত, অথচ আবার তিনি সান্ত। সৃষ্টির মধ্যেই তাঁহার সান্ত রূপটি প্রকটিত। ইহা হইতেই উৎপত্তি হয়— দ্বৈতাদ্বৈতবাদের। অর্থাৎ ভগবান্— অদ্বৈত না দ্বৈত? তিনি অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত— অর্থাৎ এক হইয়াও তিনি দুই, আবার দুই হইয়াও তিনি এক। শাক্তদের নিকট তিনি যেমন শিব ও শক্তি, তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট রাধা ও কৃষ্ণ। বৈজ্ঞানিকদের নিকট— Mater and Energy— Krishna is mater and Radha is energy.

অর্থাৎ বস্তু ও তার শক্তি। কৃষ্ণের শক্তি— রাধা, ও কৃষ্ণ নিজ শক্তি, রাধা তাঁহার ক্রীড়ার শক্তি। ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষের বন্ধন— অচ্ছেদ্য বন্ধন। ইহা হইতেই বৈষ্ণব-দর্শনে—অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদের সৃষ্টি।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব— জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ কি অভেদ, ইহা লইয়া বিতর্কের সীমা নাই। বৈষ্ণবাচার্যেরা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদকে স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদে 'ভেদ ও অভেদ' দুইই বলা হইয়াছে—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্
তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং"
ছান্দোগ্যাপনিষৎ ৬ / ২ / ১

হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্রূপে (বিদ্যমান) ছিল। উক্ত বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় অসৎ স্বরূপ ছিল, সেই 'অসৎ' হইতে 'সৎ' জাত হইল। (স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী)

"..... তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ছান্দোগোপনিষৎ ৬ / ৮ / ৭ হে শ্বেতকেতো তুমিই সেই সৎ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও এই ভেদাভেদের উল্লেখ আছে—

"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" (২ / ৪ / ১০)

উক্ত উপনিষদে আবার অভেদসূচক বাক্যও আছে—

"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ যথাহগ্নেঃ
ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ
সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ
সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি" (২ / ১ / ২০)

(অর্থাৎ যেরূপ ঊর্ণনাভ তন্তু বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণী, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত সৃষ্ট হইতেছে)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ উপনিষদের এই উভয় বাক্যের মধ্যে সমন্বয়

বিধান করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাই—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ" (মধ্যখণ্ড / ২০শ পর্ব)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যদের প্রধান উপজীব্য-শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্
ব্রহ্মেতিপরমাত্মেতি ভগবানিতি উচ্যতে॥ ১ / ২ / ১১

এখানে পরতত্ত্ব বস্তুকে (অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বলা হইয়াছে। তাঁহারাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলেন—

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু— কৃষ্ণের স্বরূপ
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তার রূপ।

(চৈতন্যচরিতামৃত / আদি / ২য় পঃ)

আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতমতবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের অদ্বৈত মতবাদ এক নহে। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মের 'শক্তি' স্বীকার করেন নাই, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা "শক্তি" স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা ভেদবাদীও নহেন, অভেদবাদীও নহেন, তাহাদের মতবাদ গৌতম, কণাদ প্রভৃতি হইতে ব্যাপক। তাঁহারা শুধু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেই ভেদাভেদ সম্বন্ধ নির্ণয় করেন নাই। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য সমস্ত বস্তুর মধ্যেই এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে এবং বৈষ্ণবাচার্যগণ এই ভেদাভেদ 'তত্ত্ব'কে "অচিন্ত ভেদাভেদ" তত্ত্ব বলিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্যতার উপরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের অচিন্ত-ভেদাভেদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা শ্রুতির সমস্ত বাক্যকেই ভগবানের বাক্য বলিয়া মনে করেন এবং শ্রুতির কথার উপর পূর্ণ আস্থাবান। চৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ"। (আদি / ৪র্থ পঃ)

যে বস্তুকে স্বীকার করা যায় না এবং তাঁহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই তাহাই 'অচিন্ত'—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ (১ / ২ / ৩—বিষ্ণু পুরাণ)

মহামোহপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ বলেন অচিন্ত শব্দের অর্থ তর্কসহ যে জ্ঞান তাহাই, অর্থাৎ কোন প্রসিদ্ধ কার্যের অন্যথা উপপত্তি না হওয়া-রূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানের যাহা গোচর তাহাই অচিন্তজ্ঞান গোচর"। (বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্ম পৃ ৯৪)

শক্তি শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা যুগপৎ ভেদ ও অভেদ—কোনরূপ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হইলেও ইহার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের যে সম্বন্ধ তাহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পুরুষার্থ অর্থাৎ 'সাধ্য' আমাদের কাম্য অর্থাৎ কাম্যবস্তু। সাধারণতঃ সুখই মানুষের কাম্য বস্তু। কিন্তু রুচিভেদে সুখের তারতম্য ঘটে। যাহারা স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপভোগকেই সুখ মনে করেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সুখ হইতেছে 'কাম' এবং যাঁহারা ব্যক্তিগত সুখের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শৃংখলার প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং প্রতিবেশীর সুখ সম্বন্ধে সচেতন, তাঁহাদের এই পুরুষার্থ হইতেছে অর্থ; কারণ অর্থ ব্যতীত কোন কল্যাণকর কাজ সম্ভব নহে। এই দুই শ্রেণীর সুখ হইতেছে ইহকালের। অনেকে আবার ধর্মকে পুরুষার্থ মনে করেন, কিন্তু ইহাও ক্ষণিক সুখকর এবং ইন্দ্রিয় উপভোগের পর্যায়ভুক্ত। গীতায় বলা হইয়াছে

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি" (৯২১)।

অনেকে আবার মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত করেন। ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম—ইহাই চতুর্বর্গ ফল। ধর্ম, অর্থ, কাম—প্রবৃত্তিমূলক এবং মোক্ষ-নিবৃত্তিমূলক। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই চতুর্বর্গকে অজ্ঞানতম কৈতব অর্থাৎ আত্ম প্রবঞ্চনা বলা হইয়াছে—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব" ॥ (আদি/১/ম পৃঃ)

ইহা ব্রহ্মানন্দ সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই আনন্দে বৈচিত্র্য নাই। বৈচিত্র্যপূর্ণ আনন্দ আছে রসের মধ্যে—'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ তিনিই রস, তাঁহাকেই আস্বাদন করিলে চরমানন্দ লাভ করা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সেই রসময় পুরুষ এবং রূপবান্। তিনি নিজের রূপেই নিজেই আকৃষ্ট—

আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন। চৈতন্য চরিতামৃত।

অথবা

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হয় চমৎকার
আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে। (ঐ মধ্যখণ্ড)।

এই আস্বাদন করা যাইতে পারে একমাত্র 'প্রেম দ্বারা'। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মতে 'প্রেম'ই হইতেছে পুরুষার্থ এবং ইহা পরম পুরুষার্থ, তবে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ—

পরম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন
কৃষ্ণের মাধুর্য রস করায় আস্বাদন"। (ঐ আদি)

ব্রহ্মানন্দ জাতীয় আনন্দ হইতে যে কৃষ্ণ-প্রেম শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণ কি ? শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠে জানা যায় যে যাঁহারা আত্মারাম অর্থাৎ জীবমুক্ত, ব্রহ্মানন্দ পুরুষ, তাঁহারাও যখন কৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা শোনেন তখন সেই মাধুর্যে লুব্ধ হইয়া সেই মাধুর্য লাভের জন্য কৃষ্ণের ভজনা করেন—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণো হরি। (ভাগবৎ)

সুতরাং প্রেমই হইতেছে "মুখ্য-সাধ্য" বস্তু। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ রামরামানন্দ ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আলোচনার মধ্যে ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত হয়— স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, কৃষ্ণে শরণ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্যভক্তি, প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, বাৎসল্য-প্রেম হইতে

কান্তা-প্রেম শ্রেষ্ঠ ; কারণ—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেই প্রেমা হইতে
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে। (চৈতন্য চরিতামৃত)

ইহাও স্মরণীয়—

"ঐশ্বর্য শিথিল প্রেম নহে মোর প্রীতি" (ঐ / আদি)

রায় রামানন্দও "কান্তা-প্রেমকে" সর্বসাধ্যসার বলিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাই—

"যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য মাধুর্যের ধুর্য
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য।"

রায় রামানন্দ চৈতন্য প্রভুকে রাধার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদ তাতে নাম আহ্লাদিনী

× × ×

"হ্লাদিনী সার অংশ প্রেম তার নাম
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি
সেই মহাভাব স্বরূপা রাধা ঠাকুরাণী"

ভক্তিবাদ— বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ভক্তি-মার্গের একটি বিশিষ্ট রূপ। বহুযুগের ও বহু সাধকের সাধনার ফলে এই মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন যুগের ভাগবত ধর্ম বা ঐকান্তিক ধর্ম (পঞ্চরাত্র) ও বিষ্ণু-উপাসনা এবং নারায়ণের উপাসনা মহাভারতের যুগেই সংশ্লেষণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃষ্ণ-বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ভক্তি ধর্ম্ম সেই যুগে যে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন আমরা গীতাতে পাই। ভক্তিবাদ সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ-ভাবে দার্শনিক যে মতবাদগুলি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নারদের 'পঞ্চরাত্র' ও শাণ্ডীল্যের ভক্তিসূত্রে উল্লিখিত আছে। শঙ্করাচার্য এই ভক্তিবাদের মূলে প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ভক্ত ও ভগবান্ এই দ্বৈতবাদ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু

শঙ্করাচার্যের মতবাদের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে একটি মতবাদ গড়িয়া উঠিতেছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য-বিরুদ্ধ মতবাদটি একটি সুষ্ঠ রূপ লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা হইতেছে ভক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তিকে বলা হইয়াছে— "সা পরমানুরক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগই হইতেছে ভক্তি। ভক্তি সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ
তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্বকং
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে।"

অর্থাৎ আমার উপর অনুরক্ত হইয়া এবং আমারই উপর একান্ত প্রাণ হইয়া আমাকে তত্ত্ব আলাপ করিয়া এবং পরস্পরকে বুঝাইয়া দিয়া অধিকতর আনন্দিত এবং আমার উপর অনুরক্ত হইয়া থাকেন। এইভাবে প্রীতি সহ যাঁহারা আমাকে আরাধনা করিবেন আমি (ঈশ্বর) তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দেই. তদ্বারা তাঁহারা আমাকে পাইতে পারে। ভগবানে দৃঢ় অনুরক্তি তাহাই ভক্তি এবং এই ভক্তিই মুক্তিরূপে প্রেয়-সাধন করিতে পারে, জ্ঞান তাহা পারে না। যোগমার্গে যাঁহারা সাধনা করেন "তাঁহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ কামনা করেন। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক. তাঁহারা ভগবানের প্রতি অনুরাগ বশতঃ তাঁহার সেবা কামনা করেন। গীতায় পাই— "ভক্ত্যহমেনয়া গ্রাহ্যঃ" ভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, জ্ঞান বা যোগের দ্বারা তাহা পারা যাইবে না।

ভক্তি দুই প্রকার— বৈধীভক্তি ও রাগানুগাভক্তি। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে" বলা হইয়াছে—

"বৈধীরাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।

বিধিবন্ধ-প্রণালী অনুসরণ করিয়া যে ভক্ত ভক্তিমার্গের পথে অগ্রসর হন,

তাহার সেই ভক্তিকে 'বৈধীভক্তি বলা হয়—

"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়" চৈতন্য চরিতামৃত।

অথবা

"যত্র রাগান বাপ্তত্বং প্রবৃত্তিরুপজায়তে
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে"।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১ / ২ /৫ রূপগোস্বামী।

অনুরাগ তথা প্রেমের দ্বারা ভগবানকে যে-ভক্তি দেখান হয়, তাহাকেই রাগানুগাভক্তি বলে—

"ইষ্টেস্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতাভজেৎ
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা"। ঐ

"ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণারাগ— এই স্বরূপ লক্ষণ
ইষ্টে আবিষ্টতা— এই তটস্থ লক্ষণ
রাগময়ী ভক্তি হয় রাগাত্মিকা" নাম।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বৈধীভক্তি দ্বারা লাভ করিতে পারা যাইবে না রাগাত্মিকা ভক্তিই মুখ্য—

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে"।

× × ×

বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শকতি। (চৈ, চ, আদি)

'প্রেমানন্দ-লহরী'তে বলা হইয়াছে—

"বিধি পথ পরিত্যজ রাগানুগা হয়ে ভজ
রাগ নৈলে মিলে না ধন।

স্বর্গীয় প্রেমের মধ্যে বৈধী ভক্তির স্থান নাই, একথা 'অমৃতরত্নাবলী" গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—

"অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম কৈতব না হয়
বেদাচার বেদনিষ্ঠা ইহা করে ক্ষয়। পৃঃ ১

এই কথা স্বীকার্য যে—ভক্তি বা প্রেমমার্গের মূল কথা হইতেছে—

দ্বৈতবাদ। 'দ্বয়ের' কল্পনা ছাড়া ভক্তির কথা উঠিতেই পারে না, এই প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য।

"The Bhakti as a function in the Jiva is only an expression of Hladini Sakti by which the Jiva release itself from the fetters of the extreneous Maya Sakti in the phenomenal world and realises its Contiguity to the Bhagavata" (Bengal's contribution to Sanskrit Literature and Studies in Bengal Vaisnavism.)

এই মন্তব্যটি শুধু বৈষ্ণবদের পক্ষে নহে, স্থূলভাবে সমস্ত ভক্তিপন্থী সাধক সম্প্রদায়ের কথা—

"The absolute of philosophy becomes the God of religion to all followers of Bhakti School. Isvara, the highest manifestation of the Absolute is the personal Lord of the Universe. The distinction of the lover and the loved is kept up till the last point, when in perfect love the two become one the personal God is then dissolved in the Absolute × × × this bhakti school has had a continous history from the very begining of reflection in India."

(The philosophy of Rabindra Nath Tagore: Dr. S. Radha-Krishan.)

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। শাস্ত্র ও তত্ত্বগত হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের দুইটি রূপ— একটিতে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বর, অপরটিতে তিনি— রসরাজ, আনন্দময়। একদিকে তাঁহার ঐশ্চর্যলীলার প্রকাশ, অপরদিকে তাঁহার মাধুর্যলীলার বিকাশ। সেই জন্য তিনি একাধারে 'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়' অর্থাৎ দেবতা এবং প্রিয়জন।

বিল্বমঙ্গলঠাকুর "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপবর্ণনা পাই, তাহাতে দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ দেবতা এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ ও রসরাজ—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ (পৃঃ ৯২)

অর্থাৎ তিনি 'বিভু' এবং তিনি 'মধুর'। তিনি অপূর্ব বৈভবশালী এবং অপূর্ব রূপলাবণ্যে মহিমান্বিত। তিনি বৈধীভাবাপন্ন, ভক্তদের নিকট দেবতা এবং রাগানুগা ভক্তদের— প্রাণ-প্রিয়, কান্ত। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ-প্রিয়-কান্ত রূপেই জ্ঞান করিয়াছেন। তাই গোপীমুখ্যা রাধা-শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন তিলমাত্র সহিতে পারেন নাই—

তারে এক তিল না হেরিলে
শতযুগে মনে হয়।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের তুলনা নাই—

এমন পিরিতি কভু দেখি নাই শুনি
নিমিখে মানয়ে যুগ কোবে দূরমানি" (চণ্ডীদাস)

এই জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকট নিজেকে বিলাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণ নাথ হইও তুমি।" (চণ্ডীদাস)

বৈষ্ণব-পদকর্তারা যে সঙ্গীতের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের নিকট ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন— তাহাকে বলা হয় 'পদ'; এবং পদের সমষ্টি লইয়াই গঠিত হইয়াছে পদাবলী-সাহিত্য।

—ঃ সপ্তম অধ্যায় ঃ—

(রাধা-কৃষ্ণের সর্বভারতীয় রূপ)

ভারতীয় প্রেমিক-কবি-মানসে নারী সৌন্দর্য ও নারী প্রেমের মাধুর্যের বিকাশ লাভ করিয়াছিল যে প্রেমিক মূর্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই মূর্তিটি হইতেছে— শ্রীরাধার। বৃন্দাবনের পটভূমিকায় প্রেমিকা রাধা হ্লাদিনী-শক্তি-রূপিনী রাধায় পরিণত হইয়াছেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগের প্রাকৃত রাধা (মূলতঃ) চৈতন্যোত্তোর-যুগে অপ্রাকৃত রাধায় রূপান্তরিত হইয়াছিল তথাপি মাঝে মাঝে 'ছায়া'র মধ্যে 'কায়া'র আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

জয়দেবের পূর্বে রাধা-কৃষ্ণের লীলা লইয়া বিভিন্ন খণ্ড-কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল রচনার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর অভাব ছিল। সেই অভাব প্রথম পূরণ করেন জয়দেব গোস্বামী। জয়দেবের কাহিনী আবার পল্লবিত হইয়া বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনায় বিধৃত হইয়াছে। পদাবলী-সাহিত্যে দেখি রাধার সহিত কৃষ্ণকে মিলিত হইবার জন্য কৃষ্ণকে বেদে, বাজিকর, নাপিতানী, মালিনী, দেয়াসিনী, বণিকিনী; চিকিৎসক, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি বেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের একটি পদে দেখিতে পাওয়া যায়— কৃষ্ণ গোরখ-যোগী সাজিয়া শিঙ্গা বাজাইয়া দুয়ারে দুয়াবে ভিক্ষা করিয়া রাধার মান-ভঞ্জন করিতেছেন।

হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্যেও রাধা-কৃষ্ণের লীলার কথা আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ও হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিলাসে বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে যে উপাদান প্রাচুর্য ও বৈচিত্র রহিয়াছে, হিন্দী-বৈষ্ণব সাহিত্যে সে প্রাচুর্য নাই। ইহার কারণ – বল্লভাচার্যের অনুগামীরা রচনা করিয়াছেন— হিন্দী পদাবলী সাহিত্য। বল্লভী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলেই পার্থক্য রহিয়াছে, সেইজন্য

ধর্মে যাহা রহিয়াছে সাহিত্যে তাহা বিম্বিত হইয়াছে।

বল্লভী-সম্প্রদায়ের অষ্টছাপ-বৈষ্ণবগণ মুখ্যভাবে ভাগবত বর্ণিত লীলাই অনুসরণ করিয়াছেন। অষ্টছাপের কবিগণের প্রায় সমকালবর্তিণী উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি হইতেছেন— মীরাবাঈ। মীরাবাঈ এর প্রেমধর্মের সঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-প্রেমধর্মের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। মীরাবাঈ-এর প্রেম-ধর্ম, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত যুগল-লীলাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। মীরার ভজনে, রাধার উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। যে দুই এক স্থানে রাধার উল্লেখ আছে, সেখানেও রাধা-কৃষ্ণ লীলা আস্বাদনের কোনো প্রশ্ন নাই। গোপাল কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে রাধার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।

রুংঝুন রুংঝুন ফিরত রাধিকা
সবদ সুনত মুরলীকো
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
ভজন বিনা নর ফীকো

তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো তাহা হইতেছে— মীরার প্রেম-বিহ্বলতা প্রকাশের মধ্যে শ্রীরাধার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। মীরাই যেন রাধা। রাধার প্রেম-সাধনা ও মীরার প্রেম সাধনা— একই পদ্ধতির। পদাবলীর মহাজনেরা দর্শক হিসাবে যেন রাধা-কৃষ্ণের লীলা আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন, নিজেরা কেহই রাধা-ভাব অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু মীরা নিজেই রাধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নিজেই রস-মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলীর সাহিত্যে যাহা রাধার উক্তি, মীরার ভজনে তাহা মীরার উক্তি—

সখী মোরী নীদ নসানী হো।
পিয়াকো পংথ নিহারতে সবরৈন বিহানীতো।
সখীয়ন মিলকে সখী দই মন এক ন মানীহো।

(সখী আমার ঘুম নষ্ট হইয়া গেল, প্রিয়ের পথ চাহিতে চাহিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সখীরা কত বুঝাইল, তবুও মন মানিতেছে না।)

"মৈঁ হরি বিন; কৈসে জিউরী মায়
পিয় কারণ জগ বৈরী ভাঈ, জস কাই ঘ;ন খায়"

(ওগো মা আমি হরি বিনা কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, প্রিয়ের জন্য জগৎ হইল বৈরী, যেমন কাঠ ঘ;নে খায়) ইহা রাধারই বিরহের মত, তব; এই বিরহিণী, রাধা নহেন মীরা।

দক্ষিণ ভারতের আলওয়ার কন্যা অণ্ডালের সঙ্গে মীরার জীবন ও প্রেম সাধনার ঐক্য দেখা যায়। মীরা যেমন গিরিধারীলালের মন্দিরে বাস করিতেন তেমনি অণ্ডাল কন্যাও রঙ্গনাথকে জীবন সব্বস্ব হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মন্দিরেই বাস করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার অভিমন; সামন্ত সিংহের 'বিদগ্ধ চিন্তামনি" একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনিও রাধা-বল্লভ ছিলেন। রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবদের মতই করিয়াছেন।

শংকরদেব ছিলেন কামতারাজ্যের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারক ও বিদগ্ধ কবি। তাঁহার কাব্য ও ধর্ম্মে রাধার স্থান ছিল না। ম;খ্যতঃ তিনি বাৎসল্য রসের উপাসক ও কবি ছিলেন। তিনি একক চতর্ভুজ-নারায়ণের উপাসনা করিয়াছেন, য;গল-ম;র্তির উপাসনা করেন নাই।

মারাঠী বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার স্থান ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

হিন্দী অষ্টছাপের কবিরা হইতেছেন— স;রদাস, কুম্ভনাদ, পরমানন্দ দাস, কৃষ্ণ দাস, গোবিন্দ স্বামী, নন্দদাস, ছীতস্বামী ও চতুর্ভুজ দাস। অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখা-সখীর অবতার, যেমন চৈতন্য প্রভুর ছিলেন আটজন পার্ষদ।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরা ম;লতঃ পরকীয়াবাদকে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বল্লভ-সম্প্রদায়, ম;লতঃ স্বকীয়া মতবাদকেই সমর্থন করিয়াছেন।

বাৎসল্য রসের কবি হিসাবে স;রদাস প্রসিদ্ধ, তথাপি অষ্টছাপের কবিদের মধ্যেও নিত্য-য;গল-লীলার আস্বাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

পরমানন্দ, গোবিন্দস্বামী, কৃষ্ণদাস, প্রভৃতি, কবিদের রচনায়ও যুগল-লীলার কথা উল্লেখ আছে। সুরদাসের পদে পাই, রাধা কৃষ্ণ-রূপ দর্শন করিয়া ঘরের কথা ভুলিয়া গেলেন—

"আবত হী যমুনা ভরে পানী
শ্যাম বরণ কাহ্নু কো ঢোটা নিরখি
বদর ঘর গঈ ভুলানী।"

চণ্ডীদাসের রাধা, কৃষ্ণ নাম শুনিয়াই পাগলিনী—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।"

নন্দদাসের পদেও অনুরূপ চিত্র পাই—

কৃষ্ণ নাম জব তৈ সুন্যোরী আলী
ভুলারী ভবন হেঁ৷ তৈ বাবরী ভঈ রী॥

× × ×

নন্দদাস— জাকে শ্রবণ শুনে ঐসি গতি
মাধুরী মুরতি কৈরেী কৈসী দই রী"

হরিদাস স্বামী প্রবর্তিত বৈষ্ণবী-সম্প্রদায়— হরিদাসী সম্প্রদায় বা সখী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইঁহারা সখী-ভাবেই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এবং এই সম্প্রদায় রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির উপাসক ছিলেন। ইঁহারা সখীভাবেই রাধা কৃষ্ণের আনন্দবিহার অবলোকন করিতেন, আস্বাদন করিতেন। এই হিসাবে চৈতন্যপন্থীদের সঙ্গে হরিদাসী সম্প্রদায়ের ঐক্য ছিল।

—ঃ অষ্টম অধ্যায় ঃ—

(লোক-সাহিত্য ও রাধা)

আবহমান কাল হইতে মানুষের মুখে মুখে এক শ্রেণীর আখ্যায়িকা কাব্য, ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতি চলিয়া আসিতেছে— মুখ্যতঃ তাহাই লোক-সাহিত্য। লোক-সাহিত্য বা লৌকিক কবিতা ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (১০৩৮) পাওয়া যায়—

জুয়াড়ীর আত্মকথা। বৈদিক সাহিত্যে এইরূপ সর্বকালের আধুনিক কবিতা আর দ্বিতীয় নাই।

সংস্কৃত মহাকাব্য প্রভৃতির উৎস মুখও হইতেছে— লোক-সাহিত্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে অনেক গাথা আছে এবং সেই গাথাগুলিকে আশ্রয় করিয়া যে কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহাও আছে। পরবর্তীকালে উর্বশী পুরূরবা, সত্যকাম-জাবালা প্রভৃতির কাহিনী সাহিত্যে রসদ জোগাইয়াছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যেও গাথার বহু নিদর্শন আছে। রামায়ণ, মহাভারত কাহিনীর মধ্যে বহু লোকগাথা জনশ্রুতি মিশিয়া আছে। বাল্মীকির প্রতিভাই প্রথম মৌলিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহাভারত আখ্যান-আখ্যায়িকার সমষ্টি এবং সে-গুলি কমবেশি পুরানো বস্তু, যা কালবাহিত হইয়া আসিয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" এ (পৃঃ ১১৬) বলেন "মহাভারতের বস্তুতে মিথলজি ও কালগত জনশ্রুতি মিশ্রিত। রামায়ণের বস্তুতে লোকায়ত কাহিনী ও কবি-কল্পনা মিশ্রিত।"

বৌদ্ধজাতকের বীজও গাথা। জাতক-গাথাগুলি লোক প্রচলিত নীতি গল্পের মতো এক বা ততোধিক শ্লোকের আকারে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। কালিদাসের কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে লোক-কাহিনীর বীজ বিদ্যমান।

কুমার-সম্ভবের কাহিনী হইতেছে— উমা-মহেশ্বর তথা হরগৌরীর কাহিনী। হর-গৌরীর কাহিনী— দাম্পত্য-বিজয় কাহিনী। হরগৌরীকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজে এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে।

স্বামী দীন দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ যেমনই হোক, স্ত্রী রূপ, যৌবন ভক্তি, প্রীতি, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজ, গর্বে সমুজ্জ্বল। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারীর অন্নপূর্ণা রিক্ত গৃহস্থের সম্মান-লক্ষ্মী। হর-গৌরীর গান যেমন আমাদের নিজস্ব এবং সমাজের গান, রাধা-কৃষ্ণের গানও তেমনি সৌন্দর্যের গান। ইহার মধ্যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আছে ঠিক, কিন্তু সে তত্ত্ব রূপকের আবরণে মণ্ডিত। প্রতীয়মান রূপ হইতে প্রচলিত রূপটিই সর্বসাধারণকে আকর্ষণ করে বেশি। রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীতে তত্ত্বকথায় বাহিরেও এমন একটি বস্তু রহিয়াছে যাহা বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব, মূঢ়, পণ্ডিত সকলের নিকট উপাদেয়। ফলেই রাধা-কৃষ্ণ কাহিনী, ছড়া গানে, যাত্রায় কথকতায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে।

নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটা সৌন্দর্য, একটি মোহিনী শক্তি আছে, ফলে সকল শ্রেণীর মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। এই শক্তিকে যুগে যুগে দেশে মানুষ অধ্যাত্মশক্তির রূপক বলিয়া অনুভব করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন— "কাব্যের পক্ষে এমন সামগ্রী আর নাই। ইহা একই কালে সুন্দর এবং বিরাট অন্তরতম এবং বিশ্বগ্রাসী, লৌকিক এবং অনির্বচনীয়। যদিও স্ত্রী পুরুষের প্রকাশ্যে মেলামেশা ও স্বাধীন বরণের অভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজে এই প্রেম লাঞ্ছিত হইয়া গুপ্তভাবে বিরাজ করে, তথাপি ভারতবর্ষের কবিরা নানা ছলে নানা কৌশলে ইহাকে তাঁহাদের কাব্যে আবাহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সমাজের অবমাননা না করিয়া কাব্যকে সমাজের বাহিরে স্থাপন করিয়াছেন। মালিনী নদীতীরে তপোবনে সহকারসনাথ বনজ্যোৎস্না-কুঞ্জে নব-যৌবনা শকুন্তলা সমাজ কারাবাসী কবি-হৃদয়ের কল্পনা-স্বপ্ন। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম সমাজের অতীত এমন কি তাহা সমাজ-বিরোধী। পুরুরবার প্রেমোন্মত্ততা সমাজ-বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া নদী গিরিবনের মধ্যে মদমত্ত বন্য হস্তীর মত উদ্দাম ভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছে। × × × কুমারসম্ভবে কুমারী গৌরী যদি প্রচলিত সমাজ নিয়মের বিরুদ্ধে শৈল-তপোবনে একাকিনী মহাদেবের সেবা না করিতেন তবে তৃতীয় সর্গের ন্যায় অমন অতুলনীয় কাব্যের সৃষ্টি হইত কি করিয়া? × × ×

× × × লোকালয়ের নিয়ম প্রাচীরের মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের এমন মহান সুযোগ মিলিত কোথায় ? × × × বৈষ্ণবের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছৃংখলতা সৌন্দর্য বন্ধনে, হৃদয়-বন্ধনে নিয়মিত। তাহা অন্ধ ইন্দ্রিয়ের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ততা মাত্র নহে"। (গ্রাম্য সাহিত্য / লোকসাহিত্য)

হরগৌরী এবং রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া একদিকে যেমন মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, অপরদিকে এই দুই কাহিনীকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে লোক-সাহিত্য বা গ্রাম্য-সাহিত্য। এই দুই আখ্যায়িকা, ছড়ার মধ্যেও স্থান লাভ করিয়াছে। হরগৌরীর কাহিনী সম্বন্ধীয় ছড়াগুলি হইতে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ছড়াগুলি পৃথক জাতির। হরগৌরীর কাহিনী সমাজের মধ্যে বা বাস্তবিকতার মধ্যে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ছড়া বাস্তবকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে—

স্থানে স্থানে ফেরেন রাখাল সঙ্গে কেহ নাই
ভাণ্ডীবনে ধেনু চরাণ সুবল কানাই।
সুবল বলিছে শুন ভাইরে কানাই
আজি তোরে ভাণ্ডীবনে বিহারী সাজাই

এই সাজের প্রস্তাবে নিকুঞ্জের সমস্ত ফুল ব্যাকুল হইয়া উঠে—

কদম্বের পুষ্প বলেন সভা বিদ্যমানে
সাজিয়া দুলিব আজ গোবিন্দের কানে।
কবরীর পুষ্প বলেন আমার মর্ম কেবা জানে
আজ আমায় রাখবেন হরি চূড়ার সাজনে॥

কোনো ফুলকেই নিরাশ হইতে হয় নাই। এদিকে কৌতূহলী ভ্রমর ভ্রমরী, ময়ূর-ময়ূরী, খঞ্জন-খঞ্জনী, কোকিল-কোকিলা, চাতক-চাতকী, সকলেই হাজির, কিন্তু বৃন্দাবনের 'সেরা' ফুল ! সেই ফুলটি নাই ; ফলে—

"কুঞ্জপানে যেদিকে ভাই চেয়ে দেখি আঁখি
সুখময় কুঞ্জবন অন্ধকার দেখি।"

তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া সুবল কহিল—

"এই স্থানে থাক তুমি নবীন বংশীধারী,
খুঁজি মিলাব আজ কঠিন কিশোরী।"

সুবল খুঁজিতে গেল, আর রাধা—

"সাধ করে হার গেঁথেছি এই দিব কার গলে,
ঝাঁপ দিয়ে মরি আজ যমুনার জলে।"

রাধা সখীদের লইয়া ভাণ্ডীবনে গেলেন। কিন্তু তখন রাধার রূপ ধ্যান করিতে করিতে কৃষ্ণ অচেতন। রাধা কৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিলেন—

"গাও তোল চক্ষু মেল ওহে নীলমণি
কাঁদিয়ে কাঁদাও কেন আমি বিনোদিনী
অঞ্চলেতে মালা ছিল দিল কৃষ্ণের গলে
রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলন হল ভাণ্ডীর বনে।"

ইহা আগা-গোড়া রাখালী কাণ্ড। আবার কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় যান, তখন রাধা কাঁদিয়া কহিতেছেন—

"আর কি এমন ভাগ্য হবে ব্রজে আসবে হরি
সে গেছে মথুরাপুরী মিথ্যে আশা করি।"

পরিশেষে রাধার দূতী মথুরায় গিয়া হাজির। দূতী খোঁজ করিতেছে, কোথায় গেল কৃষ্ণ? দেখেন—

"ননীচোরা রাখাল ছোঁড়া ঠাই করেছে আসি
চোর বিনে তাকে কবে ডাকছে গোকুলবাসী।"

এই ছড়াগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে ইহা পদাবলী সাহিত্যের অমসৃণ রূপ। পল্লীগীতিকা গুলির মধ্যেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া যেখানে রাধা-কৃষ্ণ অনুপস্থিত সেখানে নায়ক-নায়িকাই রাধা-কৃষ্ণে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন সিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় বহু পল্লীগীতিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। মহুয়া গীতিকায় পাই—জলের ঘাটে নায়ক নদ্যাঠাকুর ও নায়িকা মহুয়ার সাক্ষাৎ—

নদ্যাঠাকুর— "জল ভর সুন্দরী কইনা জলে দিছ মন
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ।"

তুঃ— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বড়ু চণ্ডীদাস)

কাহার বহু তো কাহার রাণী
কেহ্নে যমুনাত তোলসি পানী।

মহুয়া নিদ্রিতা। তাহাকে জাগাইতে হইবে—অভিসারে আসার জন্য। নায়ক নদ্যাঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণের মতো বাঁশী বাজাইতে সুরু করে—

শিরে ছিল আর বাঁশিটী তুল্যা নিল হাতে
ঠার দিয়া বাজাইল বাঁশী মহুয়ারে আনিতে ॥

অথবা

অষ্ট আঙ্গুলে বাঁশের বাঁশি মধ্যে মধ্যে ছেদা
নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা।"

(মইষাল বন্ধু / পূর্ববঙ্গ গীতিকা)

কৃষ্ণ যেমন রাধার জন্য জলের ঘাটে অপেক্ষা করিতেন, ঠিক তেমনি "মাঞ্জুর মা" শীর্ষক-গীতিকার নায়ক—

আমার উদ্দেশে বন্ধুরে আরে দুঃখু
বাজায় মোহন বাঁশী
আমার আসার আশারে দুঃখু
থাকে জলের ঘাটে বসি।

নদ্যাঠাকুর যখন মহুয়ার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে, তখন তাহার উত্তরে মহুয়া বলে—

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥

তাহার উত্তরে নদ্যাঠাকুর বলে—

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি ॥

তুঃ— (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন) রাধা—

আরে ভৈরব পতনে গাএ গড়াইলি গিআঁ।
গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ॥

কৃষ্ণ— তোর দুই উরু রাধা ভৈরব পতনে।
নিকটে থাকিতে দূরে জাইবোঁ কি কারণে॥
তোর দুঈ কুচ কুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্য গঙ্গা জলে॥

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পদাবলী-সাহিত্যে যেমন রাধার বারমাসী বা ছয়মাসী আছে, বহু গীতিকায়ও অনুরূপ আছে।

"দানলীলা"র ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যেমন পথিমধ্যে রাধাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং রাধাও নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, "ধোপার-পাট" গীতিকাটিতেও দেখিতে পাই, জলের ঘাটে কাঞ্চনমালা নায়ককে ছাড়িয়া দিবার জন্য মিনতি করিতেছে—

পুষ্করিণীর চাইর পারে রে ফুটল চম্পা ফুল।
ছাইরা দেরে চেংরা বন্ধু ঝাইড়া বানতাম চুল॥

× × ×

দুষ্মন পাড়ার লোক দুষ্মণি করিবে
এমন কালে দেখলে বন্ধু কলঙ্ক রটাবে॥

× × × ×

হস্ত ছাড় পরাণের বন্ধু চইলা যাইতাম ঘরে
কি জানি কক্ষের কলসী ভাসাইয়া নেয় সূতে॥
দূরে বাজে মনের বাঁশী ঐনা কলা-বনে
তোমার সঙ্গে অইব দেখা রাত্রি নিশা কালে॥

(পূর্ব্বাঙ্গ গীতিকা ২য় খণ্ড)

কিন্তু— রাত্রি-নিশাকালে মিলনের সঙ্কেত করিয়াও কাঞ্চনমালা ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইতে পারিতেছে না, কারণ—

পারলাম না পারলাম না বন্ধু মইলাম মাথার বিষে
সত্যভঙ্গ হইল রে কুমার পারলাম না আসিতে॥

মাও বাপ জাইগ্যা আছে আসিতাম কেমনে
ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন
অবলার কুলভয় হইল দুষমন ॥

তুঃ— ঘর কইনু বাহির বাহির কইনু ঘর
পর কইনু আপন, আপন কইনু পর। (চণ্ডীদাস)

আবার দেখি— "বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ
ঘরের পাছে মনের পাতা কাইট্যা মাথার ধর।

তুঃ চণ্ডীদাস— "আঙ্গিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

যদি বা বাহির হইবার সুযোগ পাওয়া গেল, কিন্তু বাদ সাধিল— চাঁদ—

ক্যাটা গেছে কালা মেঘ চান্দের উদয়
এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের ভয় ॥

তুঃ— "গমন বিরোধী হৈল পাপ শশধরে।" চণ্ডীদাস।

কাঞ্চনমালা আক্ষেপ করিতেছে—

"তোমার লাগিয়া আমি জীয়ন্তে যে মরা
কর্মদোষতে আমি হইলাম কপাল পোড়া।"

তুঃ— বন্ধু হে সকলি আমার দোষ
না জানিয়া যদি করেছি পিরিতি
কাহারে করিব রোষ" চণ্ডীদাস।

এই সকল গীতিকার প্রেম পদাবলীর রাধার প্রেমের সঙ্গে তুলনীয়। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর যেমন রাধার মন হরণ করিয়াছিল, এই সকল গীতিকাতেও দেখি নায়কের বাঁশীর সুর নায়িকার মন হরণ করিয়াছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে লোক-সাহিত্যের (ছড়া গীতিকা) এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। এই বিষয়ে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে" শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন— "সাহিত্যে দৃষ্টি

লইয়া বিচার করিলে বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহুস্থানে এই প্রকৃত মানবী রাধাই কায়ামূর্তি, বৃন্দাবনের অপাকৃত রাধা তাহার অশরীরী ছায়া-মূর্তি ; অথবা বলিব, প্রকৃত মানবীরই ঘটিয়াছে প্রতিষ্ঠা তাহার উপরে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের ক্ষণে ক্ষণে ছোঁয়া লাগিয়াছে।"

এই ছড়া ও পল্লীগীতিকাগুলির রচনাকাল অজ্ঞাত। স্থির করিবারও কোনো উপায় নাই। কারণ ভাষায় প্রাচীন রূপ নাই। ভাষায় প্রাচীন রূপ না থাকিলেও ভাবের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্য রহিয়াছে। এই গীতিকাগুলির মধ্যে বাঙলাদেশের প্রাণ-ধর্ম ও প্রেম-ধর্মের নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিতায় রাধা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—

"কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার প্রেমের অগ্নিতে জীবন আহুতি এক কথায় যে কোন কালে যে কোন নায়িকা প্রেমের যে সকল অমানুষী গুণ দেখাইয়াছেন রাধা তাহাদের প্রতীক × × × শত শত সতী চিতায় পুড়িয়া যে ছাই হইয়াছে—সেই চিতার পূত বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব। সেই সকল সতী নায়িকা হব্য-স্বরূপ কিন্তু যখন সেই হব্য-হোমাগ্নির আহুতি হয় তখন তাহার নাম "রাধাভাব।"

—ঃ নবম অধ্যায় ঃ—

(পদাবলী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, রসতত্ব, ভাষা ও ছন্দ)

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙ্গালীর জীবন ছিল—আচার-মূলক এবং কর্ত্তব্য-মূলক। আচার ও কর্ত্তব্যের বেড়াজালে বাঙ্গালীর জীবন অতিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে বৈষ্ণবেরা জন-জীবনে আনেন একটা নবসুর। বৈষ্ণবেরা ঘোষণা করেন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের জন্য এ জীবন নহে, জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন হইতেছে—প্রেম। প্রেমই হইতেছে দ্বিতীয় ব্রহ্ম। মানুষের জীবন শুধু আচার-নিষ্ঠ নহে—ভাব-নিষ্ঠ। সেই ভাবই হইতেছে—প্রেম। বৈষ্ণবেরা বলেন প্রেমই ভগবান, ভগবানই প্রেম। তথা প্রেমই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই প্রেম। প্রেম মানুষের সহজাত বৃত্তি। তাই দেখিতে পাই সাধারণ বাঙ্গালী-সমাজ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে যতটুকু জানে তার চেয়ে অনেক বেশী জানে বৈষ্ণবদের প্রেম-কবিতাগুলিকে। বৈষ্ণবদের প্রেমের বৈশিষ্ট্য হইতেছে—দেশাচার, লোকাচার, শাস্ত্র, শ্রুতি-স্মৃতি অথবা কোন ধর্মীয় অনুশাসন এবং সাধন পদ্ধতির চতুঃসীমার মধ্যে তাঁহাদের এই প্রেম আবদ্ধ নহে। পদাবলীর নায়িকা জীবনের সর্ব্ববিধ যন্ত্রণাকে অতিক্রান্ত করিয়া প্রেমের স্বর্ণ-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিগ্রহ-রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ—মদন মোহন।

পদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধা কুলবধূ। কুলবধূ হইয়াও তিনি ভজনা করিয়াছেন—পরপুরুষ বা সেই পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে। বাহ্য দৃষ্টিতে এই প্রেম অসামাজিক। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তারা এই অসামাজিকতাকে পরিহার করিয়াছেন। রাধা নিশিদিন কামনা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে সেন্ট জনের (বাইবেল) আখ্যানের তুলনা করা যাইতে পারা যায়। সেন্ট জনের আখ্যানে আমরা পাই—

"I may please Thee to unite to Yourself making my soul the bride, I will rejoice in nothing till I am in Thine arms".

বাঙ্গালাদেশের লৌকিক-কাব্য ধারায়, মৈমনসিংহ-পল্লীগীতিকায়, ছড়ায়, যে-প্রেমের আবেগ আমরা দেখিতে পাই, সেই প্রেমের আবেগ বৈষ্ণব-পদাবলীতে বিদ্যমান। কিন্তু ঐ সকল গাথা-গীতিতে ভগবত্তার কোন সম্পর্ক নাই, অপ্রাকৃত প্রেমের কোনো উল্লেখ নাই। তাহাদের প্রেম— বাস্তব জগতের নরনারীর বিরহ-মিলন, আনন্দ-বেদনার গান। কিন্তু বৈষ্ণবদের বিরহ-মিলন, মান অভিমান, নিগূঢ় অর্থে পার্থিব জগতের নহে, অপার্থিব জগতের এবং ঐ গান "বৈকুণ্ঠের গান।" রাধিকার যোগিনী-মূর্তি, রাধিকার সাধিকা মূর্তি প্রাকৃত স্থূলতার বহু ঊর্ধে প্রতিষ্ঠিত। ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে" শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন— "পূর্ববর্তীরা সম্ভোগকেই প্রধান করিয়া প্রেমকে অনেকখানি স্থূল করিয়া ফেলিয়াছেন, আর বৈষ্ণব কবিরা বিরহকে প্রধান করিয়া প্রেমের ভিতরে সূক্ষ্মতার ও অতলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিরহ অবলম্বনে প্রেমের এই যে সূক্ষ্ম এবং গভীর সুর তাহাই রাধা-প্রেমকে আধ্যাত্মিক লোকে উত্তরণ করাইতে সহায়ক হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতাকে সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণিত প্রেম হইতে রাধা প্রেমের যে পার্থক্য তাহা দুইটা কারণে ঘটিয়াছে, প্রথমতঃ একটি তত্ত্বদৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব, অপরটি হইল বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের রূপ হইতে অরূপে, প্রাকৃত মর্তভূমি হইতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে যাত্রা।"

বিরহের অনুভূতিতে বৈষ্ণব কবিতার বিশিষ্টতা এবং এই অনুভূতির অগ্নিদাহে পুড়িয়া ছাই হইয়াছে সামাজিক নীতির প্রশ্ন। গাথা-গীতির নায়িকারা এই পরিপ্রেক্ষিতে রাধার স্ব-গোত্রা। তত্ত্বদৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাবে অপার্থিব বস্তুর কামনা করিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর নায়িকারা পার্থিব হইয়াছেন। মেঘ দেখিলে, ময়ূরের কেকাধ্বনি শ্রবণ করিলেই পদাবলীর নায়িকা

অশ্রুসিক্ত হন। পদাবলীর নায়িকা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না কেন শুধু তাঁহার মনে হয় —

"হেরি অহরহ তোমারই বিরহ
বিশ্বভুবন মাঝে।"

রাধার প্রেম, সেই প্রেম, যে প্রেম বলে —

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কিসের বসতি
কিবা বা করিবে বাপমায়।
জাতি জীবন ধন এরূপ যৌবন
নিছনি ফেলিব শ্যাম পায়।
সমুখে রাখিয়া নয়নে দেখিমু
লইয়া থাকিমু চোখে
হার করিয়া গলা গাঁথিয়া
লইয়া থাকিমু বুকে"। বলরাম দাস

হার করিয়া পড়িলেও শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই এযে অনন্ত অশান্তি, অনন্ত অতৃপ্তি। কারণ এ প্রেম অসামাজিক। তার কথা পাই—

এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়।"

বাইবেল Old Testament এর সোলোমনের গীতেও সেই একই বেদনা দেখিতে পাই —

"By night on my bed I sought him whom my soul loveth, I sought him but I found him not".

এই বাণীর অনুসরণ পাওয়া যায় ইংরাজী কাব্যেও, নায়ক Tristan নায়িকা Iseult কে বলিয়াছে—

"When I have with me my beloved, what do I lack? If all the worlds were with us have and now. I should have eyes for nothing but alone."

পদাবলী-সাহিত্যের প্রেক্ষাপট আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে পদাবলী-সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে, সংস্কৃত, অবহট্‌ঠ প্রভৃতি সাহিত্যের অবদান যেরূপ. ঠিক তেমনি লোক-সাহিত্যের অবদানও গরুতর।

পূর্বাচার্যেরা তিনটি ঋণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন— ঋষি ঋণ, পিতৃ ঋণ এবং দেব-ঋণ। দায়বন্ধ জীবের এই তিনটি ঋণ পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য। উপনিষদে আরও একটি ঋণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সনৎকুমার নারদকে ইহার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন— এই ঋণ আনন্দের ঋণ, মাধুর্যের ঋণ —

"আনন্দাদ্ধ্যের খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দে জাতানি জীবন্তি। আনন্দন্ প্রয়ান্ত অভিসংবিশন্তি"—

অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মকে মধু বলিয়া, রস বলিয়া, আনন্দ বলিয়া, ভুমা বলিয়া জানিয়াছেন— তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ঋষি, উত্তম দ্রষ্টা, প্রকৃত রসিক ও ভাবুক।

"রসো বৈ সঃ"— তিনি সমস্ত রসের আধার, সমস্ত আনন্দের মূলাধার,—
"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চয়ন্"

আনন্দই অমৃত, এই অমৃতের আস্বাদনের মানবের কোনো ভয় থাকেনা— মৃত্যুভয়ও তুচ্ছ হইয়া পড়ে। মানুষ এই আনন্দকে ভুলিয়াছিল। স্মৃতি-শ্রুতির নিষ্পেষণে মানুষের অন্তরের রসনির্ঝর শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। এই "মরা গাঙে" আবার বন্যা ডাকাইয়া আনিলেন বৈষ্ণব-মহাজনেরা। সে বন্যা হইল প্রেমের বন্যা। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

সই পিরিতি না জানে যারা
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা।"

বৈষ্ণবদের নিকট "পিরিতি" কঠোর তপস্যা। প্রাক্-চৈতন্য-যুগে এই প্রেম লোকাত্তর ও মহত্তর হইয়া উঠিতে পারে নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলেই এই প্রেম মহত্তর হইয়া উঠে, এবং আধ্যাত্মিকতা লাভ করে।

গ্রিয়ার্সন সাহেব ও রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যে একটি রূপকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the Vaisnava sect came to my hand when I was young. I became aware of some underlying idea in the obvious meaning of these love poems. I felt the Joy of an explorer who suddenly discovers the key of the language lying hidden in the heiroglyphs which are beautiful in themselves. I was sure that these poets were speaking about the Superme Lover, whose touch we experience in all our relations of love—the love of natures' beauty, of animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of a love that ever flows through numerous obstacles between Man and the Divine, the eternal relation which has the relationship of mutual dependance for a fulfilment that needs perfect union of individuals and the Universal"

(The Religion, The Vision Page 105)

এই দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম জীবাত্মা ও পরমাত্মা অথবা জীব-বিশ্বদেবতার অন্তর্নিহিত অনাদি প্রেমের প্রতীক মাত্র। বৈষ্ণব কবিরা কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে কখনো রূপক মনে করে নাই।

তাঁহাদের নিকট ইহা পরম সত্য ইহা লীলামাত্র। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ নরলীলার বৃন্দাবনে যে প্রেমের লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব পদাবলী সেই লীলার চিত্র। বৈষ্ণব-কবিদের ভক্ত মানসের ফল ইহাই। চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নবরূপ তাঁহার স্বরূপ।
নরলীলার হয় অনুরূপ।" (মধ্যখণ্ড)

সেইজন্য বৈষ্ণব-পদাবলী শুধু বৈষ্ণব-সাধকের আকর্ষণ করে না, অবৈষ্ণব, অহিন্দুকেও সমভাবে আকৃষ্ট করে। কৃষ্ণ দূরে নহেন, তিনি অন্তরে। তাঁহার রূপ রস ও মাধুর্যের তুলনা নাই। তাই মানবীয় ভাব ও ভাষায় এই সকল পদ উদ্ভাসিত হইলেও মহাজনদের প্রেরণা হইতেছে অতিমানবীয়। তাঁহারা যে-প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অপ্রাকৃত এবং ইহার সুর সাধারণ প্রেম-গীতির সুর নহে, তাহা ভক্তের সাধনার অনুভূতি এবং তাহা ইন্দ্রিয়াতীত। তাই ইহা রোমান্টিক এবং স্থানে স্থানে মিষ্টিকও বটে।

রোমান্টিসিজম বা রহস্যবাদ বস্তুটি মূলতঃ কি? রোমান্টিসিজম কাব্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। এই ধর্মটি আধুনিক সাহিত্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে প্রাচীন সাহিত্যেও ইহা বিরল নহে।

কাব্যের এই ধর্মটিকে বুঝিতে হইলে, কাব্যের আরও কয়েকটি ধর্ম আছে তাহাও জানা প্রয়োজন। কাব্যের অপর ধর্ম দুইটি হইতেছে—ক্লাসিক ও মিষ্টিক। ক্লাসিক, রোমান্টিক ও মিষ্টিক— এই তিনটি ধর্মকে জানা দরকার।

রোমান্টিক সাহিত্য— চিত্রধর্মী, ক্লাসিক— ভাস্কর্য ধর্মী। ভাস্কর যে মূর্তি সৃষ্টি করেন তাহার মধ্যে রহস্য-ময়তা থাকে না, নিয়মানুবর্তিতা সুষমতা, সমগ্রতা, সঙ্গতি পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। সুতরাং ভাস্কর-ধর্মী সাহিত্যে ঐ সকল লক্ষণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিবে। অর্থাৎ কাব্য-কারের

সৃষ্টিতে বক্তব্য অস্ফুট, অব্যক্ত থাকিবে না, কিন্তু রোমাণ্টিক সাহিত্যে সেই সমগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা থাকেনা। সেখানে একটি বিস্ময়বোধ রহস্যবোধ বিদ্যমান। রহস্যবোধ আমাদের মনে জাগাইয়া তোলে একটি "মোহ" উদ্রেক করে একটি কৌতূহলের, সৃষ্টি করে একটি আলো-আঁধারের আবরণ। সেইজন্য রোমাণ্টিক-সাহিত্য কুহেলিকার আবরণে মণ্ডিত, ইহার অর্ধেক ঢাকা অর্ধেক খোলা— যেন চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারা যায় না। ইহা কখনো দৈবিক, আধি-দৈবিক, ভৌতিক পর্যন্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য রোমাণ্টিক-সাহিত্যকে বুঝিতে হয়— হৃদয়বৃত্তি দিয়া, ইহা অনুভববেদ্য। কিন্তু ক্লাসিক সাহিত্য আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। সেখানে উর্ণনাভের মতো কল্পনার জাল বিস্তার করিবার উপায় নাই। ফলে ক্লাসিক সাহিত্য যাহা পড়ি, তাহাই বুঝি; কিন্তু রোমাণ্টিক-সাহিত্যে যাহা পড়ি তাহা হইতে অধিক কল্পনার দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে রোমাণ্টিক সাহিত্য ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতিযোগী। মূলতঃ তাহা নহে এ্যাবারক্রম্বি বলেন— ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে রোমাণ্টিক সাহিত্যর কোনে বিরোধ নাই। রোমাণ্টিক ও ক্লাসিক ধর্ম একই সঙ্গে সহ-অবস্থান করিতে পারে। মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্ট ক্লাসিক সাহিত্য হইলেও মাঝে মাঝে রোমাণ্টিক হইয়া পড়িয়াছে। মেঘনাদ-বধের কোলাহল মুখরিত রণোন্মাদনার মধ্যেও মধুসূদনের রোমাণ্টিক ধর্মটি মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যটি রোমাণ্টিক কাব্য, কিন্তু সেখানেও তিনি মাঝে মাঝে ক্লাসিক ধর্মটিকে অবলম্বন করিয়াছেন—

"ধূমজ্যোতিঃ সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥" পূঃ / ৫

(কোথায় বা ধূম, জ্যোতি সলিল এবং মরুতের সন্নিপাত স্বরূপ মেঘ, আর কোথায় বা কার্যকারণে উপযুক্ত ইন্দ্রিয় সম্পন্ন প্রাণি-গণদ্বারা প্রেরিত সংবাদ। উদ্গ্রীব হওয়ায়, একথার মূল্য নিরূপণ না করিয়াই যক্ষ

মেঘের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছে, কামার্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃই চেতন-অচেতন নিরূপণে অসমর্থ)।

এ্যাবারক্রম্বি আরও বলিয়াছেন— ক্লাসিক ধর্ম হইল অটুট স্বাস্থ্য এবং রোমান্টিক ধর্ম হইল একটা ব্যাধির লক্ষণ। এই ব্যাধিটি মানুষের অন্তরে জাগায় পুলক, আনে শিহরণ, মানুষকে করে নেশাগ্রস্তের মতো এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগাইয়া তোলে একটি অপূর্ব উন্মনাভাব। সেই জন্য রোমান্টিক ধর্মটি মূলতঃ কোনো 'বস্তু-ধর্মী" নহে, ইহা একান্তভাবে "মনোধর্মী"। এই হিসাবে বৈষ্ণব সাহিত্য রোমান্টিসিজিমের অপূর্ব নিদর্শন। যখন পদকর্তা বলেন—

সজনি ভাল কএ পেখন ন ভেল
মেঘমালা সঞে তড়িতলতা জনু
হিরদয়ে সেল দই গেল। (বিদ্যাপতি)

অথবা

জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতি পথে পরশ না গেল" (ঐ)

রোমান্টিক কবিদের রচনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে—তাঁহাদের রচনায় একটা বিষাদের সুর, একটা বেদনার ধ্বনি, একটা না পাওয়ার অব্যক্ত বেদনা অনুরণিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব— পদকর্তাদের রচনায় এই ভাবটি পরিস্ফুট।

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী।"

× × × ×

কৈসনে যাওব যমুনাতীর
কৈসে নেহারব কুঞ্জ কুটীর। (বিদ্যাপতি)

রহস্যবাদের মধ্যেও তারতম্য আছে। মিস্টিসিজিমও রহস্যময় সন্দেহ নাই, কিন্তু রোমান্টিসিজিম ও মিস্টিসিজিমের রহস্য এক নয়— একটা স্তরগত প্রভেদ আছে। উভয়ের জন্ম কবির অন্তরে। রোমান্টিক মন রহস্যের অতলে আরও গভীরস্তরে উপনীত মিস্টিসিজিমের সৃষ্টি করে। মানুষের অন্তরে বুদ্ধি-দীপ্তির বাহিরে আরও একটি দীপ্তি আছে। সেই দীপ্তিটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এবং প্রখর নহে, পক্ষান্তরে মেঘাচ্ছন্ন, চন্দ্রালোকের ন্যায় অস্পষ্ট, স্তিমিত অথচ স্নিগ্ধ মোহনীয় এবং রমণীয় ও কমনীয়। এই স্তিমিত ও স্নিগ্ধালোকে ঠিক চিনিয়াও চিনিতে পারা যায় না, একটা আলো-আঁধারের খেলা, যেন আধেক কায়া, আধেক ছায়া। চোখের সম্মুখে একটা সূক্ষ্ম আবরণ যেন আছে। এই আবরণ ভেদ করিয়া যে কবি একটা অদ্বয় সত্যে উপনীত হইতে পারেন, তিনিই মিস্টিক কবি। মিস্টি-সিজিমের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে সে শুধু মানুষকে অপরিচিত ও রহস্যের আবরণে না রাখিয়া অন্তরে একটি বিশ্বাস আনায় এবং এই বিশ্বাসই লেখককে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদিগকে একটি অদ্বয় সত্যের নিকট পেঁছাইয়া দেয়। এই সত্য, সেই সত্য—

"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

(ভাষা ও ছন্দ / রবীন্দ্রনাথ।)

বৈষ্ণব-পদকর্তারা তাহাদের রচিত "নিবেদন" পর্যায়ের পদগুলিতে একটি অদ্বয় সত্যে উপনীত হইয়াছেন—

বধু তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে" (জ্ঞানদাস)

"কলঙ্কী বলিয়া বলে সর্বলোকে
তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পড়িতে সুখ।" (চণ্ডীদাস)

বৈষ্ণব পদকর্তারা যেমন রোমান্টিক ও মিস্টিক, তেমনি আবার মাঝে মাঝে সাঙ্কেতিক ও অর্ধসাঙ্কেতিক হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ "রাগাত্মিক" পদগুলি সঙ্কেতের চিহ্ন বহন করে—

পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে
এক দেহ হয়ে নিতাতে যাবে॥ (চণ্ডীদাস।)

× × ×

কলঙ্ক সাগরে সিনান করিবি
এলাইয়া মাথার কেশ
নীরে না ভিজিব জল না ছুঁইবি
সব সুখ দুঃখ ক্লেশ॥ (চণ্ডীদাস)

পদাবলী-সাহিত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে—সমতানতা, যাহাকে harmony বলা যাইতে পারে। এই সমাতানতা—ভাবে রসে এমনকি কথার মধ্যেও। বিভিন্ন পদকর্তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিটি পদকর্তার প্রতিপাদ্য হইতেছে— রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী বর্ণনা করা।

অগাধ লীলা-সমুদ্রই হইতেছে পদাবলীর রস-সমুদ্র, এবং প্রতিটি পদ যেন ঐ রস-সমুদ্রের এক একটি ঢেউ। এই রসই হইতেছে পদাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই রস সম্পর্কে চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে। "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন" এবং ইহাই হইতেছে— "স জয়তি যেন প্রভবতি দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনাবৃত্তি। অতিশয়াতিপদপদার্থো ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনিপুরারাতেঃ" (অলঙ্কার-কৌস্তুভ।)

অর্থাৎ পদপদার্থের অতিরিক্ত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা যেমন কাব্য জগতের অধীশ্বরী তেমনি সকল ধ্বনিরললামভূত মুরারীর যে মুরলীধ্বনি, ব্রজ-বিলাসীগণের নয়নে উদ্বেলিত আনন্দাশ্রুর দ্বারা অঞ্জনরেখার বিলোপ হেতু ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বিগতাঞ্জনবৃত্তি সম্পাদিত করে, বৈকুণ্ঠাদি পদ এবং ব্রহ্মানন্দাদির পদার্থ হইতে উৎকর্ষশালী সেই মুরলী ধ্বনির জয় হউক ; এই মুরলীধ্বনির জয়গীতই হইতেছে পদাবলীর সৌন্দর্য এবং তাহা অলৌকিক বটে।

———

রসতত্ত্ব

বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ জানা না থাকিলে বৈষ্ণব-দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা এবং পদাবলী-সাহিত্যের রসমাধুর্য আস্বাদন করা অসম্ভব। সুতরাং 'রস' বস্তুটি কি? এবং এই রসের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রসের পার্থক্য জানা একান্ত প্রয়োজন।

সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে 'রস' 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'। কিন্তু বৈষ্ণব-আলংকারিকদের মতে রস 'ব্রহ্মাস্বাধসহোদর' নহে, 'ব্রহ্মাস্বাদ' স্বয়ং। ভগবান্ রস-স্বরূপ (রসো বৈ সঃ)। যাহা আস্বাদনীয়, আস্বাদনযোগ্য তাহাই রস। "রস্যতে ইতি রসঃ"— রস নিজেকে নিজে আস্বাদন করিতে পারে, সুতরাং আস্বাদনীয় এবং আস্বাদক।

রস বস্তুটি নিরাকার হইলেও কোনো একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টি হয়। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে গেলে যেমন সমীধের প্রয়োজন, তেমনি রসকে উদ্বুদ্ধ করিতে গেলে একটি অবলম্বন প্রয়োজন। আলংকারিকদের নিকট সেই বস্তুই হইতেছে— "বিভাব"। "বিভাবয়ন্তীতি বিভাবাঃ" অর্থাৎ স্তিমিত বা সুক্ষ্ম বাসনা যাহার ক্ষমতা বলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে তাহাই 'বিভাব'। এই বিভাব দুই প্রকারের— 'আলম্বন' বিভাব এবং 'উদ্দীপনবিভাব'। যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া নরনারীর অন্তরে ভাবের উদ্রেক করে তাহাকে 'আলম্বন' বিভাব বলে এবং যে বস্তু নরনারীর অন্তরে উদ্দীপনা জাগায় তাহাই 'উদ্দীপন' বিভাব—

আলম্বন বিভাব (শুদ্ধ):

"সজনী কে কহ আওব মাধাই
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই।" (বিদ্যাপতি)

এখানে আলম্বন বিভাব— মাধাই।

উদ্দীপন বিভাব (শুদ্ধ):

সময় বসন্ত সবহুঁ মন তোষই
কাননে কুসুম বিকাশ।
মলয় চলহি ভুজগ-ভয়ে মরুত
চলত হিমাচল পাশ।"

'সময় বসন্ত'— উদ্দীপন বিভাব।

আবার আলম্বন এবং উদ্দীপন ভাব একই সঙ্গে দেখা দিয়াছে—

আওয়ে মধুরাতি মধুর যামিনি
কামিনী চিত চোর।
কুসুম শায়ক জীবন গাহক
তুহুঁ যে মধুপুর ভোর।"

উদ্দীপন বিভাব— মধুরাতি : আলম্বন-কামিনী-চিত চোর (কৃষ্ণ)।

চিত্তভাবের অনুযায়ী দেহের যে বিকার তাহাকে 'অনুভাব' বলা হয়— অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামেববোধকাঃ"। অর্থাৎ অনুভাবগুলি চিত্তের ভাবগুলিকে বুঝাইয়া দেয়—

কানুক ঐছে দশা শুনি বিরহিণি
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি খিতি-তলে মুরছিল
সখিগণ দ্বিগুণ বিষাদ।" পদামৃতমাধুরী / ৪র্থ খঃ / ৩৭৬

কানুর ঐরূপ অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া বিরহিণী রাধা বেদনায় বিমোথিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। এইখানে 'মূর্চ্ছা'— অনুভাব।

অনুভাবের সংখ্যা লইয়া বৈষ্ণব-আলংকারিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। রসসুধাকরের মতে অনুভাব চার প্রকার— চিত্তজ, গাত্রজ, বাগারম্ভ এবং সাত্ত্বিক। সরস্বতী কণ্ঠাভরণে ইহা স্বীকৃত নহে। কাব্য প্রকাশে মম্মথভট্ট কোনো বিভাগের উল্লেখ করেন নাই। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে, তিন প্রকারের কথা বলা হইয়াছে— অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক। বিশ্বনাথের মতে,

অঙ্গজাদি অলঙ্কার সাত্ত্বিকভাব ও অন্যান্য চেষ্টা অনুভাবের এই ত্রিবিধ ভাগ। তাঁহার মতে সাত্ত্বিক ভাগ আটটি— স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য বেপথু, অশ্রু, প্রলয়।

অনুভাবের পর 'ব্যভিচারি ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। যে-সকল ভাব স্থায়ীভাবকে উপকৃত করার জন্য আসে এবং উপকার করিয়াই চলিয়া যায় তাহাকে ব্যভিচারিভাব বলা হয়। কাব্য প্রকাশের চতুর্থ "উল্লাসে" তেত্রিশ রকম ব্যভিচারি ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে—

নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, উৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, প্রবোধ, অমর্ষ, আবহিত্থা, উগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক—

উন্মাদ ঃ
শুনইতে কাণ হি আন হি শুনত
বুঝইতে বুঝ আন।
পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান।

বিষাদ ঃ
করহু কপোল থাকিত রহু ঝামরি
জনু ধনহারি জুয়ারি॥
বিছুরল হাম রভস রস-চাতুরী
বাউরি জনু ভেল গোরী॥

এইরূভাবে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন চিত্ত-বৃত্তি মধ্যে যে গুলিকে অবলম্বন করিয়া অপরাপর চিত্ত-বৃত্তিগুলির আবির্ভাব। তিরোভাব ঘটে সেইগুলিকেই স্থায়িভাব বলা হয়, এবং অন্যান্য ভাবগুলি ব্যভিচারি বা সঞ্চারিভাব।

রসবাদী আলংকারিকেরা বলেন বিভাব প্রভৃতি দ্বারা লৌকিক স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া অলৌকিক রসকে ব্যঞ্জিত করে।

বৈষ্ণবদের মতে সমস্ত রস অলৌকিক নহে। তাঁহাদের মতে একমাত্র ভগবৎ সম্বন্ধীয় রসই অলৌকিক, অন্য নহে।

সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে রস লৌকিক বা অলৌকিক সে সম্বন্ধে জানিতে হইলে - উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ এর আলোচনা প্রয়োজন। তবে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় না হওয়ায় ঐ আলোচনা পরিত্যাজ হইল।

পদাবলী সাহিত্যের প্রতিপাদ্য হইতেছে— ভক্তি এবং তাহার রসও হইতেছে "ভক্তিরস।" প্রাচীন আলংকারিকেরা "ভক্তিরস" নামে কোনো রসের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদের মতে— শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক বীভৎস, অদ্ভুত— এই আটটি রস। মম্মথভট্ট দেবাদি বিষয়া রতিকে ভাবের মধ্যেই ধরিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ-টীকাতেও বলা হইয়াছে— ভক্তি, রস নহে, ভাব মাত্র।

ভাব ও রসের মধ্যে পার্থক্য কি ? পার্থক্য স্বরূপগত। ভাগবতী-আনন্দ চিন্ময়সত্ত্বা রূপে রস সর্বদাই অলৌকিক। ভাব সর্বদাই লৌকিক। জলের যেমন কোনো রঙ নাই ; যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের রং অনুযায়ী রং ধারণ করে। তখন সাধারণ জল অসাধারণ রূপেই প্রতিভাত হয়।

রসসৃষ্টিতে একটা স্থায়ী ভাবের প্রয়োজন। ভক্তিভাব অন্য ভাবগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "শান্ত" এর মধ্যেও ইহাকে আনা যায় না। কারণ ভক্তিভাবের আর একটি নাম হইতেছে – ভগবদনুরক্তি. অনুরাগই ভক্তির স্বরূপ। 'শান্ত' রসের প্রধান ভাব নির্বেদ— যাহার মধ্য দিয়া মানুষের মধ্যে বৈরাগ্যভাব আনায়। কিন্তু বস্তুর প্রতি যখন অনুরাগ জন্মে তখন সেই বস্তুটির উপর আকর্ষণ আরও বেশী হয়। সেইজন্য 'ভক্তিভাব' ও 'শান্তভাব' এক নহে।

প্রতিটি রসের একটি স্থায়ীভাব আছে। যেমন— শৃঙ্গারের— রতি, করুণের— শোক, হাস্যের— হাস প্রভৃতি। যদি ভক্তিকে রস বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তবে ইহারও একটি স্থায়িভাব থাকা উচিৎ. কিন্তু তাহা নাই ; বৈষ্ণবেরা তাহাকে "কৃষ্ণরতি" বলিয়াছেন।

(ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু / দক্ষিণ ভাগ)

এইখানেই তর্কের সূত্রপাত। বৈষ্ণবেরা যাহাকে "দেবাদিবিষয়ারতি" বলিয়াছেন, কিন্তু জগন্নাথ পণ্ডিত তাহা স্বীকার করেন নাই। অভিনব গুপ্তও

ইহা সমর্থন করেন নাই। মধুসূদন সরস্বতী, তাঁহার "ভক্তিরসায়ণে" (২/৭৫/৭৬) বলিয়াছেন যে দেবাদিবিষয় রতিও ব্যঞ্জিত ব্যভিচারি ভাব মাত্র, রস নহে। ইহার বিচার বিশ্লেষণ বর্ত্তমান গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য নয় বলিয়াই— পরিত্যক্ত হইল।

মীরাবাঈ এর ভজন মূলতঃ কি? তাহা ভক্তিরসের সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতগুলির প্রতিটি ছত্রে মীরার অনুরাগ ধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিরসের মূল বস্তু— 'অনুরাগ'। এই অনুরাগের মধ্যে আছে ভোগ, ত্যাগ, নিরাসক্তি অনুরক্তি, রহস্য ও লীলা, এবং ইহাদের মিলিত সত্ত্বার মধ্য দিয়াই ক্ষরিত হইয়াছে— ভক্তিরসের নির্ঝরিণী। ভক্তিরসের মতো ব্যাপক, গভীর ও স্বাদুরস আর নাই— ইহাই ভাগবতে বলা হইয়াছে। ভক্তিরসকেই বৈষ্ণবেরা একমাত্র অলৌকিক রস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কবি কর্ণপুর তাঁহার অলঙ্কার কৌস্তভ গ্রন্থে বলিয়াছেন "প্রকৃতাপ্রাকৃতাভাসভেদদেষ ত্রিধামতঃ" প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও আভাসভেদে এই রস ত্রিধা। এবং "প্রাকৃতো লৌকিকো মালতীমাধবাদিনিষ্ঠোঽ প্রাকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণরাধাদি নিষ্ঠ"ঃ অর্থাৎ একমাত্র ভাগবতী রতিই অলৌকিক ও রসোত্তীর্ণ হইতে পারে, পার্থিব রতি নহে। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে লৌকিকভাব অলৌকিক রসে পরিণত হইতে পারে কিন্তু বৈষ্ণব রসবেত্তাদের মতে যদি রস অলৌকিক হয় তবে তাহার ভাবও অলৌকিক হইবে। জীবগোস্বামী তাঁহার "ভক্তিসন্দর্ভ" গ্রন্থে বলিয়াছেন— "তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনী-নাম্নী বর্ততে প্রকাশবস্তুনঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিং তৎ পরমবৃত্তি রূপৈবৈষা তাঞ্চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্তে। তৎসম্বধেন চ স্বয়মতিতরং প্রীণাতীতি অতএব তস্য প্রীতি রূপস্যাপি ভক্তিপ্রীণনীয়ত্বম্।"

অর্থাৎ সেই পরমানন্দ-স্বরূপের হ্লাদিনী নামে যে স্বরূপশক্তি আছে যে শক্তিস্বত্ব পর উভয়েরই আনন্দদায়িনী। যেমন আলোকের নিজেকেও অপরকে প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, ঠিক তেমনই। এই জন্য হ্লাদিনী শক্তিকে পরমাবৃত্তি বলা হয়। এই হ্লাদিনী শক্তিকেই ভগবান স্ব-ভক্তবৃন্দে সঞ্চারিত করিয়া নিত্য বিরাজমান। সেই হ্লাদিনী

শক্তির সম্পর্কে আসিলেই তিনি স্বয়ং অতিশয় প্রীত হন। যদিও ভগবান নিজেই প্রীতি-স্বরূপ, তথাপি ভক্তিদ্বারা প্রীণনীয় হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণে হ্লাদিনী শক্তি রাধা। শক্তি ও শক্তিমানের তদাত্মা আছে বলিয়া রাধা-কৃষ্ণের একাত্মতা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম স্বরূপ এবং প্রেমের হ্লাদিনী শক্তি রাধারূপে অবতীর্ণা। বৈষ্ণবমতে লীলা প্রকাশের জন্য একে এই দ্বিধা-রূপাশ্রয়— "দোহার যে একমন ভিন্ননাহি হয়।
দুইরূপ এক আত্মা শাস্ত্রে নিরূপয়॥

অথবা

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেল মাধাই" —বিদ্যাপতি।

কৃষ্ণ মথুরা গিয়াছেন। বিরহিণী রাধা, কৃষ্ণ-ধ্যানে নিমগ্ন, কৃষ্ণের আসাপথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রতীক্ষমানা অবস্থায় রাধা দিবা-স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন— জাগ্রত রাধা জাগ্রত স্বপ্নের মধ্য দিয়া কৃষ্ণ-মিলন সুখ অনুভব করিতেছেন। এই অনুভূতিকে বৈষ্ণব-পদকর্তারা "ভাব-সম্মিলন" বা "ভাবোল্লাস" বলিয়াছেন। ভাবোল্লাসের মিলন বাহ্য মিলন নহে, অন্তর সত্তার মিলন—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু"
পেখলু' পিয়া মুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলু'
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।" —বিদ্যাপতি।

রাধার প্রেম ব্যাখ্যা করা চলে না। সখিরা রাধাকে প্রেমের অনুভূতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাধা বলেন—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিল তিল নূতন হয়োে।" —বিদ্যাপতি

গৌরাঙ্গ প্রভুরূপে রাধার প্রণয় মহিমা অনুভব

— দিব্যোন্মাদ দশা —

গৌরাঙ্গের ভাব কিছু বুঝন না যায়
ক্ষণে রাধা রাধা বলি ডাকে উভরায় ॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আর্তনাদ করে
কত মন্দাকিনী ধারা নয়নেতে ঝরে ॥
ক্ষণে কৃষ্ণভাবে গোরা বলে রাই রাই
ক্ষণে রাধাভাবে বলে কোথায় কানাই ॥"

গৌরপদ তরঙ্গিণী / চতুর্থ তরঙ্গ / তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

শ্রীরাধা-প্রণয়মহিমা দ্বারা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী-অনুভব: বংশীধ্বনি-শ্রবণ মাধুর্য—

"রামানন্দ স্বরূপের সনে
বসি গোরা ভাবে মনে
চমকি কহয়ে আলি আলি
খেনে খেনে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি।
পুন কহে স্বরূপের পাশে
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে ॥

(নরহরি / গৌরপদ তরঙ্গিনী / চতুর্থ উল্লাস / চতুর্থ তরঙ্গ)।

শ্রীরাধার সুখ-সীমা—

কি কহবরে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল
পিয়া-সুখ দরশনে তত সুখ ভেল। —বিদ্যাপতি

× × ×

বৈষ্ণব-কাব্য, ভক্তের হৃদয়-বিলাস নহে— ইহা সাধনের ইতিহাস। এই সাধনাই হইতেছে সখিভাবে সাধনা বা "মঞ্জরী-সাধনা"। বিশাখা-বৃন্দা প্রভৃতি সহচরীরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্য দিয়া সেই সখি-সাধনার মূল ভাবটিকে উদ্দীপিত করিয়াছেন—

"সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।
চৈতন্যচরিতামৃত / মধ্যলীলা / অষ্টম পঃ)

বৈষ্ণবদের মতে ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাব হইতেছে— মধুর ভাব। মধুর ভাবের উপাসনায় যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ অনির্বচনীয় এবং সীমাহীন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যম লীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে—

"সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাই গতি
সখী-ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি।

অতএব —

"অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার
রাত্রিদিন চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার।
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।"

ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা— "প্রেমরস" ইহা শৃঙ্গার পর্যায়ের নহে। ইহার পর্যায়গুলি হইতেছে— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

শান্ত প্রেমভক্তির নিষ্ঠা জাগায় – দাস্যভক্তি। দাস্যভক্তিতে একটি সম্ভ্রমবোধ বিদ্যমান। সখ্য ভক্তিতে ভক্তের মনে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ থাকে না। বাৎসল্য রসের মধ্যে একটি মমত্ববোধ সর্বদাই বিদ্যমান। তম্মধ্যে "মধুর রস" সর্বশ্রেষ্ঠ।

মধুর রস :— ভগবান এখানে 'কান্ত' ভক্ত 'কান্তা'। "মধুরা-রতি" এর স্থায়ীভাব। মধুরা-রতির নায়িকারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত— সাধারণী,

সমঞ্জসা এবং সমর্থা। তন্মেধ্যে সমর্থা সর্বশ্রেষ্ঠা। সাধারণী অবস্থায় ভক্তের স্পৃহা জাগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে। সমঞ্জসা অবস্থায় ভক্তের ইচ্ছা হয়— বিধি সম্মত উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সঙ্গ সুখ লাভ করার। সমর্থা অবস্থায় ভক্ত সামাজিক কোনো বিধি নিষেধ মানেন না. এবং ভগবান্‌ও ভক্তের বশীভূত থাকেন।

মথুরার কুব্জার রতি সাধারণী; দ্বারকায় রুক্মিণী, সত্যভামার রতি সমঞ্জসা এবং বৃন্দাবনে ললিতা বিশাখা, চন্দ্রাবলী ও রাধার রতি সমর্থা। এই চারিজন নিত্যপ্রিয়া। চন্দ্রাবলী ও রাধা নিত্যপ্রিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং চন্দ্রাবলী ও রাধার মধ্যে রাধা শ্রেষ্ঠা। রূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

সাধারণী ও সমঞ্জসাতে আত্মসুখের কথা আছে, কিন্তু সমর্থাতে আত্ম-সুখের আভাসটুকু নাই—

"নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য গোপীভাব-বর্য।"

(চৈতন্যচরিতামৃত / মধ্যলীলা / অষ্টম পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।৪৮।১০ অধ্যায়েতে বলা হইয়াছে—

"এহি বীর। গৃহং যামো ন ত্বাত্যক্তুমিহোৎসহে
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ........"

(এসো বীর ঘরে যাই, তোমাকে ছাড়িয়া মন যাইতে চাহেনা, আমার চিত্তকে তুমি উন্মথিত করিয়াছ, এখন আমাকে প্রসন্ন কর, কিছুদিন থাক ও রমণ কর ....)। পারিজাতহরণ কাহিনীর মধ্যে সত্যভামা কৃষ্ণের ভালবাসার প্রমাণ লাভের আশায় ব্যগ্র। সমর্থাতে এই আশা কামনা নাই।

ভাগবতের দশম স্কন্দে আমারা পাই— জ্যোৎস্না-হসিত রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনী শ্রবণ করিয়া সমস্ত ব্রজ গোপীরা নিজগৃহ, গৃহকর্ম্ম, পতিপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া কৃষ্ণকে সাময়িকভাবে অনুনয় করিয়া বলিয়াছেন— হে কৃষ্ণ, তুমি শরীরীগণের বন্ধু, আত্মা, তুমি ঈশ্বর, তোমার সেবাদ্বারাই সেবাদিধর্ম্ম সাধিত হউক, কারণ তুমি আমাদেরই পরম

প্রিয়, তোমার পদযুগল হইতে মন কিছুতেই সরিয়া যাইতে চাহে না তোমাকে ছাড়িয়া কি করিয়া ব্রজে যাই। কৃষ্ণ গোপীদের এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া একটি মাত্র গোপিনীকে লইয়া অন্তর্ধান করিয়াছিলেন, সেই গোপিনীই হইতেছেন— শ্রীরাধা—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বর
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দরহঃ। ২৪-৩০

এই গোপীপ্রেম নিষ্পাপ ও নিষ্কাম এবং ঋণ শোধ করা সুকঠিন। গোপীপ্রেম — দিব্যপ্রেম। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—

"Human love is made of emotion, passion and desire, all of them vital movements; therefore bound to the diasbilities of the human vital nature × × × Divine love is not merely a Sublimation of human emotions, it is a different consciousness, with a different quality, movement and substance."

(Beyond Emotion × × × Letters of Sri Aurabinda.)

মানবীয় প্রেম, হৃদয়ের ভাব সংরাগ ও কামনা-বাসনার সামগ্রী, দিব্যপ্রেম মানবীয় প্রেমের অনুবৃত্তি নহে, তাহা একেবারে পৃথক। দিব্যপ্রেমে কোনো প্রত্যাশা থাকেনা, মানবীয় প্রেমে দেখা যায় যে যাকে ভালবাসে তাহার নিকট হইতে প্রতিদানের আশা রাখে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—

"There is usually a hope of return, of benefit or advantage of some kind, or of certain pleasures and gratifications, mental, vital or physical that the person loved can give. Remove these things and the love very soon sinks, diminishes or disappears or turns into anger, reproach, indifference or even harted. But

there is also an element of habits something that makes the presence of person loved a sort of necessity." (Love in Human Relationship : Letters of Aurobinda)

রাধার প্রেম, দিব্যপ্রেম সন্দেহ নাই কিন্তু একেবারে নিখাদ নহে। রূপ হইতে অরূপের পথে যাইতে হইলে রূপের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। তাই হ্লাদিনী শক্তি রাধা রূপ সাগরেও ডুব দিয়াছেন—

"এ সখি সে সব প্রেম কহানী
কানু ঠাম কহনি বিছুরল জানি"
ন খোঁজলু দূতী ন খোঁজলু আন
দুইকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বান
অব সোই বিরাগ তহুঁ ভেলি দূতী
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি ॥

এই উক্তিতে দিব্যপ্রেম ব্যঞ্জিত হয় নাই ; কিন্তু রাধা যখন বলেন—

তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।"
তখন এই প্রেম সাধারণ নহে।

তুঃ — ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি
ঝরে অশ্রুরাশি ॥ উর্ব্বশী / চিত্রা।

অথবা

"আমার এইখানি তুলে ধরো
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো"

অথবা

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও
আমিও নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো" গান / রবীন্দ্রনাথ

এই প্রেম চরম প্রেম, প্রতিদানের আশা করা হয় না। এই প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়ী—

"সর্বদা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাবনন্ধনং যূনোঃ সঃ প্রেমা পরিকীর্তিতঃ"
(উজ্জ্বলনীলমণি / রূপ গোস্বামী।)

বীজ হইতে যেমন ইক্ষু, ইক্ষু হইতে রস, রস হইতে গুড়, খণ্ড চিনি, মিছরি ঠিক তেমনি "রতি" ক্রমান্বয়ে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব জন্মায়।

পদাবলী-সাহিত্যে মধুর রসের পদ সংখ্যা গরিষ্ঠ। এই মধুর রস দুইটি ভাগে বিভক্ত—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভের ভাগগুলি—পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য, প্রবাস ; সম্ভোগের শাখা—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান।

রস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন— নায়ক ও নায়িকার। বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্র মতে নায়িকার—অষ্টদশা "অর্থাৎ আটটি বিশেষ অবস্থা— অভিসারিকা, বাকস-সজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত-ভর্তৃকা। বৈষ্ণবপদকর্তারা, প্রতিটি পর্য্যায়ের পদ রচনা করিয়াছেন। অভিসারকে আবার এই কয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন— বর্ষাভিষার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকা অভিসার, তীর্থযাত্রা অভিসার, উন্মত্তা অভিসার, সঞ্চরা অভিসার, হিমাভিসার, তিমিরাভিসার। বাসক সজ্জিকার প্রকার ভেদ আছে—মোহিনী, জাগ্রতী, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, সুপ্তিকা, প্রগল্‌ভা, বিনীতা, সরমা।

পীতাম্বর দাস তাঁহার 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে আট প্রকার উৎকণ্ঠিতার বিবরণ দিয়াছেন— উন্মত্তা, বিকলা, স্তব্ধা, চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, প্রগল্‌ভা, নির্বন্ধা।

আশাহতা নায়িক বিপ্রলব্ধা। ইহারও অবস্থা বিশেষ আছে—বৈরাগ্য, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

মিলনের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া যদি নায়ক ঠিক সময়ে না আসিয়া পরদিন আসেন, তখন ঐ নায়িকাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলা হয়। ক্রোধ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, তুষ্ণীভাব, খণ্ডিতা নায়িকায় বিদ্যমান থাকে।

যে নায়িকা সখীদের সম্মুখে পদানত প্রিয়তমকে পরিত্যাগ করিয়া পরে অনুতাপ করেন—তাঁহাকে কলহান্তরিকা নায়িকা বলে।

নায়ক দূরদেশে গমন করিলে তাঁহার আগমনের দিকে চাহিয়া যে নায়িকা তাকাইয়া থাকেন- তাঁহাকে প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা বলে।

যে নায়ক নায়িকার অধীন—সেই নায়িকাকে স্বাধীন-ভর্তৃকা বলে।

বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে ইহার প্রতিটি পর্যায়ের পদ রহিয়াছে এবং বৈষ্ণব-রসসাহিত্যে ইহাদের বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে ইহার বিস্তৃততর আলোচনা হইতে বিরত থাকা গেল।

—ঃ ভাষা ও ছন্দ ঃ—

পদাবলী-সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গালাও নহে হিন্দীও নহে : ইহা মিশ্রভাষা। আধুনিক যুগে ইহা "ব্রজ-বুলি" নামে পরিচিত। ইহার মূলে আছে প্রধানতঃ দুইটি ভাষা— অবহট্‌ঠ ও মৈথিলী। ব্রজবুলি গানের ছন্দ— পুরাপুরি অবহট্‌ঠের। অনেকের ধারণা — ব্রজবুলি মূলে রহিয়াছে— হিন্দীর প্রভাব। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ব্রজবুলিতে মৈথিল ভাষার অংশই বেশি। এই মৈথিল-ভাষা ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভাষা। বিদ্যাপতি এই ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন।

ব্রজবুলি গীতি-কবিতার রীতি মিথিলা হইতে পূর্ব্বভারতের সংস্কৃতি-মান রাজ-সভাগুলিতে (নেপাল, মোরঙ্গ, বাংলা, উড়িষ্যা, কামতা) ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ব্রজ-বুলি ভাষা ও ছন্দে এবং তাহার রসলোকের মধ্যে এমন একটি অনির্ব্বচনীয়তা আছে, এমন একটি হৃদয়াবেগ আছে যে রসিক-চিত্তকে মুহূর্তের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইত। ইহার অভিনব সৌকর্য চমৎকারিত্ব, লোকোত্তর রমণীয়তা মানুষকে অভিভূত করিয়া রাখিবেই রাখিবে। তাই ইহা বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব এমনকি অহিন্দুকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাই মধ্যযুগে দেখিতে পাওয়া যায় জাতিতে মুসলমান হইয়াও সৈয়দ মুর্তজা, নসীর মামুদ প্রভৃতি কবিগণ বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছেন। 'কানুছাড়া গীতনাই' এই মহাবাণীটি ছত্রে ছত্রে সার্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার জের বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আসিয়াছে। বাংলা ভাষাও অসংখ্য বৈষ্ণবপদ রচিত হইয়াছে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন কবি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছেন। এছাড়া, গাথা, গীতি, পাঁচালী ঢপকীর্তন, আর্য্যা তর্জ্জা, শাড়ি জারি গানের মধ্যেও রাধা-কৃষ্ণ-কাহিনী অপ্রতিহত গতিতে আসিয়াছে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে ঐসকল গাথা পাঁচালী প্রভৃতিতে বৈষ্ণবীয় পরিবেশ ও ভাবধারা বিধৃত হয় নাই—

"রাজ নন্দিনী পড়লো ধরায়
ওমা তোরা ধর আয় ধর আয়
কমলিনী আয়গো তোরা এরাই যেন যায় মথুরায়
কর দিয়ে দেখ না যায়
বুঝি প্যারীর জীবন নাশ হয়
জীবন রইল যার আশায় সে যদি আসিয়া বাঁচায়।
(ঢপ-কীর্তন, মধুসূদন কান)

বাংলা-বৈষ্ণব-ধর্ম ও বৈষ্ণব-পদ বাংলা দেশের চিত্ত ও সাহিত্যকে তন্ময় করিয়া রাখিয়াছে। গীতগোবিন্দ হইতে যে ধারার সূত্রপাত হইয়াছে সেই ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আসিয়াছে। মধুসূদন অমিত্রাক্ষরের বজ্র-নির্ঘোষে সুপ্ত বাঙ্গালীকে জাগ্রত করিয়াছেন ; কিন্তু ব্রজের মধুর ভাবাবেশ তাঁহাকেও বিহ্বল করিয়াছে। যাহার ফলে গীতি-কবিতা রচনা করিতে গিয়া রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করিয়াছেন। তবে বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাবধারা ব্রজাঙ্গনাতে না থাকিলেও কবি-সুলভ আন্তরিকতার অভাব ছিল না। ব্রজাঙ্গনার ছন্দ-নির্মাণে মধুসূদন স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন— যতি-সংখ্যায়, ছত্র-সংখ্যায়, মিলে এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে। বাংলায় প্রথম অসমচরণ লিরিক কবিতা বলিয়াও ব্রজাঙ্গনার একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে—

সখিরে—
বন অতি রমিত হইল ফুটলে
পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল
চললো বনে।"

রজনী চট্টোপাধ্যায় মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার অনুকরণে "রাধাবিলাপ" রচনা করিয়াছিলেন (১৮৭২ খৃঃ) ছুন্দারিবধকাব্য" প্রণেতা জগবন্ধু ভদ্র পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রথম খণ্ড ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৫

খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়, বঙ্কিমচন্দ্র (তাঁহার উপন্যাসে) বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাংলার বিশুদ্ধ গীতি কবিতার যে ধারাটি নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রভৃতির "টপ্পায়" অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রণয়-সঙ্গীতে আসিয়া রুদ্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই ধারাটিকে বিহারীলাল নূতন করিয়া প্রবাহিত করেন তাঁহার "সঙ্গীত-শতকে"। শতাব্দীর প্রথম ভাগের পুরানো গীত-পদাবলীর সঙ্গে শতাব্দীর শেষ ভাগের নূতন গীতি কবিতার সংযোগের সাক্ষ্য বহন করে বিহারীলালের "সঙ্গীত শতক।"

'সারদামঙ্গল' বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। আধুনিক গীতি-কবিতা হইলেও ইহার মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাবের আমেজ আছে। এই কাব্যের মূল উপজীব্য হইতেছে প্রেম। বিহারীলালের মধ্যে বেদান্তের ছায়াও দুর্লক্ষ্য নহে।

সেই যুগে নব্য রোমান্টিক কবিদের অগ্রণী ছিলেন— দেবেন্দ্র নাথ সেন (১৮৫৫-১৯২৯) দেবেন্দ্র নাথের রচনায় মাইকেলের রীতি ও বিহারীলালের রীতি সম্মিলিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ভাবুক, তবে বিহারীলালের মতো আত্মহারা নহেন, এবং ইঁহার কবিতার বিষয় নিরাবিল ভাবনির্ভর বস্তুভারহীন নহে। নারী প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেবেন্দ্র নাথের কাব্যে বেশি স্থান লাভ করিয়াছে। পরিণত বয়সের রচনায় বাৎসল্য রসও লাভ করিয়াছে। তিনি ছিলেন বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসিক। অদ্ভুত অভিসার, দাম্পত্য-প্রেম, বাৎসল্য প্রীতি এবং ভগবদ্ভক্তি এই তিন দিকেই তাঁহার কবিতার স্বাভাবিক প্রবণতা। দেবেন্দ্র নাথের সমসাময়িক কবি ছিলেন— অক্ষয় কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)। ইনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমারের মধ্যে কিছুটা মিল আছে। এই ত্রয়ী কবির মধ্যে বৈষ্ণবীয় ঢংটি উপেক্ষণীয় নহে। বিহারীলাল "ভাবসম্মিলন" এর কবি, অক্ষয় কুমার "প্রেম-বৈচিত্ত্যের" কবি। ভগবদ্ভক্তির

প্রকাশকও অক্ষয় কুমারের কবিতার আর একটি ধর্ম্ম। এই যুগের মহিলা কবি মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় বৈষ্ণব-ভাব বিদ্যমান—

প্রোষিত ভর্তৃকা

প্রেমপান আশে হৃদয় আকাশে

রাখিনু যতনে শশী

নানা ফাঁদে হরিল সে চাঁদে

চাতুরী করিয়া পশি।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রজবুলি ভাষার শেষে কবি— রবীন্দ্রনাথ।* "ভানু সিংহ" রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম। এই নামে তিনি ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করিয়াছেন—

"হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে

কণ্ঠে বিমলিন মালা।

বিরহ-বিষে দহি বহি গেল রয়নী

নহি নহি আওল কালা॥"

অথবা

"সজনি সজনি রাধিকা লো

দেখ অবহুঁ চাহিয়া

মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে

মৃদুল গান গাহিয়া।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে কেহবা বৈষ্ণব ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছেন, আবার অনেকে ভাব ও ভাষাও গ্রহণ করিয়াছেন। ভানুসিংহ ঠাকুর পরিবেশ, ভাব, ভাষা ও ছন্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

---

*"আমি রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব কবি গোষ্ঠীর শেষ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করি।"
পদাবলী পরিচয়—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

— ছন্দ —

মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি। সেইজন্য অপভ্রংশ-সাহিত্য বাঙ্গালার আদর্শ। বাঙ্গলা-সাহিত্য অপভ্রংশ-সাহিত্য হইতে বহু রস আহরণ করিয়াছে। সেই বাঙ্গালা ছন্দের উপর প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দের প্রভাব অপরিসীম।

প্রাকৃত যুগেই মাত্রাছন্দের প্রচলন সুরু হয়। অপভ্রংশে এই কাঠামোর কিছুটা পরিবর্ত্তন ঘটে। চর্যার পদকর্তারা তাঁহাদের পদ রচনায় এই ছন্দ-রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে চর্যার ছন্দ বাঙ্গালা মাত্রাছন্দ এবং অপভ্রংশের মতো পঙ্‌ক্তি নির্ভর নহে, ইহাতে পর্ব বিভাগ সুস্পষ্ট—

৪	৪		৪	৪
কা-আ-	তরুবর	/	পঞ্চবি	ডা-ল- ।
৪	৪		৪	৪
চঞ্চল	চী-এ-	/	পইঠো	কা-ল- ॥

গীত গোবিন্দের পদগুলি অপভ্রংশ ছন্দে রচিত। তবে ইহাতে ধ্বনি সৌন্দর্য রহিয়াছে। ব্রজবুলির ছন্দ মৈথিল পদাবলীর ছন্দের অনুকরণে রচিত। উমাপতি ও বিদ্যাপতির ছন্দ অপভ্রংশ হইতে গৃহীত। তথাপি মৈথিল ও ব্রজবুলির উপর জয়দেবের প্রভাব গুরুতর। এই ছন্দের স্বরূপটি চিনিয়া লইতে হইলে কিছুটা তাহার মাত্রার উপর নির্ভর করিতে হয়। ব্রজবুলিতে সাধারণতঃ আমরা তিনমাত্রা, চারমাত্রার, পাঁচ ও সাত মাত্রার পদ পাই।

তিন মাত্রার ছন্দ ঃ—তিনমাত্রা চালের ছন্দ জয়দেব ও বিদ্যাপতিতে নাই, শেখর, জগদানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব-পদকর্তাদের রচনায় ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়—

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ম ঞ্জু বি ক চ কু সু ম কু ঞ্জু —জগদানন্দ।

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১
আ জু অ ম্ভু ত তি মি র র ঙ্গ—শশিশেখর।

চার মাত্রা ছন্দ—

১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ | ২ ১ ১ | ২ ২
ইথে য দি | সু ন্দ রি | তে জ ব | গে হ

২ ১ ১ | ২ ২ | ১ ১ ১ ১ | ২ ২
প্রে ম ক | লা গি | উ প থ বি | দে হ

জয়দেব—

মহুরব - লোকিত - মণ্ডল - লীলা
মধুরিপুরহমিতি - ভাবন - শীলা।

× × ×

চর্যা— সোনে ভরিতী করুণা নাবী
রূপ থোই নাহিকে ঠাবী॥ (পূর্বরূপ)

পাঁচ মাত্রা চালের ছন্দ—

২ ১ ১ ১ ২ ১ ২ | ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১
তু ঙ্গ ম ণি ম ন্দি রে | ঘ ন - বি জু রি স ঞ্চ রে

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ২
মে ঘ রু চি ব স ন প রি | ধা না।

জয়দেবে পাই—

স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্‌॥

সাত মাত্রা চালের ছন্দ—

১	১	১	১	২	১	১	১	১	২	১	১	২		
এ	স	খি	হা	মা	রি	দুঃ	খে	র	না	হি	ক	ও র		
১	১ ১	২	১	১	২	১	২	১	১	২ ১	২	১	১	২
এ	ভ রা	বা	দ	র	মা	হ	ভা	দ	র	শূন্য	ম	ন্দি	র	মোর

এই ছন্দ রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা এই গ্রন্থের অপর অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে।

—ঃ দশম অধ্যায় ঃ—

(পদাবলী-সাহিত্যের সহিত কবির পরিচয়)

দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ শিষ্য হইলেও উভয়ের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য ছিল। রামমোহনের ব্রহ্মবাদে ভক্তিবাদের কোনো স্থান ছিল না, কিন্তু দেবেন্দ্র নাথের ধর্ম্মচিন্তায় ইহাই হইল মুখ্য। দেবেন্দ্র নাথ একদিকে যেমন উপনিষদ গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন অপর দিকে তেমনি ফরাসী অধ্যয়ন করিয়াছেন। ফরাসী অধ্যয়ন কালে তাঁহার চিত্তভূমি হাফেজের মতো কবি ও সুফি সাধকদের চিন্তারসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। দেবেন্দ্র নাথ রামমোহনের বেদান্ত-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদকেই শাস্ত্র-রূপে গ্রহণ করেন। উপনিষদের বাণীতে জীবনের আশ্বাস ও মরণের নির্ভয় প্রতিশ্রুতি—

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ" (কে শ্বাস গ্রহণ করিত কেই বা বাঁচিয়া থাকিত, যদি এই আকাশ (মহাশূন্য) আনন্দময় না হইত—

"আনন্দাদ হ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম ॥

(আনন্দ হইতে প্রপঞ্চের জন্ম, যাঁহারা জন্মিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দের জন্য বাঁচেন, তাঁহারা আনন্দের দিকেই যায় এবং তাহাতেই সংবিষ্ট হয়। সেই আনন্দই স্পৃহনীয়, সেই আনন্দই ব্রহ্ম)।

দেবেন্দ্র নাথের গৃহে যখন এই 'আনন্দের' হাওয়া বহিতেছিল, রবীন্দ্র তখন জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্র নাথের মাথায় ঋণের গুরুভার চাপাইয়া গিয়াছেন। 'মা গৃধ কস্যাস্বিদ্ ধনম্" অর্থাৎ কাহারো ধনে লোভ করিও না। ইহাকে

অবলম্বন করিয়া "তেন ত্যক্তেন" বুঝিয়া দেবেন্দ্র নাথ সংসারের প্রয়োজন সংকীর্ণ করেন। তাই শৈশবে রবীন্দ্রনাথ আর দশজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি ছেলের মতই কাটাইয়াছেন।

এই হাওয়াতেই শৈশব হইতে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে উপনিষদের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অনুভূতি ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল— ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ইহা অন্তরকে ও বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করিয়া জানাই হইতেছে এই মন্ত্রের সাধনা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন। মহর্ষির এই জীবন, রবীন্দ্রনাথেরও জীবন-দর্শন; ইহাই তাঁহার অধ্যাত্ম-ভাবনা। তাঁহার অধ্যাত্ম-ভাবনা একান্তভাবেই নিজস্ব। তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে এই ভাবনা ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলাশ্রয়ী। সেই মূলের দুইটি প্রধান শাখা—উপনিষদের আনন্দ দর্শন এবং বৈষ্ণব-সাধনার লীলাবাদ। এই দুইয়ের হাওয়ায় তাঁহার কাব্যের হাওয়া তৈয়ারী হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের ধাতে সহ্য হয় নাই। তাঁহার শিক্ষা গৃহে এবং নিজের চেষ্টায়। গৃহ-শিক্ষায় বাঙ্গালার উপর জোর ছিল। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরাজী উপেক্ষিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যখন বালক তখনই ঠাকুর বাড়ীতে সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও চলিয়াছিল। সাহিত্য আসরে অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী উপস্থিত থাকিতেন। এদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী ছিলেন। উপরন্তু তখন ঠাকুর বাড়ী হইতে পত্রিকা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল। ১২৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় "ভারতী" প্রকাশিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকাও তখন প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্য 'ভুবন-মোহিনী প্রতিভা' অবসর সরোজিনী, সুখসঙ্গিনীর সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বিহারীলালের 'অবোধবন্ধু' রাজেন্দ্রলাল

মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের নিয়মিত পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, জীববিদ্যা, শরীরতত্ত্ব-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-পদাবলীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেই সময়েই তিনি চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের সঙ্গে তাঁহার কিভাবে পরিচয় হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"একবার পিতার সঙ্গে গঙ্গার বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার সঙ্গের বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত গীত-গোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা, ছন্দ অনুসারে তাহার পদের বিভাগ ছিল না, গদ্যের মত এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সেই গীত-গোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই। কিন্তু ছন্দের ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিষটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে, গদ্য রীতিতে বইখানি ছাপা হইয়াছে বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটাই আমার বড় আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি "অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণি-ভূষণম্ হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্" এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িলাম, সেদিন কতই সুখী হইয়াছিলাম।" জীবনস্মৃতিতে (পৃঃ ১২১ বিশ্বভারতী সং) তিনি আরও বলিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের "প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ" সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল।* গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন, কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না, সুতরাং এগুলি জড় করিয়া আনিতে

*১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ অমৃত বাজার পত্রিকায় বৈষ্ণব-পদকর্তাদের পদ প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে (১৮৭১ খৃঃ জগবন্ধু ভদ্র) বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ প্রকাশ করেন।

রূপেও তিনি একেবারে বদলাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—

যত চঞ্চলতা করে চঞ্চলিয়া
তত কাঁদে প্রাণ তাহারই লাগিয়া।

তাই আমরা দেখিতে পাই যে ব্রজবুলি রবীন্দ্রনাথের নিকট শুধু বাহ্যিক আদর্শ ছিল না; ব্রজবুলির ধ্বনি-মাধুর্য, ছন্দ-চাতুর্য, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে একটি বিরাট প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ পয়ার ও ত্রিপদীর গতানুগতিকতা পরিহার করিয়া একটানা তালের উপর নির্ভর না করিয়া স্বরের মাধুর্যের দিকে দৃষ্টি দিয়া অভিনব ছন্দ পদ্ধতিতে পয়ার ও ত্রিপদী রচনা করিয়াছিলেন। এইক্ষেত্রে তিনি বৈষ্ণব-পদকর্তা গোবিন্দদাসের নিকট সর্বাপেক্ষা ঋণী। জয়দেবের নিকট রবীন্দ্র-নাথের ঋণ কোনো অংশে কম নহে। কারণ জয়দেবের ছন্দ রবীন্দ্রনাথের কান দুরস্ত করিয়াছিল এবং জয়দেব শব্দাবলী রবীন্দ্রনাথের ভাষাচেতনার মধ্যে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে তাহার অভিব্যক্তি কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দের ব্যবহার রূপে রবীন্দ্রনাথের রচনায় শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। জয়দেব ব্যবহৃত এই শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথ বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন—তিমির, নিভৃত, নিলয়, নিলীন, বিপুল, মেদুর, রভস, বিপিন, বিতান, বল্লি, ললিত, নীপ, গহন, মধুযামিনী প্রভৃতি।

ছন্দের ক্ষেত্রেও জয়দেবের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়—

"রতিসুখসারে গমনভিসারে
মদনমনোহরবেশম্
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশম্।" ৫.৮ (জয়দেব)

তুঃ— সতিমির রজনী সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত কলয়ে সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষণ্ণ।

নীল আকাশে তারকা ভাসে
যমুনা গাওত গান
পাদপ মরমর নির্ঝর ঝর ঝর
কুসুমিত বল্লি বিতান। (ভানুসিংহ ঠাকুর)

জয়দেব :— বদসি যদি / কিঞ্চিদপি / দন্তরুচি / কৌমুদী
হরতিদর / তিমিরতি / ঘোরম্
স্ফুরধর / সীধবে / তব বদন / চন্দ্রমা ॥
রোচয়তি । লোচন-চ. / কোরম্ ॥

তুঃ ভানুসিংহ : গ্রামাকুল / বালিকা / সহজে পশু / পালিকা
হামকিয়ে / শ্যামউপ / ভোগ্যা।
রাজকুল / সম্ভব / সুরমিরহ / গৌরবা।
যোগ্যজনে / মিলয়েজনু / যোগ্যা।

জয়দেব :— মঞ্জুল - বঞ্জুল - কুঞ্জ গতং
বিচকর্ষ করেণ দুকূলে

তুঃ ভানুসিংহ : বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে
চঞ্চল অঞ্চলে গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে।"

জয়দেব :— কলিত ললিতবনমালে জয় জয় দেব হরে।

তুঃ ভানুসিংহ : অঙ্গে তব হিন্দোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলি কল্লোলে।

জয়দেব :— মেঘৈর্মেদুরসম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্ন্ক

তুঃ রবীন্দ্রনাথ —
আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডমরু বাজিল গম্ভীর গরজনে"

জয়দেবের শব্দ ব্যবহার :
সেথা নিভৃত নিলয় সুখে মানসী / ভাল করে বলে যাও।

× × ×

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

বিজন যমুনা কূলে বিকশিত নীপ মূলে। মানসী / পত্র

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে

জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে।" কল্পনা / বর্ষামঙ্গল।

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে। চিত্রা / রাতে ও প্রভাতে

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর বাহিরেও দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের ভাষা চেতনায় কিছু সংখ্যক ব্রজবুলি ও তজ্জাত শব্দ শেষদিন পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে ছিল —

দোঁহে, দোঁহা, দুহুঁ—

দোঁহে অনন্তে ডুবি নিশিদিন....। রাহুর প্রেম / ছবি ও গান

× × ×

দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে। কড়ি ও কোমল / চুম্বন।

× × ×

অরুণ উদিলে ক্ষণেকের তরে চাব দুহুঁ দোঁহা পানে

মানসী / ভাল করে বলে যাও।

× × ×

একদা কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে। সোনারতরী / দুই পাখি।

× × ×

দোঁহে মোরা রব চাহি। সোনারতরী / মানস সুন্দরী।

নিরখিয়া— ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া। সোনারতরী / নিদ্রিতা।

শিথান— শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে। (ঐ)

বঁধু— হে বঁধু এ স্বচ্ছবাস ...। সোনারতরী / লজ্জা।

লখিতে— "কখন যে নাহি পারি লখিতে।" (ঐ)

গোধূলি— গোধূলি বেলায় তখনো জ্বলেনি দীপ কল্পনা / ভ্রষ্টলগ্ন।

বিকচ— করুণা কিরণে বিকচ নয়ান। কথা / অভিসার।

বিহান— বিহান হল জাগোরে ভাই। ক্ষণিকা / জন্মান্তর।

গোখুর— উড়িয়ে গোখুর বেণু। (ঐ)

শাঙণ— শাঙণ মেঘের ছায়া পড়ে.... ক্ষণিকা / জন্মান্তর

অনিমিখ— জ্যোৎস্না অনিমিখ চারিদিক সুবিজন। মানসী / ক্ষণিক মিলন।

পসারিয়া— দুই বাহু পসারিয়া। সন্ধ্যাসঙ্গীত / গান আরম্ভ।

আঁখিয়া— আধ মুকলিত আঁখিয়া। ছবি ও গান / সুখস্বপ্ন।

ধড়া— একা আছি বনে বসি
পীত ধড়া পড়ে খসি— কড়ি ও কোমল / মথুরায়।

সোঙড়ি— সোঙড়ি সে মুখশশী...। (ঐ)

সজনী— আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী কড়ি ও কোমল / বিলাপ।

জনম অবধি ও দগধি— জনম অবধি বিরহে দগধি
মানসী / নবদম্পতির প্রেমালাপ।

চীর— পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে/ সোনারতরী/বর্ষাযাপন।

গোঙালেম— ভেবেছিনু দিন মিছে গোঙালেম ক্ষণিকা / কৃতার্থ।

ধটি— তোমার কটি তটে ধটি— শিশু / খেলা।

বাছনি— নাচিছ বাছনি— (ঐ)

ছন্দে :— গোবিন্দদাসের অনুসরণ :—

শারদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লি মালতি যুথি
মত্ত মধুপ ভোরণি॥ গোবিন্দ দাস।

তুঃ— গহন কুসুম-কুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনী আও আওলো। ভানুসিংহ।

—ঃ একাদশ অধ্যায় ঃ—

রাধাকৃষ্ণ ও কবি

রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে বেদ উপনিষদের বিপরীত ধর্মী নহে ; এবং ইহা সর্ব ভারতে বিদিত ও স্বীকৃত। এই তত্ত্বের সার্বজনীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"রাধা-কৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বাংলার বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব, তত্ত্বজ্ঞানী ও মূঢ় সকলের পক্ষেই উপাদেয় ......" লোকসাহিত্য।

রাধা-কৃষ্ণের দ্বৈতরূপের মধ্যেই পদাবলী সাহিত্যের প্রেম নিহিত। অদ্বৈত হইলে প্রেম থাকিতে পারে না, অর্থাৎ প্রেমের জন্য প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়েরই প্রয়োজন।

রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

"The Vaisnava doctrine of devine love and friendship with mingles the Vedantic Brahma and gives him a spiritual in sight and intuition."

The appeal of Rabindranath / Cent vol.

Calcutta Municipal Gazette / Dr. S. K Banerjee.

আবার একথাও ঠিক, রাধা ও কৃষ্ণের দ্বৈত সত্তার মূলে আছে "অদ্বৈতেরই" লীলাবিলাস বা পরম সত্তার স্ব-মাধুর্যের আস্বাদন। রাধা ও কৃষ্ণ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন—

"রাধে ভিন্ন না ভাবিও তুমি
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গাচরণে
শরণ লইনু আমি।"

অথবা

"সুন্দরি কাহে করসি তুহু খেদ।
তুয়া বিনা রাতি দিবস হাম না জানিয়ে
কোন করল তুহু ভেদ।

সৃষ্টি ব্যতীত স্রষ্টা যেমন অপূর্ণ, তেমনি রাধা ছাড়া কৃষ্ণ। বৈষ্ণবদের মতে প্রেম জন্মজন্মান্তরের অনন্ত সাধনার ধন। ইংরেজ কবি রসেটি বলিয়াছেন যে, প্রেম ভগবানের সমান অসীম, অনাদি, কারণ ভগবান নিজেই প্রেমময়; এবং আত্মার ধর্ম হইতেছে—প্রেম সাধনা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the poets of the Vaisnava sect came to my hand when I was young. I became aware of some underlying idea deep in the abvious meaning of these love poems. I felt the joy of an explorer who suddenly discovers the key of the Language lying hidden in the hieroglyphs which are beautiful in themselves. I was sure that poets were speaking about the Supreme Lover, whose touch we experience in all our relations of love, the love of nature's beauty, of animal, the child, the comrade, the beloved, the love that illuminates our consciousness of reality. They sang of a love that ever flows through numerous obstacles between man and man the Divine, the eternal relation which has the relationship of mutual dependance for a fulfilment that needs perfect union of individuals and Universal."

"The vision" page 105 / the Religion of Man.

কবির এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে রাধা কৃষ্ণের প্রেম, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অথবা জীব ও বিশ্বদেবতার অনাদি প্রেমের প্রতীক। ইহাই সীমা ও অসীমের লীলা।

পদাবলী সাহিত্যের প্রেমের প্রকাশ ভঙ্গি ঃ

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের প্রকাশ ভঙ্গি ঃ

—ঃ মানসী ঃ—

মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলির অন্যতম বৃত্তি— প্রেম। প্রেমের গতি যেমন বিসর্পিল, তাহার প্রকৃতিও তেমনি অদ্ভূত। প্রেমের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রেমকে মোটামুটিভাবে ভাগ করা হইয়াছে— স্বকীয় প্রেম, পরকীয়া প্রেম স্বৈরিণী প্রেম এবং দ্বৈরিণী প্রেম। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর প্রেম, পরনারীর সঙ্গে প্রেম, বারবণিতার প্রেম ও দ্বিচারিণীর প্রেম। এর মধ্যে আবার স্তর ভেদ আছে এবং প্রেমের প্রকাশভঙ্গিও পৃথক দেখিতে পাওয়া যায়— ভ্রাতা-ভগ্নীর ভালবাসা, সহোদরের প্রতি ভালবাসা, বন্ধুর প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি। প্রেমকে অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে রচিত হইয়াছে, বিভিন্ন কাব্য, নাটক, গাথা, গীতিকা। মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের যেমন সম্পর্ক, ঠিক তেমনি প্রেমের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ।

করুণরস হইতেই যে ভালবাসার সৃষ্টি তাহা কাব্য নাটক বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় নিষিদ্ধ প্রেমের মধ্যেই করুণরস বিশেষভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

প্রেমের বা শৃঙ্গার রসের আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব হইতেছে নর ও নারী। পদ্মের জন্ম যেমন পাঁকের ভিতর, ঠিক তেমনি প্রেমের জন্ম কামের মধ্যে। কাম শব্দটির সংকীর্ণ হইতেছে দেহলালসা। দেহকে বাদ দিয়া দেহাতীতে যাত্রা করা অসম্ভব। সুতরাং দেহকে অবলম্বন করিয়াই দেহাতীতের দিকে যাত্রা করিতে হয়। দেহাত্মবাদ বা দেহলালসার কথা প্রাচীন কাল হইতেই সংস্কৃত, প্রাকৃত, অবহট্‌ঠ প্রভৃতি ভাষার রচিত সাহিত্যগুলিতে বিধৃত হইয়া আসিয়াছে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে পাই, মহারাজা দুষ্যন্ত আশ্রম-পালিতা শকুন্তলাকে দেখিয়াই বলিলেন—

"অনাঘ্রাত পুষ্প × × × মধুমনাস্বিদতরসম্", এবং ভ্রমর-ভীতা শকুন্তলাকে দেখিয়াই দুষ্যন্তের অন্তরে জাগিয়াছে— "পিবসি রতিসর্বস্বধরম্"।

গাথা সপ্তশতী, অমরুশতক, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থেও বহু দেহাশ্রয়ী প্রেম-কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। জয়দেবের গীত-গোবিন্দে "হরিস্মরণের" উল্লেখ থাকিলেও সেখানে আদিরসের অভাব নাই—

"কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্
কৃতপরিরম্ভণ-চুম্বয়া পরিবভ্য কৃতাধরপানম্" ২ / ১২

(কিশলয় শয়নে যখন শুইয়া থাকি, আমার প্রিয় কান্ত, আমার বক্ষেই শয্যা রচনা করেন এবং আমি যখন তাঁহাকে দুই বাহুপাশে বন্ধন করিয়া চুম্বন করি তখন আমার কান্ত আমার চুম্বনের প্রত্যুত্তর দেন—)
তুঃ Holy Bible : Old Testament : Song of Solomon :-
"Let him Kiss me with the Kisses of his mouth : for thy love is better than wine.

ইহার ব্যঞ্জিত অর্থ যাহাই হোক না কেন, বাহ্য দৃষ্টিতে ইহাকে দেহাশ্রয়ী বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। জয়দেব গোস্বামীকে অনুসরণ করিয়াই বাঙ্গালা দেশে পদাবলী-সাহিত্য রচনা সুরু হয়। সুতরাং জয়দেবের ভাব ও ভাষাকে পরবর্তী কালের পদকর্তারা রিক্থ হিসাবেই পাইয়াছেন। তাই বড়ু-চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পদে দেহাত্মবাদ ও দেহ লালসার উগ্রবিলাস দৃষ্ট হয়—

"ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ
উচ্চ কুচ যুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস।"

বিদ্যাপতিও সেই একই কাম-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন—

"ধনি অলপ বয়স বালা
জনু গাঁথনি পুহপ মালা
থোরি দরশনে আশা ন পূরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা ॥"

রাধা-কৃষ্ণের এই দেহ লালসা ধীরে ধীরে বিলীন হইতে থাকে; 'কাম' প্রেমে রূপান্তরিত হইতে সুরু করে, রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"সই, কেনে গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে ॥
দিয়া হাসা সুধাচার অঙ্গছটা আঠাতার
আঁখি-পাখি তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী সেইকালে পড়িল রূপের জালে
বাঁশি-ফাঁসি গলায় লাগিল।"

এই ফাঁস উত্তরোত্তর ঘনতর হইতে সুরু করে।

"কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি লেল" গোবিন্দ দাস।

রাধা স্নানে চলিয়াছেন অতি মন্থর গতিতে, বালুকারাশি উত্তপ্ত, সেইদিকে দৃষ্টি পড়াতে রাধার কষ্টের কথা চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণের আঁখি যুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল এবং কৃষ্ণের সজল নয়ন-কমল পুষ্পাঞ্জলির মতো রাধার চরণে লাগিয়া রহিল।

ইহাই হইতেছে প্রেমের জন্য চরম ত্যাগ এই ত্যাগের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— "ত্যাগের সহিত প্রেমের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, ত্যাগ ছাড়া প্রেম হয়না, প্রেম না থাকিলে ত্যাগ করাও যায়না।" (শান্তিনিকেতন পত্রিকা।)

রাধার অবস্থা এমন পর্যায়ে পেঁৗছিয়াছে যে তিনি এক কথা শুনিতে অন্য কথা শুনিতেছেন, এক বুঝিতে আর এক বুঝিতেছেন, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর না দিয়া ছল ছল চোখে চাহিয়া থাকেন অথবা জুয়াখেলায় সর্বহারা মানুষের মতো তিনি মলিন মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকেন—

"করহু কপোল থাপিত রহু ঝামরি
জনু ধন-হারি জুয়াড়ী।"

পরিশেষে কৃষ্ণকে সর্বস্ব দিয়া বলিলেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হইও তুমি।" (চণ্ডীদাস)

কান্তা প্রেম, অপ্রাকৃত প্রেম।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে যেমন দেখি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ধাপে ধাপে প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের পথে যাত্রা করিয়াছে, ঠিক তেমনি দেখি সংস্কৃত সাহিত্যে রূপজমোহ-প্রেম পরিশোধিত হইয়া স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হইয়াছে। ভোগসর্বস্ব-রূপজমোহ-প্রেম মহাকবি কালিদাসের "কুমার সম্ভব" কাব্যে মহাদেবের তৃতীয় নেত্রবহ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছে, শকুন্তলায়, শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রেম ঋষি কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পরিশেষে শোধিত হইয়াছে, মেঘদূতকাব্যে যক্ষ কুবের কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছে।

গাথা-গীতিকার—মহুয়া, মলুয়া, মইশালবন্ধু প্রভৃতিতে নায়ক-নায়িকার প্রেম সমাজের তরফ হইতে নিষিদ্ধ। তবুও এই নিষিদ্ধ প্রেমের মধ্যে যে গতি আছে, তাহা হৃদয় দিয়া অনুভবের বিষয়। পদাবলীর প্রেমের সঙ্গে ঐ গাথাগুলির প্রেমের মধ্যে একটি মাত্র পার্থক্য আছে— পদাবলীর নিষিদ্ধ প্রেম দার্শনিক আওতার মধ্যে আসিয়া 'সিদ্ধ' হইয়াছে এবং গাথা-গুলির নিষিদ্ধ প্রেম নিষিদ্ধই রহিয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই নিষিদ্ধ-প্রেম-গঙ্গার প্রবাহ খরস্রোতাই ছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে স্রোতের ভাটা পড়িতে সুরু করে। নিষিদ্ধ প্রেমের মধ্যে যে আবেগ ছিল, বৈধতার মধ্যে সে আবেগ ধীরে

ধীরে বিলীন হইতে থাকে। কবিওয়ালাদের হাতেও সেই শুষ্ক খাতে জোয়ার আসে নাই—

"মনে রয়ে গেল সই মনের বাসনা
তারে বলি বলি করে বলা হ'ল না।"

অথবা

তুমি ভাল বাসিবে বলে আমি বাসিনে ভাল।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"
বিধুর মুখে মধুর হাসি
দেখতে বড় ভালবাসি।
তাই দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥"

এই সকল প্রেম-গীতিতে কৌলিন্যজর্জর বাঙ্গালী বধূর বেদনা আছে. কিন্তু রাধার বেদনার মত তীব্রতা নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে, বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় বড়াল প্রমুখ কবিগণ প্রেমের কবিতা রচনা করিতে গিয়া বৈষ্ণবতাকে অবলম্বন করিলেও বৈষ্ণব-পদের সে আবেগ, আর্তি নাই।

রবীন্দ্রনাথও প্রেমের কবি। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীও প্রেমের কবিতা এবং বৈষ্ণবীয় ভঙ্গিতে রচিত। তবুও বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে ভানুসিংহ ঠাকুর, পদাবলীসাহিত্যের প্রেমের স্বরূপটি পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" এর মধ্য দিয়া কবি-মানসের স্বপ্ন-ভঙ্গের পর যে-কাব্যগুলি রচিত হয় তাহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণব-পদকর্তারা (প্রাক্-চৈতন্যযুগে) যেমন দেহলালসার কথায় উদাসীন ছিলেন না ঠিক রবীন্দ্রনাথও তেমনি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ "কড়ি ও কোমল" এ প্রেমের যে-আবেগ লইয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা একান্তই পার্থিব ভোগ ক্ষুধার। কবি, কাম প্রেমের দ্বন্দ্বে পড়িয়া ত্যাগ-ধর্মকে গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই—

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে আমার নহে।"

তাই দেহলালসার কথা এই যুগে স্পষ্ট—

"কাহারে যে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেয়োনা যেয়োনা। বাহু / কড়ি ও কোমল।

× × ×

লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন
ছিঁড়োনা ছিঁড়োনা দুটি বাহুর বন্ধন।" বাহু / কড়ি ও কোমল।

× × ×

অধরের কোণে যেন অধরের ভাষা
দোঁহার হৃদয় যে দোঁহে পান করে।" চুম্বন / কড়ি ও কোমল।

× × ×

প্রতি অঙ্গ কাঁদে প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন॥
দেহের মিলন / কড়ি ও কোমল

যৌবনের উন্মাদনা, যৌবনের চটুলতা, যৌবনের দেহলালসা কবিকে তাহার পঙ্কিল আবর্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। ভোগের মধ্যেই মাঝে মাঝে ভোগাতীতের জন্য কবির আকুতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। দেহরতিতে শ্রান্ত হইয়া কবি বলিয়াছেন—

সুখশ্রমে আমি সখী শ্রান্ত অতিশয়
পড়েছে শিথিল হয়ে শিরার বন্ধন
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুম শয়ন,
কুসুম-রেণুর মাঝে হয়ে যাই লয়। শ্রান্তি/কড়ি ও কোমল।

অথবা

দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ—
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।" বন্দী / কড়ি ও কোমল।

অথবা

যে প্রদীপ আলো দেবে তাতে ফেল শ্বাস
যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ। পবিত্র প্রেম/কড়ি ও কোমল

দৈহিক ভোগে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। কবি "চিত্রাঙ্গদার" মধ্যেও তাহাই বলিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার উপজীব্য হইল নরনারীর প্রেম। চিত্রাঙ্গদার পরিকল্পনা সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন—

"অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতার দিকে। তখন বোধ হয় চৈত্র মাস হবে। রেললাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগুনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তাদের রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে তখন পল্লী প্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তবু প্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন প্রগল্‌ভ ফল সম্ভারে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হলো সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার সু-রূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতীন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যেন তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র শক্তি থাকে তবে সেই মোহ মুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জয়যাত্রার সহায়। সেই দানে আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলি প্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চরিত্র-শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মল, প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক এ নয় প্রাকৃতিক।

(রবীন্দ্র রচনাবলী। ৩য় খণ্ড)

চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের নায়ক অর্জুন এবং নায়িকা-চিত্রাঙ্গদা। কুমার সম্ভবের পার্ব্বতী যেমন মহাদেব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপে অর্জুন কর্তৃক চিত্রাঙ্গদাও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। কালিদাসের পার্ব্বতী ধিক্কার দিয়াছিলেন নিজের রূপকে, কারণ—'প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলাহি চারুতা'

আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ধিক্কার দিল নিজের কর্মকে। নিজের রূপের অভাবকে—

এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত

পার্ব্বতী সুরু করিয়াছেন—তপস্যা। চিত্রাঙ্গদা সুরু করিলেন রূপের সাধনা। অর্জুন ধরা দিলেন রূপের কাছে। সুরু হইল চিত্রাঙ্গদার অন্তর্দ্বন্দ্ব। অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল মনে প্রাণে—

"দেহের সোহাগে—
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর?"

পরে এই রূপজ প্রেমের মধ্য দিয়াই যথার্থ প্রেমের উদয় হইল। ভোগের প্রতি কবির তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশিত হইয়াছে—

"বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি।
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরী নিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ
দেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাস, প্রেমে হও বলী,
চেয়োনা তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের
শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল। নিষ্ফল কামনা / মানসী।

অথবা

কোথা, নাথ কোথা তব সুন্দর বদন—
কোথায় তোমার, নাথ বিশ্বঘেরা হাসি।

আমায় ঘেরিয়া লও, কর গোপন
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী।

ক্ষুদ্র আমি / কড়ি ও কোমল।

কবির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ক্রমেই প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে এবং দেখা যায় যে বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে ঐ সময়ে কবির অন্তরের একটা ভাবের যোগাযোগ সূত্রপাত হইয়াছে—

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি-প্রাণ
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠেছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ

× × ×

যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন

× × ×

অসীমে জগতে এক পিরিতির আদান-প্রদান।"

(চিরদিন / কড়ি ও কোমল।)

এই যুগে ভোগাতীতের জন্য একটা প্রবল আক্রন্দ কবির অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে 'মানসী' রচনাকালে কবির মনোভাব ও মানস-অভিযানের বেগ প্রস্ফুটিত নহে। মানসীতে আর্তি আছে, চাঞ্চল্য আছে, বেদনা আছে; কিন্তু পূর্ণতা নাই। কড়ি ও কোমলের কবিতার মধ্যে যে ইন্দ্রিয় ভোগের তাড়না এবং তাহার বিরাগ, মানসীতে বহির্ভোগ দূরীভূত, অন্তর্ভোগের মধ্যে চেতনা লাভ করিয়াছে—

"অন্তর বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।"

(উপহার / মানসী।)

'মানসী'র যৌবন-স্বপ্নে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গিও লক্ষ্য করা যায়। কবির অন্তরে পুরাতন প্রেমের জ্বালাহীন স্মৃতির অভিসার সুরু হইয়াছে। কবি-মানসে যে আশা ছিল, তাহাকেই তিনি দিতে চাহিয়াছেন একটি কাব্যিক রূপ—

আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা" (উপহার / মানসী।)

ধীরে ধীরে অন্তরের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, কবি প্রেমের প্রকৃত রূপটি উদ্ঘাটন করিয়াছেন—

"তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
× × ×
তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে
ভালোবাসিতে মরি শরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।
× × ×
আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান। (গুপ্তপ্রেম/মানসী)

"সুরদাসের প্রার্থনা" কবিতায় দেখি, কবি বাসনার দৃষ্টি দিয়া প্রেমিকাকে দেখিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভুল ভাঙ্গিয়া যায় এবং বলেন —

"লহ মোরে তুলে আলোক মগন মুরতি ভবন হতে,
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে একাকী অসীম ভরা
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন, মিলাবে সকল ধরা।"
× × ×
তবে তাই হোক্ হয়োনা বিমুখ, দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি—
হৃদয়-আকাশে থাক্‌না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখি কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয়-নীল-উৎপল চিরদিন রবে পায়।

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।

× × ×

"হরি হীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে
বাড়ে তৃষা কোথা পিপাসীর জল অকূল লবণ-নীরে"

এই কবিতায় বিদ্যাপতির উক্তির প্রতিধ্বনি পাই—

তুঃ— "কৈসে গমায়ব হরি বিনু দিন রাতিয়া।" (বিদ্যাপতি)

"ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূর থেকে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি-মুখখানি,
লাজে বাধো বাধো সোহাগের বাণী
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উচ্ছাস
নয়ন কূলে।" (ভুলে / মানসী।)

এই প্রেম-কবিতাটির বৈশিষ্ট্য কোথায়? শুধু প্রেমের বিলাস-ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আবার যখন কবি বলেন—

"আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।" (ক্ষণিক-মিলন/মানসী)

তুঃ— চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর। (চন্ডীদাস)

অথবা

ওগো ভাল করে বলে যাও
বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও॥
যদি না বলিবে কিছু তবে কেন এসে

মুখপানে শুধু চাও।
ভাল করে বলে যাও। (মানসী)

উপরিউক্ত কবিতা দুইটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে—প্রথম কবিতাটি কোনো পুরুষের উক্তি বলিয়া অনুমিত হয় এবং দ্বিতীয় কবিতাটি যেন কোনো নারীর উক্তি। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, গীতাঞ্জলিতে যে সকল প্রেমের কবিতা তাহার বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে কোনো কবিতায় নারীর উক্তি এবং কোনো কবিতায় পুরুষের উক্তি ঃ

উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করা হইল—

এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ
এমন যামিনী কাটিল বিরহ
শয়নে। (ব্যর্থ যৌবন / সোনারতরী।)

এ যাহারই আর্তি হোক এর পশ্চাতে আছে বৈষ্ণব-কবিতার আকুলতা—এইখানেই পাই পদকর্তাদের অশরীরী প্রভাব। কিন্তু কেন ? কারণ ভারতীয় কবি-মানসের প্রেমময়ী মূর্তি—রাধা ; বিরহিণী রাধা। শুধু যে রাধা আসেন তাই নয় ; সঙ্গে সঙ্গে আসে বৃন্দাবনের পরিবেশ—আসে—বাঁশী, যমুনা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি—যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। কোনো কবির রচনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে হইলে তাঁহার কবি মানসটিকে জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় তথা বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিবেশে লালিত-পালিত ; সুতরাং আজন্মের সংস্কার ও পরিবেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের প্রকৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবন-ধারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। ইহার মূল হইতেছে অধ্যাত্ম চেতনা এবং কাব্য-সাহিত্য চেতনা। ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব যেমন একদিকে অধ্যাত্মবাদ ও সাহিত্যের মধ্যে নবনব ভাবনার উদ্রেক করিয়াছে ঠিক তেমনি গাথা-গীতিকা, কাব্য-নাটক, উপকথা, রূপকথা সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লোকগাথার উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি রূঢ় বর্বর প্রেম-কাহিনীকে

অবলম্বন করিয়াই রচিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।" অধ্যাত্মবাদ ও সাহিত্যকে আরও সঞ্জীবিত করিয়াছে ভারতীয় ঋতু-চক্র। ষড়-ঋতুর মধ্যে বর্ষা ঋতুর সঙ্গে ভারতীয় জন-মানসের একটি নিকট সম্বন্ধ আছে। বর্ষা নরনারীর মনে আনে উন্মাদনা, মানব মনকে করিয়া তোলে অন্তর্মুখী।

প্রেম মানুষের সহজাত বৃত্তির অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। প্রেম-ভাবনাতে বর্ষা নবনব রূপে কলেবরে আবহমানকাল হইতে সাজাইয়া আনিতেছে। এই নবনব ভাবনা ঋগ্বেদের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত একটানা চলিয়া আসিয়াছে। বেদে বর্ষা জড় জীবনের ভরসার প্রতীক, মেঘদূতে প্রেম-জীবন আশার, পদাবলী-সাহিত্যে বর্ষা বিরহীকে পরিত্যাগ করিয়া বিরহিণীর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে বর্ষা বিশ্ব ঋতুরঙ্গে জীবনলীলা-নাটের মাথুর দৃশ্যের মতো। বর্ষার সঙ্গে কদম্বকুঞ্জের নিবিড় যোগ ; সে যোগ কালিদাসে, সে যোগ বৈষ্ণব-পদাবলীতে, সে যোগ রবীন্দ্র-নাথে। তাই রবীন্দ্রনাথ বাসনা সংস্কার ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভুলিতে পারেন নাই। যেমন—

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকিঝিনি
কে গো তুমি একাকিণী আসিছ ধীরে।

(হৃদয় যমুনা / সোনারতরী)

উপরিউক্ত অংশটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা রচিত। এখানে রাধা বা কৃষ্ণ কেহই নাই। তথাপি এই কবিতার পিছনে পদাবলী-সাহিত্যের অশরীরী গোপললনা বিদ্যমানা। 'হৃদয় যমুনা' কবিতার মধ্যে কবি নিজের হৃদয়কে মেলিয়া ধরিয়াছেন—যমুনার রূপকে। 'যমুনা' শুধু নদী নহে। যমুনা নামের পিছনে যে সত্য রহিয়াছে তাহা ভৌগলিক সত্যকে অতিক্রান্ত করিয়া কাব্য-সত্যে, ভাব-সত্যে উপনীত হইয়াছে। যমুনা নামের সঙ্গে অনেক স্মৃতি, অনেক কাহিনী, অনেক বেদনা জড়িত। -প্রাচীনকালে যমুনাতটে

বাঁশি বাজিত, অভিসারিণীদের নূপুরের ধ্বনি শোনা যাইত। কবির মানস-প্রতিমাও যেন ঐ অভিসারিণীদের একজন। কবি বলিয়াছেন—"ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকিঝিনি।" এই মানস-প্রতিমা অদেহা, কল্পলোকের, অসঙ্গা। তাহার অভিসার বর্ষারাত্রে নহে, দিবা অভিসার, কুজ্ঝটিকা অভিসার, সঞ্চরা অভিসার, উন্মত্তা অভিসার বা আর কোনো অভিসার নহে, ইহা কবি-হৃদয়ের মানসাভিসার এবং তাহা গোপনে ও নিঃশব্দে। হৃদয়-যমুনার উপমা-ধ্বনির মধ্য দিয়া কবি সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের নব রূপায়ন করিয়াছেন।

দিবা অবসানে জলের ঘাটে জল আনিতে যাওয়া বাঙ্গালাদেশের মেয়েদের নিকট চিরপরিচিত এবং ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক প্রথাও বটে। সেই জলের ঘাটে বহু যুবতীর বহু অচেনা যুবকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছিল, প্রেম সংঘটিত হইয়াছিল; ইহা বাস্তব জগতের কাহিনী। পদাবলী-সাহিত্যেও এই সাক্ষ্যাৎ, প্রেম-সংঘটনের চিত্র আছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথাকে ভুলেন নাই, তাই—

"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল।" (বধূ / মানসী।)

তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রেম প্রকাশের ভঙ্গিটি "পতিত পত্রে বিচলিত পত্রে" ও "মুখরিত মোহনবংশী"র তানে আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে। 'পাখীর ডাকে বাঁশীর তানে কম্পিত পল্লবে' পরিবেশে কবি চিত্ত বার বার দেখা দিয়াছে— প্রতীক্ষমানা বিরহিণীর সাজে—

"দিবস রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
'কে আসিছে' বলে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখি।' (মায়ার খেলা / পঞ্চম দৃশ্য)

রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতায় দুইটি সত্তা বিরাজিত—নায়িকাসত্তা এবং নায়কসত্তা। আক্ষেপ—উক্তি কবিতায় নায়িকাসত্তা প্রবল।

"আমি বৃথা অভিসারে যমুনাপারে এসেছি ॥"

(ব্যর্থ যৌবন / মানসী।)

× × ×

আজি যে রজনী যায় ফিরাব তায় কেমনে

(ব্যর্থ যৌবন / সোনারতরী।)

এখানে নায়িকাসত্তাকে বার বার স্মরণ করায়। নায়ক-কণ্ঠের প্রেম—সতী বিরহে শিবের কণ্ঠে ধ্বনিত বিষণ্ণ ভৈরবীর মতই সে-সুর ধ্বনিত হইয়াছে—

তার পর চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার
দেখা শুনা হ'ল সারা
স্পর্শ-হারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।

অথবা

"ফিরিয়া যেওনা, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায়নি এখনো,
সময় রয়েছে বাকি
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখোনা মনে কোনো।"

নায়িকার বিদায়কালে নায়ক কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—

"তারপরে যেও তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুত পায়ে দলে
নীড়ে ফেরা পাখী যবে

অস্ফুট কাকলি রবে
দিনান্তকে ক্লান্ত করি তোলে
বেণুচ্ছায়া ঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরীর সর্ব শেষ সুরে।"

এখানে প্রেমিক-হৃদয়ের কথা ধ্বনিত হইয়াছে কঠিন সংযমের মধ্য দিয়া। প্রেমের স্মৃতি-চারণও নিবিড়তা বিহীন নহে—

তারপরে কতদিন চলে গেল পিছে
একটি দিনেরে দলিয়া পায়ের নিচে।
বহুপরে ঘরে ফিরিলাম প্রিয়ে
এপথে আসিতে দেখি চমকিয়ে
আছে সেই কূপ, আছে সে যুগল তরু
তুমি নাই, আছে তৃষিত স্মৃতির মরু।"

তাই দেখিতে পাই কবির প্রেম-কবিতার মধ্যে একদিকে হর-পার্ব্বতীর প্রেম, অপরদিকে রাধাকৃষ্ণের প্রেম। এই দুই প্রেম কবির প্রেম-কবিতায় নব-রূপে রূপায়িত হইয়াছে এবং এই প্রেমে আছে নাগরিক শালীনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের মর্যাদা এবং নৈতিক সচেতনতা। দার্শনিক মর্যাদার মধ্য দিয়াও প্রেমের বিপুল গৌরব রক্ষিত হইয়াছে—

"যে প্রেম পথের মাঝে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।" (শাজাহান / বলাকা)

অন্তর্যামী
ও
জীবন দেবতা

কবির জীবনদেবতা একদিনে বা কোনো একটা বিশিষ্ট মতবাদ লইয়া সৃষ্ট হয় নাই। উপরন্তু কবি কোনো দর্শনসূত্র অথবা কোনো তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার অন্তর্যামী জীবনদেবতা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। অন্তর্যামীর কথা উপনিষদে আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই—

"সর্ব্বাণি ভুতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভুতানি
শরীরং যৎ সর্বাণি ভুতানি অন্তরো ময়য়তি এষৎ আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইতি।"

গীতা ও বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে; তবু কবির অন্তর্যামী গীতা, উপনিষদ বা বৈষ্ণব শাস্ত্রের অন্তর্যামী নহে। বৈদিক কবির সুপর্ণ সিম্বলের ছায়াপাত হয়ত ক্ষাণিকটা পড়িতে পারে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন "যদি কবি সত্তার সহিত বৃক্ষ উৎপ্রেক্ষিত হয় ত:বই জীবনদেবতাকে স্বাদু পিপ্পলাশন সুপর্ণের সঙ্গে এবং অপর সুপর্ণ যিনি" অনশ্নন অভিচকশীতি "তাঁহাকে অন্তর্যামীর সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া যায়। ঋগ্বেদ / ১, ১৬৪-২০। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে ও জগৎকে দেখিয়াছেন যথাক্রমে পিপ্পলাদ ও অনশন সুপর্ণের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের ভাষায় গীতি ও স্থিতির অবস্থায়। জীবনকে তিনি মরণাবিচ্ছিন্ন খণ্ডরূপে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন অনাদ্যন্ত প্রাণপ্রবাহের তরঙ্গশীর্ষরূপে। —বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / ৩য় খণ্ড পৃঃ—২০

(রবীন্দ্র খণ্ড)

কবির জীবন-দেবতা কবির কাব্যের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহের বিশ্লেষণ করিলে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে সহজ হইবে। তাই কাব্য প্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথম যৌবনে অস্ফুট প্রতিভার বিকাশ বেদনা কবিকে আকুল করিয়াছে। নিজেকে পরিস্ফুট করিতে না পারায় বেদনা অনুভব করিয়াছেন—

"আমি যে আপনায় ফোটাতে পারি নাই
পরান কেঁদে তাই মরিছে। গুপ্ত প্রেম / মানসী

যেদিন নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয় সেই দিনই কাব্য-নির্ঝর মুক্তি লাভ করে। কবি তখন বিশ্ব প্রকৃতির সহিত আপন কবি প্রকৃতির একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেন এবং রচনা একটি নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি লাভ করে। কবি যেন দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন অথবা শাপ ভঙ্গের পর অহল্যা যেমন ধরিত্রীর দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন কবিও যেন তেমনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কবি উপলব্ধি করিলেন—

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্তর ধরি..................' বসুন্ধরা / সোনার তরী।

অথবা—

মনে হয় যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে............."

সমুদ্রের প্রতি / সোনার তরী

এই সম্পর্কে অন্যত্র কবি বলিয়াছেন—' "এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন, আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূর-ব্যাপী চেনাশোনা আছে। × × তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন

মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন জীব-জন্তু কিছুই ছিলনা, × × × তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের এই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে'' ছিন্নপত্র ; ৯ / ১২ / ১৮৯২

সৌন্দর্যে'র পূজারী কবি, তাই সসীম সৌন্দর্য ও অসীম সৌন্দর্য'কে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। এই সুষমা-মণ্ডিত সৌন্দর্য'কে কবি নানারূপে, প্রেয়সীরূপে, মোহিনীরূপে আবার গোহিনীরূপে দেখিয়াছেন।

ঐন্দ্রিক সৌন্দর্য বস্তু নিরপেক্ষ কিন্তু বস্তুর মধ্য দিয়াই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হয় অর্থাৎ রূপ হইতে অরূপের পথে যাত্রা করিতে হয়। যেমন ভোগের মধ্য দিয়াই ভোগাতীতে পৌঁছাইতে হয়। কবি 'উর্বশী' কবিতায় বলিয়াছেন---

নহ-মাতা, নহ কন্যা. নহ বধূ সুন্দর রূপসী,
হে নন্দন-বাসিনী, উর্ব্বশী। চিত্রা।

এই উর্ব্বশী সৌন্দর্যলক্ষ্মী. ''বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি, বিকশি'' উঠে। একহাতে তার 'সুধাপাত্র' আর হাতে 'বিষভাণ্ড,।

এই যে অনির্বচনীয় বস্তু-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য, যাহা কাহারও কোনো কিছুতেই লাগেনা. তাহাকে সমস্ত জগৎ পূজো করিতেছে। এবং তাহাকে লাভ করিবার জন্য আকুল আক্রন্দ ধ্বনিত হইতেছে—

''ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।

শুধু তাই নয়, এখনো—

''দূর-স্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি।''

সুন্দরকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার এই যে অনন্ত বাসনা তাহাই কবিচিত্তকে বিরহিনী করিয়াছে। এই বিরহই হইতেছে সীমা ও

অসীমের বিরহ ; ইহাই কবির সাধনার কাব্য পালা ; তাই পথ চলা। "চরৈবেতি চরৈবেতি"— কবির কাব্যেরও বিষয়বস্তু—

"প্রতি নিমেষে যেতেছে সময়
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়"

ইহাই নিরুদ্দেশের যাত্রা। বংশীধ্বনি কবিকে উতলা করিয়াছে, পথের সংকেত দিয়াছে, কবিকে গৃহছাড়া করিয়া উদাসীন করিয়াছে। নদী ঝরণার গতি, কবি চিত্তকে গতি-দান করিয়াছে, বলাকার গতি কবির অন্তরকে গতিমুখীন করিয়াছে, তাই কবি বলিয়াছেন— .

হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনোখানে" বলাকা।
তাই কবি-আত্মা পৃথিবীতে—

'প্রবাসী' হইয়া থাকিতে চাহেন নাই। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সকলের সঙ্গে একাত্ম হইতে চাহিয়াছেন—

"সবঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া"

তাই প্রথম যৌবন হইতেই দেখি কবির ছুটিয়া চলার নেশা—

"ছুটে আয় তবে ছুটে আয় সবে
অতি দূর দূর যাব
কোথায় যাইব ? কোথায় যাইব ?
জানিনা আমরা কোথায় যাইব—
সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়।"

কবির এই চলার পথে তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। যদিও এই তিনটি স্তর মূলতঃ একই পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায় তথাপি ধ্যান-ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। অথবা বলা যাইতে-পারে—কবি যাঁহার আকর্ষণে ছুটিয়া চলিয়াছেন সেই আকর্ষণকারী বা আকর্ষণ-কারিণী তিনটি স্তরে বা ধারায় বিভক্ত। সেই তিনটি ধারা হইতেছে— মানসী বা মানস সুন্দরী, দ্বিতীয় ধারায়— এই মানস সুন্দরী হইয়াছেন— অন্তর্যামী এবং তৃতীয় স্তরে অন্তর্যামী হইয়াছেন—জীবনদেবতা।

মানসী কাব্যগ্রন্থে একটি নূতন সুর দেখা দিয়াছে। মানসীর 'উপহার' শীর্ষক কবিতায় কবি সেই নূতন সুরের পরিচয় দিয়াছেন—

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত।
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারারাত।

× × ×

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।"

তখনই কবিকে কে যেন ডাকিয়া আনিলেন—

"কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে। ভুলে / মানসী

যদি ডাকিয়াই আনিয়াছেন তবে—

দেখি ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কিনা পড়ে
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে।" ঐ

কবি স্মৃতিচারণ করিতে সুরু করেন—

"ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।" ঐ

প্রথম যৌবনে অস্ফুট প্রতিভার বিকাশ বেদনা কবিকে আকুল করিয়াছে। নিজেকে পরিস্ফুট করিতে না পারার বেদনা অনুভব করিয়াছেন—

"আমি যে আপনার ফোটাতে পারি নাই
পরান কেঁদে তাই মরিছে। গুপ্ত প্রেম / মানসী

যেদিন নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয় সেই দিনই কাব্য-নির্ঝর মুক্তি লাভ করে। কবি তখন বিশ্ব প্রকৃতির সহিত আপন কবি প্রকৃতির একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেন এবং রচনা একটি নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি লাভ করে। কবি যেন দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন অথবা শাপ ভঙ্গের পর অহল্যা যেমন ধরিত্রীর দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন কবিও যেন তেমনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কবি উপলব্ধি করিলেন—

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্তর ধরি..................' বসুন্ধরা / সোনার তরী।

অথবা— মনে হয় যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে............"

সমুদ্রের প্রতি / সোনার তরী

এই সম্পর্কে অন্যত্র কবি বলিয়াছেন—' "এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন, আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূর-ব্যাপী চেনাশোনা আছে। × × তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন

মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন জীব-জন্তু কিছুই ছিলনা, × × × তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের এই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে" ছিন্নপত্র ; ৯ / ১২ / ১৮৯২

সৌন্দর্যের পূজারী কবি, তাই সসীম সৌন্দর্য ও অসীম সৌন্দর্যকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। এই সুষমা-মণ্ডিত সৌন্দর্যকে কবি নানারূপে, প্রেয়সীরূপে, মোহিনীরূপে আবার গোহিনীরূপে দেখিয়াছেন।

ঐন্দ্রিক সৌন্দর্য বস্তু নিরপেক্ষ কিন্তু বস্তুর মধ্য দিয়াই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হয় অর্থাৎ রূপ হইতে অরূপের পথে যাত্রা করিতে হয়। যেমন ভোগের মধ্য দিয়াই ভোগাতীতে পৌঁছাইতে হয়। কবি 'উর্বশী' কবিতায় বলিয়াছেন—

নহ-মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দর রূপসী,
হে নন্দন-বাসিনী, উর্ব্বশী। চিত্রা।

এই উর্ব্বশী সৌন্দর্যলক্ষ্মী, "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি, বিকশি" উঠে। একহাতে তার 'সুধাপাত্র' আর হাতে 'বিষভাণ্ড'।

এই যে অনির্বচনীয় বস্তু-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য, যাহা কাহারও কোনো কিছুতেই লাগেনা, তাহাকে সমস্ত জগৎ পূজা করিতেছে। এবং তাহাকে লাভ করিবার জন্য আকুল আক্রন্দ ধ্বনিত হইতেছে—

"ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী।

শুধু তাই নয়, এখনো—

"দূর-স্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি।"

সুন্দরকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার এই যে অনন্ত বাসনা তাহাই কবি-চিত্তকে বিরহিনী করিয়াছে। এই বিরহই হইতেছে সীমা ও

অসীমের বিরহ ; ইহাই কবির সাধনার কাব্য পালা ; তাই পথ চলা।
"চরৈবেতি চরৈবেতি"— কবির কাব্যেরও বিষয়বস্তু—

"প্রতি নিমেষে যেতেছে সময়
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়"

ইহাই নিরুদ্দেশের যাত্রা। বংশীধ্বনি কবিকে উতলা করিয়াছে, পথের সংকেত দিয়াছে, কবিকে গৃহছাড়া করিয়া উদাসীন করিয়াছে। নদী ঝরণার গতি, কবি চিত্তকে গতি-দান করিয়াছে, বলাকার গতি কবির অন্তরকে গতিমুখীন করিয়াছে, তাই কবি বলিয়াছেন—

হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনোখানে" বলাকা।
তাই কবি-আত্মা পৃথিবীতে—

'প্রবাসী' হইয়া থাকিতে চাহেন নাই। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সকলের সঙ্গে একাত্ম হইতে চাহিয়াছেন—

"সর্বঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া"

তাই প্রথম যৌবন হইতেই দেখি কবির ছুটিয়া চলার নেশা—

"ছুটে আয় তবে ছুটে আয় সবে
অতি দূরে দূরে যাব
কোথায় যাইব ? কোথায় যাইব ?
জানিনা আমরা কোথায় যাইব—
সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়।"

কবির এই চলার পথে তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। যদিও এই তিনটি স্তর মূলতঃ একই পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায় তথাপি ধ্যান-ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। অথবা বলা যাইতে-পারে—কবি যাঁহার আকর্ষণে ছুটিয়া চলিয়াছেন সেই আকর্ষণকারী বা আকর্ষণ-কারিণী তিনটি স্তরে বা ধারায় বিভক্ত। সেই তিনটি ধারা হইতেছে— মানসী বা মানস সুন্দরী, দ্বিতীয় ধারায়— এই মানস সুন্দরী হইয়াছেন— অন্তর্যামী এবং তৃতীয় স্তরে অন্তর্যামী হইয়াছেন—জীবনদেবতা।

মানসী কাব্যগ্রন্থে একটি নূতন সুর দেখা দিয়াছে। মানসীর 'উপহার' শীর্ষক কবিতায় কবি সেই নূতন সুরের পরিচয় দিয়াছেন—

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত।
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারারাত।

× × ×

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।"

তখনই কবিকে কে যেন ডাকিয়া আনিলেন—

"কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে। ভুলে / মানসী

যদি ডাকিয়াই আনিয়াছেন তবে—

দেখি ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কিনা পড়ে
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে।" ঐ

কবি স্মৃতিচারণ করিতে সুরু করেন—

"ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।" ঐ

কবি যাঁহার নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে কোনো প্রতিদান পাইতেছেন না। কবি "ভুলে" আসিয়াছেন এবং 'ভুল ভাঙিয়া' গেল—

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে
রয়েছে ডোর।" ভুল ভাঙা / মানসী।

আবার একদিন মিলন হইল, কিন্তু তাহা ক্ষণিক মিলন—

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।"
ক্ষণিক মিলন / মানসী।

কিন্তু— "আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।" ঐ

তুঃ— চলে নীল সাড়ি নিঙারি নিঙারি
পরাণ সহিত মোর" চণ্ডীদাস

কবি আবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন—

"আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে?" শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা / মানসী

কবির সঙ্গে যিনি এই খেলা খেলিতেছেন, কবি তাঁহাকে সর্বত্র দেখিতে পাইতেছেন—

"আমি যেমনি করিয়া চাই,
আমি যেমনি করিয়া গাই,
বেদনাহীন ওই হাসিমুখ
সমান দেখিতে পাই" আত্মসমর্পণ / মানসী।

আত্মসমর্পণ করিলেও সংশয় দূর হয় না—

"জীবনের কাজ আছে প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা।" সংশয়ের আবেগ / ঐ

সংশয়ের চেয়ে বিচ্ছেদেও ভাল—

"যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও
আমি রহি একধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি—
একেবারে ভুলে যেয়ো শতগুণে ভালো সেও
ভালো নয় প্রেমের বিকৃতি ॥ বিচ্ছেদের শান্তি / ঐ

তথাপি, প্রেম নাহি মানে পরাভব। বিদায় লইবার মুহূর্তেও কবি মিনতি করিতেছেন—

"তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে
হয়ে আসে দূর-স্মৃতি কাহিনী কেবলি" — তবু / ঐ

প্রকৃতির মধ্যেও কবি তাঁহার মানসীকে অনুভব করিতেছেন—

"যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহারূপরাশি"। প্রকৃতির প্রতি / ঐ

তাই কবি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া "মানসী প্রতিমাকে অধিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক—

"স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।" নিভৃত আশ্রম / ঐ

'নারী ও পুরুষের' উক্তির মধ্য দিয়া কবি দ্বন্দ্বের নিরসন করিতে চাহিতেছেন—

এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহ কোণে
দেবতার তরে থাক পুষ্প-অর্ঘ্যভার" পুরুষের উক্তি / ঐ

এই মানসী প্রতিমার মধ্য দিয়াই কবি তাঁহার প্রেমিক-সত্তার প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে কোনো "দৈবী চেতনা" নাই। কবির দুঃখ, প্রেম কেন স্থায়ী হইতেছে না—

ভুল করে এসেছিলে? ভুলে ভালোবেসেছিলে?
ভুল ভেঙ্গে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া? মানসী।

কিন্তু কবির ত কোনো উপায় নাই, কারণ—

"তুমিত ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল—
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল" ব্যক্ত প্রেম / মানসী

তবুও কবি মানসী-প্রতিমার ধ্যান করিবেন—

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি। ধ্যান / মানসী।

কবি যাঁহার ধ্যান করিতেছেন তিনি সর্বত্র, তিনি ধ্যান-গম্ভীর-মহিম, তিনি অসীম অথচ কবি-সত্তা সসীম—

"তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ-পূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চির-নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—
যত দূর হেরি দিগদিগন্তে
তুমি আমি একাকার।" ধ্যান / ঐ

এই কবিতায় কবি, ব্যক্তিগত প্রেমের সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া অধ্যাত্ম-প্রেমের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছেন। "সীমা ও অসীম" তত্ত্বটি

রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধা যেমন সত্য কৃষ্ণও তেমনি সত্য; রবীন্দ্র-সাহিত্যে সীমা যেমন সত্য অসীমও তেমনি সত্য। রাধা-কৃষ্ণ উভয়েই উভয়েরই যেমন পরিপূরক ঠিক তেমনি সীমা ও অসীম। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"In love, at one of its poles you find the personal, at the other the impersonal. At one you have the positive assertion × × × Here I am; at the other the equally strong denial × × I am not without this ege how can love be possible".

Sadhana. P. 114-15.

এই প্রেম, শুধু আজিকার নহে, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই প্রেমের লীলা চলিয়া আসিতেছে। তাই এই প্রেম 'নিত্য'।

বৈষ্ণব দর্শনের মূলে তত্ত্ব-ত্রয় হইতেছে - ভগবান্ নিত্য, জীব নিত্য এবং উভয়েই প্রেম— তাহাও নিত্য; সুতরাং প্রেম, জন্মজন্মান্তরের অনন্ত সাধনার ধন। ইংরাজ কবি রসেটি বলিয়াছেন—
প্রেম ভগবানের সমান, অসীম অনন্ত, আত্মার ধর্ম প্রেম সাধনা। আত্মা অজয় অমর; সুতরাং প্রেমও অমর। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীত হার
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার' অনন্ত প্রেম / মানসী।
সোনার তরীর 'মানস-সুন্দরী' কবিতায় কবি মানসী-প্রতিমাকে একটি রূপের

মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, এবং তাঁহাকে একটি অনিন্দনীয় সুন্দরী নারী-মূর্তিতে দেখিতে চাহিয়াছেন। পুরুষের নিকট, নারীর সৌন্দর্য'ই চরম সৌন্দর্য বলিয়া প্রতিভাত। নারীকে সুন্দর লাগে কেন? কারণ নারী হইতেছে পরম-সুন্দরের বিকাশ মন্দির। কবির উর্বশী ও মানস-সুন্দরী কবিতা দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে। কবি উর্বশীতে দেখিয়াছেন উর্বশীর সমস্ত সৌন্দর্য জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। আর মানস সুন্দরীতে কবি দেখিয়াছেন জগতের সমস্ত সৌন্দর্য ঘনীভূত হইয়া একটি নারী-মূর্তির মধ্য দিয়া যেন বিধৃত হইয়াছে। তাই কবি প্রশ্ন করিয়াছেন—

"সেই তুমি মূর্তিতে দিবে কি ধরা।" অর্থাৎ abstract কি Concrete হইয়া ধরা দিবে। পরবর্তীকালে কবি এই ভাবটিকে একটি গানের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন—

"একদা তুমি প্রিয় আমারি এ তরুমূলে
বসেছো ফুলসাজে সেকথা যে গেছো ভুলে
সেথা সে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি প্রবাহিনী. গীতবিতান

এই মানস সুন্দরী মানবীও নহেন, কল্পনাও নহেন— "অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। তিনি মর্ম-সহচরী এবং নর্ম-সহচরীও। কল্পনা হইতে বাস্তবে যুগ হইতে যুগান্তরে তিনি ব্যাপ্ত। তিনি শরীরী হইয়াও অশরীরী, আবার অশরীরী হইয়াও শরীরী।

এই মানস সুন্দরী প্রথমাবস্থায় ছিলেন বালিকা, তারপর ধীরে ধীরে যৌবনে উপনীত হন। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার অনুরূপ চিত্র আছে।

"কোথা সেই
অমূলক হাসি অশ্রু সে চাঞ্চল্য নেই
সে বাহুল্য কথা।"

তুঃ "প্রকট হাস গোপত ভেল
বরণ প্রকট ফের উন্নক লেল
চরণ চরণ চলন গতি লোচন পার
লোচনক ধৈরজ পদতলে জার।" বিদ্যাপতি।

এই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে ধরিবার জন্য কবির আর্তি চিত্রাকাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রার উর্বশী, বিজয়িনীর মধ্যে এই ভাবের স্বাক্ষর স্পষ্ট। কবি রূপের মধ্যে এক অরূপের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। কবির দৃষ্টি নারীর দুইটি চিরন্তন রূপ— প্রেয়সী ও শ্রেয়সী অথবা মোহিনী ও শোহনী। কবির দুইবোন উপন্যাসেও এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। প্রেয়সী বা মোহিনীর অপূর্ব প্রতীক— উর্বশী। উর্বশী সৃষ্টির আদিম-কাল হইতে পুরুষের অন্তরে বাসনা-বারিধি উদ্বেলিত করিয়া আসিয়াছে। মানব-হৃদয়ের ঐকান্তিক কামনা-সৌন্দর্যকে কবি উর্বশীর মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। উর্বশী আজ আর নাই কিন্তু মানুষের অন্তরে উর্বশীর জন্য যে আকুতি দেখা যায় তাহা চিরন্তন। সেই সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

"তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি
ঝরে অশ্রুরাশি। উর্বশী ; চিত্রা

চৈতন্যপ্রভুর জীবনালেখ্যে পাই— জ্যোৎস্না হাসিত মধুযামিনী তাঁহাকে উদ্বেলিত করিত। জ্যোৎস্না রজনীর মধ্যে তিনি সেই পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন— "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" ভাগবতেও পাই— "তা রাত্রী শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" অর্থাৎ শরৎকালের আগমনে মল্লিকাফুল ফুটিয়া উঠিয়া রাত্রিকে মোহনীয় করিয়া তুলিতেছে। সেই সময়ে— "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশ-কর-রঞ্জিতম্ যমুনানিলসলিলৈ-রূপপল্লব শোভিতম্" শারদ জ্যোৎস্না রজনীতে ব্রজ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনী শ্রবণ করিলেন এবং কাজ ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ঐ সৌন্দর্যপুঞ্জের মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর রসামৃত মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন লীলাচ্ছলে নিজেকে অন্তর্হিত করিলেন, কিন্তু তখনো ব্রজ গোপীরা সেই পরম পুরুষকে সর্বত্র দেখিতে লাগিলেন—

এবং "কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূং ব্যচক্ষতে বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ" তারপর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভূত হইয়া যমুনা পুলিনে গোপীদের লইয়া রাসনৃত্য সুরু করেন, তখন প্রতিটি ব্রজগোপী মনে করিতেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তাহারই পার্শ্বে রহিয়াছেন— তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়ো" পুরুরবাও ঠিক তেমনিভাবে উর্বশীকে সর্বত্র অবলোক করিয়াছেন— লতাকে উর্বশী ভাবিয়া আলিঙ্গন করা মাত্রেই লতাটি উর্বশীরূপ যেন ধারণ করিয়াছিলেন—

তুঃ 'তুয়াভাবে তরু দেই কোর'

নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যেও পুরুরবা উর্বশীকে দেখিয়াছেন 'তরঙ্গভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগ শ্রেনিবশনা বিকর্ষন্তীকেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলয় যথা বিক্ষং ধাতি স্খলিতমভিস ...." (বিক্রোমোর্বশীয়ম্ ৪ / ৭৩)

যতদিন উর্বশী পুরুরবার নিকট ভাব রূপিণী ছিলেন ততদিন উর্বশী ও পুরুরবার মিলন অচ্ছেদ্য ছিল এবং সেইজন্যই পুরুরবা উর্বশীর মিলনমণি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখনই পুরুরবা উর্বশীকে ভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া নিজ আয়ত্তে আনিতে চাহিয়াছেন তখনই শ্যেন পক্ষী তাঁহাদের মিলনমণি হরণ করিয়া লইয়া যায়। যক্ষ তাহার প্রিয়াকে লাভ করিবার লালসায় ধাতুরাগ দিয়া শিলাপটের উপর প্রিয়ার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, কিন্তু সেই চিত্র যখন যক্ষ লালসার দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছিল তখনই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া অঙ্কিত চিত্রকে দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরাল করিয়া দিয়াছিল—

"ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া—
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈঃ দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ

মেঘদূত / উত্তর মেঘ / ৪৪

এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার "শিশুর বিদায়" শীর্ষক কবিতার মধ্যেও দেখাইয়াছেন। খোকা মাকে ত্যাগ করিয়া গেলেও একেবারে চলিয়া

যাইবে না, সে বাতাসের মধ্য দিয়া জলের শীতলতার মধ্য দিয়া বৃষ্টির রিম ঝিম শব্দের মধ্য দিয়া, বিদ্যুতের জ্যোতি হইয়া স্বপ্নে মাকে স্পর্শ দিয়া যাবে —

"পূজোর কাপড় হাতে করে
মাসি যদি শুধায় তোরে
খোক কোথায় গেল চলে ?
বলিস 'খোকা সে কি হারায়'
আছে আমার চোখের তারায়
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে"।

ইংরাজ কবি শেলী তাঁহার Hymn to intellectual beauty কবিতাতে অনুরূপ একটি সৌন্দর্যময়ী মূর্তির কথা বলিয়াছেন—

Spirit of beauty that dost Consecrate with thine own hues all thou doet shine upon of human thought or form, where art thou gone.'"

শেলীও সৌন্দর্যবাদী কবি তিনিও সৌন্দর্যকে বিশিষ্ট মূর্তিতে সর্বত্র নিরিক্ষণ করিতে চাহিয়াছেন। এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যকে অতীন্দ্রিয়-লোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যে সৌন্দর্যকে আমরা রূপজগতের মধ্যে দেখি শেলী তাহাকে অরূপ রাজ্যের অশরীরী করিয়া তুলিয়াছেন। শেলী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নির্জনতার মধ্যে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চাহিয়াছেন—

নির্জনেতে রহস্য ভবনে
জনশূন্য আকাশের তলে রবীন্দ্রনাথ

তুঃ And my heart ever gazes on the depth of thy deep mysteries—

× × × ×

He would linger long
In lone some vales, making the wild his home
Alaster / Shelley

তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেলীর পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথ সেই সৌন্দর্যকে একটি রমণী মূর্তির মধ্যে মূর্ত দেখিতে চাহিয়াছেন।

যিনি একদিন কবি-জীবনের নর্ম-সহচরী ও মর্ম-সহচরী ছিলেন, তিনিই কবির মননের ও করণের মধ্যে দিয়া অন্তর্যামীর আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এই অন্তর্যামী সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়া আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি ও পরম-সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতেছেন। কবির অন্তর্যামী ভক্তের হৃষীকেশ নহেন। কবি 'চিত্রা' কাব্যের সূচনাতে বলিয়াছেন— 'ভক্ত যখন বলেন ত্বয়াহৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা শিযুক্তঽস্মি তথা করোমি' তখন হৃষীকেশের থেকে উক্ত ভক্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন, সুতরাং তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একা হৃষীকেশের পরেই। চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম, আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম-নক্ষত্রের মতো, সে আমার ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে-দুঃখে আমার ভালোয়-মন্দয়। এই সংকল্প সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সংগীত বা উদ্ভূত হচ্ছে যন্ত্রের ও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুইয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা। সেইজন্যেই বলা হয়েছে—

> "জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
> করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
> রহস্য ঘেরা অসীম আঁধার
> মহামন্দির তলে।" অন্তর্যামী / চিত্রা।

এই অন্তর্যামী কৌতুকময়ী—

> একী কৌতুক নিত্য নূতন
> ওগো কৌতুকময়ী

আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।"   অন্তর্যামী / চিত্রা।

অন্তর্যামীর শক্তি অপরিসীম। তিনি কবি-জীবনকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইতেছেন ; তিনি কবির অন্তরে ভাষা দিতেছেন প্রকাশ করাইতেছেন—

'অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।"   অন্তর্যামী চিত্রা।

অন্তর্যামীর অনুকম্পায় কবির কাব্য জীবন প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে, অথচ কবি বুঝিতে পারিতেছেন না, ধরিতে পারিতেছেন না সেই শক্তিকে। তাই কবি বিস্মিত।

সে মায়ামুরতি কী কহিছে বাণী
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি —
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এসে সংগীত কোথা হতে উঠে
এযে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে
এযে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ।   অন্তর্যামী, চিত্রা

কবি তাঁহার অন্তর্যামীর কাছে নিবেদন করেন—

তবে তাই হোক। দেবী, অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ,
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে"   ঐ

এই অবস্থা সম্পর্কে আলংকারিক অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের টীকায় বলিয়াছেন— "নিরুপাখ্যানি সন্তি দুর্ঘটনানি বুদ্ধিপূর্ব্বং চিকীর্ষিতমপি

কর্তুমশক্যানি। তথা নিরুপ্যমাণের দুর্ঘটনানি। কথমেবং রচিতানীত্যেবং বিস্ময়বহানি" অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া রচনা করা যাইতেছে না, অথচ আপনা আপনিই কি করিয়া যে তাহা রচিত হইতেছে ইহাই পরম বিস্ময়।

কবির জীবনকে যিনি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতেছেন, কবি তাঁহারই অভিসারে বাহির হইবেন—এই জন্মে এবং জন্মান্তরেও—

যত শত ভুল করেছি এবার
সেই মতো ভুলি ঘটিবে আবার
ওগো মায়াবিনী, কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে।
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে
 দুরাশার পাছে পাছে।
এবারের মতো পুরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান,
সে সুরা তরল অগ্নি সমান
 তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
 তোমারে ফিরিব খুঁজি। ঐ

চিত্রার প্রথম দিকে যিনি অন্তর্যামীরূপে দেখা দিয়াছিলেন, তিনিই আবার শেষের দিকে "জীবন দেবতা"য় রূপান্তরিত হইয়াছেন—

"এখানেও তুমি জীবন দেবতা কহিনু নয়ন জলে।" সিন্ধুপারে / চিত্রা। কবির অন্তর্যামী, কবির ব্যক্তিত্বকে সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি ও পরম সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতেছেন এবং কবি-জীবনকে যিনি পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করাইতেছেন, তিনিই হইতেছেন কবির জীবন দেবতা। কবির "জীবনদেবতা" শীর্ষক কবিতায় অন্তর্যামীর দেবায়ন

বা appotheosis রূপটি প্রতিফলিত হইয়াছে। অন্তর্যামী ও জীবন দেবতার মধ্যে পার্থক্য শুধু এইটুকুই অন্তর্যামী যেন কবির জীবাত্মা অথবা জীবনের শুভ বুদ্ধি এবং জীবনদেবতা যেন পরমাত্মা। অন্তর্যামী ও জীবনদেবতা সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেন—

"অন্তর্যামী যেন পথের সুহৃদ বা প্রিয়া আর
জীবনদেবতা যেন ঘরের স্বামী বা প্রিয়।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস / রবীন্দ্র খণ্ড।

অন্তর্যামীতে যিনি 'প্রভু' হিসাবে দেখা দিয়াছেন তিনি আবার জীবন দেবতাতে স্বয়ংবর রূপে দেখা দিয়াছেন—

"আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কি কিসের আশে।"

তুঃ— "যমেবৈষবৃণুতে লভ্য" উপনিষদ

তথাপি জীবনের পরিপূর্ণতার আদর্শ সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে না পারায়, কবি-হৃদয়ে অনুতাপ-বারি উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে—

"যে সুরে বাঁধিলে বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার
হে কবি তোমার রচিত রাগিনী
আমি কি গাহিতে পারি।
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি

জীবনদেবতা / চিত্রা।

কবির জীবনদেবতা অতীতের মধ্য দিয়া অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে একটি যোগ-সূত্র স্থাপন করিয়া কবির অন্তরে নিত্য অনু-প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এই কবি জীবনদেবতা সম্বন্ধে বলিয়াছে—"আমার পটে একটা ছবি দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই রঙ ও রঙের তুলি ত আমার হাতে ছিল

না।" এই তুলি ও রঙ ছিল জীবনদেবতার হাতে। জীবনদেবতাই কবিকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন—জীবনদেবতা যাহা বলান কবি তাহাই বলেন। কবি আরও বলিয়াছেন—"তিনি যে কেবল আমার ইহ-জীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমি মনে করি না, আমি জানি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন, সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্ব ধারার বৃহৎ স্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে সেইজন্য এই জগতের তরুলতা, পশু-পক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি। সেইজন্য এত বড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।" এই জীবনদেবতা কবির চিরদিনের সঙ্গী—

"হে চির পুরানো চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।"

The Religion of Man গ্রন্থের "The Vision" (পৃ ৯৬) শীর্ষক নিবন্ধে কবি সবিশেষ যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে –

ব্যক্তি জীবনের মধ্য দিয়া জীবনদেবতাকে লাভ করা অথবা সত্য স্বরূপের আত্মোপলব্ধিই হইতেছে সীমার মধ্য দিয়া অসীমের মিলন। ইহাই রবীন্দ্র সাহিত্যের মূলকথা। ইহার মধ্যে কোনো প্রতীক না থাকিলেও ইহার মধ্যে যে গভীর ব্যঞ্জনা আছে তাহাই বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের গভীর ব্যঞ্জনাকে স্মরণ করায়। রূপের মধ্যে অরূপের মিলনের, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের ব্যঞ্জনা থাকিলেও ইহা সত্য যে কবির চিন্তাধারা কোনো দর্শন-সূত্রকে অবলম্বন করিয়া গঠিত নহে। কবি আত্মভাবনাকে এবং আত্মজীবনকে পর্যবেক্ষণ করিয়াই এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। মানুষের অন্তরে দ্বিমুখ বিকাশ প্রবণতা আছে। মানুষ চায় এবং পাইতে প্রযত্ন করে। চাওয়া-পাওয়ার

মিল ঘটে না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তবুও দুটার মধ্যে সঙ্গতি অসম্ভব নহে, এবং সেই সঙ্গতিতেই জীবনের সার্থকতা। অন্তর্যামী ও জীবনদেবতা ভিন্ন নহে; এক এবং অভিন্ন। ইহা দ্বৈত এবং অদ্বৈত। বৈষ্ণব-দর্শনের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের সঙ্গে একটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অন্তর্যামী জীবনদেবতার অদ্বৈতরূপ চিন্তা কবিতায় পরিস্ফুট। এডওয়ার্ড টমসন বলেন যে তাঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল এবং সেই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"The idea, the poet told me has a double strand. There is the Vaishnava dualism—always keeping the Separateness of the self and there is the 'Upanisadic moneism. God is wooing each individual, and god is also the ground of reality of all as in the Vedantic Unification. When Jivandevata came to me. I felt an overwhelming joy it seemed a discovery; new with me in the deepest Self Seeking expression. I wished to sink it to give myself up wholly to it,

Today (1922) I am on the same place with my readers I am trying to find what—the Jivandevata was"

Prof. E. Thomson—Rabindra Tagore,
Poet and Dramatist
Oxford University Press, 2nd Edition
1948, Page 104

সুতরাং কবির মত হইতেছে জীবনদেবতা, বৈষ্ণবের দ্বৈত ও উপনিষদের অদ্বৈতের সমন্বয়ে গঠিত। ১৮৬৩ সনে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মারাঠা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনদেবতা সম্বন্ধে বলেন—

'Rabindra Nath's Jivandevata Concieved as Goddess like woman who is still human, who seems to be personal

and intimate and at the same time she is transcendent has become like a new form of the Indian Ushas and Sri and Uma and of the Great Aphradite and Artemis and Eternal Feminine of Goethe."

কবির দ্বৈতাদ্বৈতের লীলাতে দেখি—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় রূপের মাঝারে ছাড়া
অসীম চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

কবি তাঁহার "আত্মপরিচয়" শীর্ষক নিবন্ধে বলিয়াছেন—আমার সমস্ত বাধা বিপত্তিকে ও আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।"

কবি-আত্মার সহিত জীবনদেবতার লীলা আগেই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে ; ঈশ্বর চিন্তার শুরু হয় 'খেয়া' কাব্য হইতে। এবং 'নৈবেদ্য' হইতে ভক্তিবাদ কবির রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-গীতালিতে যে ঈশ্বর ভক্তির কথা পাই, সোনার-তরী, চিত্রা যুগে তাহা ছিল না। ভক্ত যেমন ভগবানের, ভগবানও তেমনি ভক্তের এই ভাবধারাটি কবির জীবনদেবতার মধ্যেও দেখিতে পাই—

"বেদনাদূতী গাহিছে গান 'ওরে প্রাণ'
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।" গীতাঞ্জলি / ১৭

এখানে দেখা যায় কবির ভাবনার পিছনে অশরীরী রাধা মূর্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্যে যে বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে— তাহা রাধা-কৃষ্ণের শুধু নয়, জগতের সমস্ত নর-নারীর। পদাবলী সাহিত্যের ঐ বেদনা রবীন্দ্রনাথেও ধ্বনিত হইয়াছে। পদাবলী নাট্যের রঙ্গমঞ্চ—বৃন্দাবন আর রবীন্দ্রনাথের প্রেমনাট্য রঙ্গমঞ্চ হইতেছে হৃদি-বৃন্দাবন। পদাবলী-সাহিত্যে মানবিকতার উপর দৈবী-চেতনা আরোপ করিয়া ধর্মীয়-সাহিত্য পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। অন্তরাত্মার আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজনী শক্তির কর্তৃত্বকেই কবি জীবনদেবতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনী শক্তির কথা লিখিয়াছি তাহাকে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম। "ওহে অন্তরম।" আত্মপরিচয় প্রবন্ধ।

এই জীবনদেবতাকে কবি বিভিন্নভাবে দেখিয়াছেন। সুতরাং পদাবলীর লীলাবাদের স্পর্শ থাকিলেও তাহা কবির একান্তভাবেই নিজস্ব অনুভূতির ফল। 'উৎসর্গ' কাব্যে কবি জীবনদেবতাকে বিচিত্ররূপে অনুভব করিয়াছেন। কবি কখনো কখনো তাঁহার জীবনদেবতার সভার বাঁশি বাজাইবার ভার পাইয়াছেন, আবার কখনো প্রণয়ীরূপে তিনি কবির বাতায়নতলে আসিয়া কবিকে গান শুনাইয়া গিয়াছেন, আবার কখনো জীবনদেবতা কবিকে বজ্র-ভীষণ-রূপে দেখা দিয়াছেন। আবার কখনো এই জীবনদেবতা কবির সম্মুখে বিদেশী সাপুড়ের বেশে দেখা দিয়াছেন—

'কেগো তুমি বিদেশী
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার
বাজানো সুর কি দেশী।" গীতিমাল্য / ১০

অথবা

তুমি যখন গান গাহিতে বল
গর্ব আমার ভরে ওঠে বুক ;

দুই আঁখি মোর করে ছলছল
নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখ। গীতাঞ্জলি / ৭৮

আবার পূরবীতে আসিয়া এই জীবনদেবতা লীলাসঙ্গিনী হইয়া দেখা দিয়াছেন—

দুয়ার বাহিরে যেমনে চাহিবে
মনে হল যেন চিনি
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা
দিলে লীলা সঙ্গিনী। পূরবী / লীলাসঙ্গিনী।

'পরিশেষে' গ্রন্থে 'তুমি' শীর্ষক কবিতায়েও কবি জীবনদেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'বিপ্লব' ও 'শেষ অভিসার' কবিতায় আবার লীলাসঙ্গিনীকে কবি স্মরণ করিয়াছেন—

"এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে,
মিল ঘটায়ে দাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।"

বহু সুধী সমালোচক 'জীবনদেবতা' সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন এবং এখনো সেই আলোচনার অবসান ঘটে নাই 'জীবনদেবতা' সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হইতেছে— জীবন-দেবতার সত্তা মেটাফিজিক্যাল সত্তা বা আধ্যাত্মিক সত্তা। এই সত্তাই কবি-দার্শনিক মানুষ রবীন্দ্রনাথকে পরিচালিত করিয়াছেন। জীবনদেবতা বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়া কবিকে লীলাসহচর বা লীলাসহচরী হিসাবে আহ্বান করিয়াছেন। এইখানেই আমরা পাই একটি দ্বৈত সত্তার কথা। এই দ্বৈত সত্তার লীলা কোনো ধর্মীয়-চেতনা হইতে উদ্বুদ্ধ হয় নাই এবং কোনো তত্ত্বকথারও কথা বলে নাই। এই লীলাবাদ কবির নিজস্ব, কবির আত্মচিন্তার ফল। তবে কবির এই লীলাবাদ উপনিষদ ও বৈষ্ণব-সাহিত্য-দর্শনের দ্বারা যে রসসিক্ত হইয়াছে তাহা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলেনা।

॥ সীমা ও অসীমতত্ত্ব ॥

কবি তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে বলিয়াছেন— "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটি মাত্র পালা, সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে— সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা।"

সাধক রবীন্দ্রনাথ, ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মবাদী হইলেও কবি রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। কবির নিকট স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েই সত্য, উভয়েই সমতুল্য, কারণ, স্রষ্টা যিনি, তিনি তাঁহার সৃষ্টির বাহিরে নাই সৃষ্টির মধ্যেই আছেন। এ সম্বন্ধে তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকাতে বলেন—

We discorn two opposite currents in India's divine love (Brahma Vidya) the abstract God and personal God, monism and duality. There cannot be worship unless we admit duality, and yet there cannot be devotion unless we fix our gaze on one. The two are aspects of the one God-head"

"মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন— The God Shiva in whose nature "Parvati, the eternal woman, is ever commingled in an a aesthetic purity of love. The unified baing of Shiva and Parvati is the perfect Symbol of the eternal in the wedded love of man and woman.

এও সেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। হর-পার্ব্বতী, রাধা-কৃষ্ণ, সীমা-অসীম — শুধু নামের রকমফের মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের সীমা ও অসীমতত্ত্বের মধ্যে একদিকে যেমন রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের প্রভাব আছে, অপর দিকে ঈশোপনিষদেরও প্রভাব আছে। ঈশোপনিষদে সীমা ও অসীমের উল্লেখ আছে— বৃহদারণ্যক (৪।৪।১।১৫)।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো স উ বিদ্যায়ং রতাঃ" অর্থাৎ যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়া অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে ; আর যে অন্তকে বাদ দিয়া অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে। এবং যিনি— "বিদ্যাঞ্চ বিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং স হ অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" ঈশ ১১ অর্থাৎ সেই অনন্তের মধ্যে দিয়া মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে পায় অমৃতকে।

সমস্ত সৃষ্টিই হইতেছে অসীম স্রষ্টার ; তাই আমরা উপনিষদে পাই— "আনন্দরূপমৃতং যদ্বিভাতি" যাহা কিছু দেখি তাহাই সেই আনন্দময় পরম ব্রহ্মের রূপ। এবং এই আনন্দই হইতেছে—

"আনন্দ হোব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"
তৈত্তিরীয়। ৩ / ৬

আনন্দ হইতে সমস্ত জীবের উদ্ভব, আনন্দ দ্বারাই জীবলোক জীবন ধারণ করে এবং আনন্দলোকেই পরিণামে জীব অনুপ্রবিষ্ট হয়। কাজেই আনন্দ যেখানে, জীবন সেখানে ; সৃষ্টিও সেখানে।

রাধা সৃষ্টিরই প্রতিরূপ। স্রষ্টার লীলাময় প্রকাশ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে ; তেমনি কৃষ্ণের লীলা প্রকাশ রাধার মধ্যে। উপনিষদে বলা হইয়াছে - তিনি— "একোঽহং বহুস্যাং," আমি এক, আমি আবার বহু। সেই পরম 'এক' বহুর মধ্যদিয়াই আপন সৃষ্টির মাধুর্য উপলব্ধি করিতেছেন। উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে— এই যা কিছু আছে, সবই ব্রহ্ম, আত্মাও ব্রহ্ম এবং এই আত্মা চতুষ্পাৎ —"সবংহি এতদ্ব্রহ্ময়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ মাণ্ডুক্য /২

কবিও সেই কথাই বলিয়াছেন—

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম
আমি এলেম, এল তোমার আগুন ভরা আনন্দ
আমি এলেম, তাইতো তুমি এলে।
আমার মুখ চেয়ে
আমার পরশ পেলে
আপন পরশ পেলে।" (বলাকা / রবীন্দ্রনাথ)।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, রবীন্দ্র-দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

It is the self-sundering of the eternal which calls into existence the universe of man and things. But this must have "duality for its relation." The Philosophy of Rabindra Nath Tagore: Dr. S. Radha-Krishnan.

সীমা ও অসীম হইতেছে সৃষ্টি ও স্রষ্টা। এ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

"সীমার মাঝে, অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাইত এত মধুর॥" (গীতাঞ্জলি)

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা। (ঐ)

অথবা

"তাইত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে।" (রবীন্দ্রনাথ।)

রাধা কৃষ্ণের জন্য এবং কৃষ্ণ রাধার জন্য এমনিভাবে ঘুরিয়াছেন এবং

"মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হৈও তুমি।" (চণ্ডীদাস।)

ইহার মধ্যে দিয়াই হইয়াছে সীমা ও অসীমের মিলন।

কবির সীমা ও অসীমের মিলনের প্রকাশ ঘটিয়াছে দুই ভাবে— একটি অহং সত্ত্বার মধ্য দিয়া, অপরটি হইতেছে বিশ্বসত্ত্বার সঙ্গে অহং সত্ত্বাকে একীভূত করিয়া বিশ্বের রূপ দর্শনের মধ্যে। একেই বলা যাইতে পারে— "আমি ও তুমি।"

—ঃ আমি ও তুমি ঃ—

'আমি ও তুমি'র সৃষ্টি হইয়াছে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মূল ভিত্তিতে। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ উপনিষদেও আছে, বৈষ্ণব-পদাবলীতেও আছে -

''সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত।
স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিং চ। স তৎসৃষ্টা॥
তৈত্তরীয় উপনিষদ ২/৬

শূন্যবাদ ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বৈষ্ণবেরা বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলেন—এই যে বাস্তব জগৎ—ইহা একেবারে অর্থহীন নহে, মিথ্যা নহে, মায়াশ্রিত নহে। সৃষ্টিকর্তা 'মায়াবী' নহেন। তাঁহার সৃষ্টি তাঁহার বিলাস বিভূতি—'তদ্বিভূতিভূতং জগদপি পরমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে।''

প্রাক-বৈষ্ণব যুগে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক ছিল অন্যরূপ। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। সেখানে ছিল সম্ভ্রম, ভয়। মানুষ ভগবানকে আপনার জন আত্মার আত্মীয় বলিয়া কল্পনা করিতে সাহসী হন নাই। এই প্রীতির সম্পর্ক বিশেষভাবে বৈষ্ণবেরা ঘোষণা করেন। তাঁহাদের মতে ভগবান্ 'শ্রেয়' আবার তিনি 'প্রেয়'। উপনিষদে এই মতবাদ আছে - 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ, সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।' বৃহদারণ্যকোপনিষদ। ১/৪ ৮ এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর, কারণ এই যে আত্মা, ইনি অন্তরাত্মা। সুতরাং ভগবানকে প্রিয়ভাবেই উপাসনা করা কর্তব্য।

বৈষ্ণব-দৃষ্টিতে ভগবান্ প্রেমময়, এবং প্রেম মহামূল্যবান্। ভবভূতি এই প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, প্রেম মানব-সম্প্রদায়ের এমনি একটি অনুভূতির বস্তু, যাহাকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে জীবনের ক্ষোভ ও অপূর্ণতাকে জয় করিতে পারা যায়—''অদ্বৈতং সুখ-দুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু য দবিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।''

উত্তররামচরিত / ১ম অঙ্ক।

রূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যাপি ধ্বংসকারণে
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ"

এই প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"ভালবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক।"
সমাজ / প্রাশ্চাত্য প্রভীচ্য

রাধা প্রেম-পাগলিনী। প্রিয়তম কৃষ্ণের নাম জপ করিতে—"অনুখন মাধব সোঙরিতে সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই।" দ্বৈত অদ্বৈত হইয়া পড়িলেন অথবা আমি ও তুমি এক হইয়া গেলেন। প্রেমের এমনই মহিমা যে যাহাকে ভালবাসেন তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পান না—

"দোষা অপি প্রিয়তমস্য গুণা যতঃ স্যুঃ
তদ্দত্ত-কষ্ট শতমপ্যমৃতায়তে যৎ
তদ্দুঃখলেশকণিকাপি যতো ন সহ্যা
তাত্ত্বাত্মদেহমপি যৎ ন বিহাতুমীষ্টে
যোহসত্যমপ্যপুপমঃ মাহি-মান্ সুচ্চৈঃ
প্রত্যায় যত্যনুপদং সহসা প্রিয়স্য
প্রেমা স এব।" প্রেম-সম্পুট / বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

তাই রাধা কৃষ্ণের দোষ-ত্রুটির কোনো বিচার করেন নাই, পক্ষান্তরে বলিয়াছেন—

"বধূ তোমার গরবে গরবিণী হাম
রূপসী তোমার রূপে।" (জ্ঞানদাস)

রবীন্দ্রনাথ ভালবাসা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন—"ভালবাসা অর্থে নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা।" অচলিত সংগ্রহ / মনের বাগান বাড়ী।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হইয়াছে—

"যথা প্রিয়য়া স্ত্রীয়া সম্পরিষ্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন্ বেদ নান্তরমেবমেবায়াং
পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মা সম্পরিষ্বক্তো
ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং
তত্ত্বা অস্যোতদাপ্তকামমাত্মাকামম কামং
রূপং শোকান্তরম্।" ৪ / ৩ / ২১

অর্থাৎ প্রিয় স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের যেমন বাহ্য বা আন্তর কোনো ভেদজ্ঞান থাকে না, তেমনি প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত পরমাত্মারও বাহ্য বা আন্তর কোনো ভেদজ্ঞান থাকে না। এই অবস্থায় কামনার যেমন চরম প্রাপ্তি, তেমনি আবার সর্বকামনার পরিসমাপ্তি। রায় রামানন্দও তাহাই বলিয়াছেন—

"না সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি।"

রসময় পরম পুরুষই হইতেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি-কর্তার সৃষ্টিও মনোরম। রহস্যময়ের সৃষ্টিও রহস্যময়। রসময় অখণ্ড, সৃষ্টি যেন খণ্ড ও অখণ্ড বা অসীম ও সসীম—এই দুইয়ের চলিয়াছে লীলা। খণ্ড কি সত্যই খণ্ড বা অংশ বিশেষ ? এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে চাই সূক্ষ্মদৃষ্টি, প্রজ্ঞাদৃষ্টি। সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে দেখিব যে খণ্ডের মধ্যেও অখণ্ড আছে। যেমন বীজকে মনে হইবে খণ্ড, কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে একটি অখণ্ডত্ব বা সমগ্রতা আছে। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পল্লব, শাখা-প্রশাখা, তাহা হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল এবং ফল হইতে আবার বীজ ; বৃক্ষজীবনের অখণ্ডত্ব রহিয়াছে ঐ বীজে। মানব জীবন সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই প্রযোজ্য। এই চরম সত্যটি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশঃ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব। আমার সুখ, দুঃখ, অন্তর বাহির, বিশ্বাস, আচরণ,

সমস্ত মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজন রহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে, প্রত্যেক কথাটি বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না, কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি, বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরী হয়ে উঠবে, আমার ভিতর তেমনি অনাদি-কাল ধরে একটা সৃজন চলছে × × × নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অন্তরে দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলি একটা বৃহৎ আনন্দ-সূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই আমি আছি, এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু পরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়ের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—এই জন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বত্ব-বোধের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে একটি পূর্ণের আদর্শ। বিশ্বজীবনের সমগ্রতার মধ্য দিয়া যে দেবতা নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন তিনিই বিশ্বদেবতা। এই বিশ্বদেবতাই হইতেছেন কবির "তুমি"। এই বিশ্বদেবতা আবার বিশেষ ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছেন—"আমি" হিসাবে। The Religion of Man গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন—

"To this Being I was responsible ; for creation in me is his as well as mine. It may be that it was the same Creative Mind that is shaping the Universe to its eternal idea ; but in me as a person it had one of its special centres of a personal relationship growing into deepening consciousness. I had my sorrows that left their memory

in a long burning track across my days, but I felt at that moment that in them I lent. my self to a travail of creation that ever exceeded my own personel bounds like stars which in their individual firebursts are lighting the history of the Universe. It give me a great Joy to feel in my life detachment at the idea of a mystery of a meeting of the two in a creative comradeship. I felt that I have found my religion at last, the religion of Man, in which the infinite became definded in humanity and come close to me so as to need my love and co-operation.

The vision pg. 96

রাধা যেমন একাত্মা-বোধ করিয়াছেন, ঠিক তেমনি কবি 'তুমি' কে অন্তরের মধ্যে বসাইয়া এক করিয়াছেন—

"তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
ক্ষ্যাপার মত আজি চিরদিন
উদাসীন আনমনা। পুরস্কার / সোনারতরী।

এই সৃষ্টি-তত্ত্বে "তুমি ও আমি"র ভূমিকাটি কি ? তুমি হইতেছেন "যন্ত্রী" এবং 'আমি'— যন্ত্র। কবির জীবন-বীণার সপ্ততন্ত্রীর মধ্যে ঝংকার তুলিতেছেন, কবির সেই অন্তর্যামী পুরুষ— তুমি—

'আমি কিগো বীণা যন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনা ভরে গীত-ঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে ?" অন্তর্যামী / চিত্রা।

অথবা, কবির অন্তর যেন একটি মাটির প্রদীপ, অন্তর্যামী আলো জ্বালিতেছেন আরতির জন্য—

"জেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবার পূজা কোন দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দির তলে ? অন্তর্যামী / চিত্রা।

যিনি একদা কবির মানসী ছিলেন, তিনি দেখা দেন অন্তর্যামীরূপে, আবার জীবন দেবতা রূপে দেখা দিয়া বিশ্বদেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন—

"ছাড়ি কৌতুক নিত্যনূতন
জীবনের শেষে কী নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে আয়ি।
চিরদিবসের মর্মের ব্যথা
শতজনমের চির সফলতা
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা
আমার বিশ্বরূপী।" ঐ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধারণা যে জীবের মধ্যে রহিয়াছে একটি "তটস্থ-ভাব", এবং এই ভাবটি সীমা অসীমের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া খুঁজিতেছে একটি "মিশ্রণ" এই জন্যই মানুষ হইতেছে— finite-infinite being. এই তটস্থ লক্ষণের জন্যই জীবের ভিতরে আছে অসীম প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমের অনাদি অনন্ত আকুতি। কবির ব্যক্তিগত 'আমি' উর্ধ্বলোকের "আমিত্বে" দাঁড়াইয়া সর্বদা সেই 'তুমি' রূপী বিশ্বদেবতার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে— অনাদিকাল হইতে। তাই কবি বলিয়াছেন—

"জানি জানি কোন আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয়, কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।" গীতাঞ্জলি / ২১

তাই সেই 'আমি'র প্রভাবে কবির 'আমি' জাগিয়া উঠে, অব্যক্ত তখন হয় ব্যক্ত অসাড়ের বুকে জাগে চঞ্চলতা—

"তুমি মোরে চাও যবে অব্যক্তের অখ্যাত আশ্বাসে আলো উঠে জ্বলে
অসাড়ের সাড়া জাগে নিশ্চল তুষার গলে আসে নৃত্য কল-রোলে।"

কবি 'খেলা' কবিতায় বলিয়াছেন—

'সন্ধ্যাবেলায় এ কোন খেলায়
করলে নিমন্ত্রণ
ওগো খেলার সাথী।
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূণ্য এ প্রাঙ্গণ
রঙীন শিখার বাতি। পূরবী।

কবির এই 'তুমি' চিরদিনই কবিকে ডাকিয়াছেন, চিরদিনই ঘরের বাহির করিয়াছেন, দিশাহারা ক্ষ্যাপার মতই যাত্রা করাইয়াছেন,—কবি সেই "তুমি"কে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"আমার কাছে কি চাও তুমি ওগো খেলার গুরু
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হলো দিনের শুরু
তেমনি হবে সারা।" পূরবী / খেলা।

খেলার জন্যে ডাকা, নিমন্ত্রণ করাই হইতেছে অভিসার যাত্রা। এই অভিসার শুধু যে পূর্ণিমা রাতে বা শারদ প্রাতে, তাহা নয়—ঝড়ের রাতেও—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।" ২০ / গীতাঞ্জলি।

যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে এই লীলা—

"আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে" ৩৪ / গীতাঞ্জলি।

অথবা

পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই। ৩ / গীতাঞ্জলি।

নিজের মুখ দেখিতে হইলে যেমন প্রয়োজন হয় আয়নার, তেমনি লীলাময়ের সৃষ্টি রূপ মাধুর্য আস্বাদনে দরকার হয় কবির—

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাইতো আমি এসেছি এই ভবে।" ১৩০ / গীতাঞ্জলি।

× × ×

"তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরে
এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে
রইব বাঁধা তোমার বাহুর ডোরে
বাঁধন আমার সেইটুকু থাক বাকি
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।" গীতাঞ্জলি

কবির 'রাজা' নাটকে এই দৃষ্টি-ভঙ্গীটি আছে। সেখানেও আমরা শুধু "আমরা" নই, সেখানেও আমরা রাজারই দ্বিতীয়। নিজের খণ্ডরূপকে দেখিতে পাই নিজেদের আয়নার মধ্যে কিন্তু অখণ্ডরূপ দেখিতে হইলে সেই আয়নায় হইবে না—

রাজা—"নিজের আয়নায় দেখা যায় না, ছোট হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও ত দেখবে সে কত বড়। আমার হৃদয় তুমি যে আমার দ্বিতীয় তুমি কি সেখানে তুমি।"

রাণীর এই রূপলাবণ্য ইহা রাণীর নিশ্চয় কিছুই নয়, ইহাও রাজারই প্রতিচ্ছবি। রাণীর ভিতর দিয়া রাজা নিজ-রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

সুদর্শনা—তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা—তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা—যদি থাকেত সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে,

সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ
আপনি দেখতে পাও সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।"

রাণী যে শুধু রাজার প্রেমে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, রাজাও রাণীর প্রেমের জন্য আকুল এবং রাণীর মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধির জন্য রাজা আগেই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

সুদর্শনা—তাঁর পণটাই রইল— পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটিত তাকে বলব যে আমিই এসেছি. তোমার আসার অপেক্ষা করিনি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি কঠিন পথ ভাঙ্তে ভাঙ্তে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা— কিন্তু সে গর্ব তোমার টিকবে না, সে যে তোমারও আগে এসেছিল. নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।"

'রাজা' নাটকেও দেখিতে পাই সেই 'আমি ও তুমি'কে কবির কাব্যের আমি ও তুমির মত দ্বৈত অদ্বৈত একাকার হইয়া গিয়াছে। সেই রসময় তুমি তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টির সৌন্দর্যরস পান করিতেছেন কবির রসনা দিয়া। অসীমে সঙ্গীত অনাহত, এবং অসীমের সঙ্গীত সেই রসময় অসীম পুরুষ শ্রবণ করিতেছেন সসীম কবির বীণাতে, সুরেতে। কবি বলিয়াছেন—

"অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলি 'আমি'

কবির অহং তাঁহার খণ্ডিত মানব-সত্ত্বায় অখণ্ড অসীমের অহংকার, সুতরাং কবির 'অহং' দৃষ্টি 'অসীম অহং' এরই দৃষ্টি—

"চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

× × × ×

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর
সুন্দর হল সে
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্ব কথা,

এ কবির বাণী নয়
আমি বলব, এ সত্য
তাই এ কাব্য

কবির এই সত্য বৈজ্ঞানিকের সত্য নয়, দ্রষ্টার সত্য, কবির কাব্যিক সত্য এবং ইহা কবির একান্ত নিজস্ব। তাঁহার এই সত্য কোনো তত্ত্ব-কথার আওতায় পড়েনা— "একে বলোনা তত্ত্ব।" ইহাই প্রজ্ঞাদৃষ্টি, কবি-মানসের "ভাব-প্রজ্ঞা"।

—০—

বিশ্বরূপ

"সর্ব্ব খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি" বিশ্বে যে কিছু বিরাজমান সবই সেই ব্রহ্ম। উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে— "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিংচ জগত্যাং জগৎ" ঈষা ১। এই জগতের যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, সমস্তই সেই ঈশ্বররূপে আবাস দিয়া আচ্ছাদিত। ইহাকেই বলা হয়— "সর্ব্বেশ্বরবাদ।" বেদে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে একটি বিবর্তনের মধ্য দিয়া। বৈদিক যুগে প্রথম সব দেবতারই সমান সমাদর ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ঐ যুগের মুনি-ঋষিরা সকল দেবতাকে সমচক্ষে দেখা হইতে বিরত থাকেন। এবং কোনো একটি বিশেষ দেবতার উপর শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করেন এবং তাঁহারই উপরেই বিশেষ কর্তব্যগুলি আরোপ হইতে থাকে, এই ভাবেই তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান করিয়া তোলা হয়। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তবুও তাঁহার বাস এই মর্ত্যে নহে, স্বর্গরাজ্যে— ইহাই ছিল সেই যুগের ধারণা বা কল্পনা। এ যেন রাজা ও প্রজা। রাজা থাকেন রাজ প্রাসাদে এবং প্রজারা থাকেন পর্ণ কুটিরে, ঈশ্বর মর্তলোকে বিরাজ করেন না, কারণ মর্তলোকে রহিয়াছে— পাপ, তাপ, বেদনাবারি। তিনি এই সমস্তের উর্দ্ধে। কালক্রমে এই চিন্তাধারার পরিবর্তন হইতে শুরু করে। এবং ইহা পরিকল্পিত হইল যে স্রষ্টা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। তাঁহার অবস্থান— জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে— "যো দেবাং গ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ"

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২ / ১৭

অর্থাৎ— যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি সকল ভুবনে প্রবেশ করিয়াছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার করি। বৈদিক যুগের শেষের দিকে এই মতবাদের সূত্রপাত হয় এবং ঔপনিষদিক যুগে তাহাই দানা বাঁধিয়া উঠে।

উপনিষদের ধ্যান-ধারণা রবীন্দ্রনাথে দেখিতে পাই। সর্ব্বেশ্বরবাদ রবীন্দ্রদর্শনের ভিত্তি। কবি ইহাই উপলব্ধি করিয়াছেন— ভগবান সর্বভূতে;

তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজমান ; তিনি লীলাময় ; প্রকৃতির মধ্যেই তাঁহার লীলা প্রকাশিত। তাই দেখি প্রকৃতির সৌন্দর্য, রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনুপমভাবে রূপায়িত হইয়াছে।

কবি, ভগবান ও ভালবাসার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন— "আমরা যাহাকে ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য-নাম ভালোবাসা প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের সম্পর্কের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণব-ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছে।" মনুষ্য / পঞ্চভূত।

ঈশ্বরকে 'সর্বভূতের" মধ্যে অনুভূতি করা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছে— উপনিষদ তথা বেদ হইতে। রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন— 'When I look back upon these day, it seems to me that unconsciously I followed the path of my Vedic ancestors and was inspired by the tropical sky with its suggestion of an uttermost beyond. The wonder of the gathering clouds hanging heavy with the unshed rain, of the sudden sweep of storms causing Vehement gestures along the line of coconut trees, the fierce loneliness of the blazing summer noon, the silent sunrise behind the dewy veil of autumn morning, kept my mind with the intimacy of a pervassive companionship. The Religion of Man / pg 92

এই কথাই আবার অন্যত্র বলিয়াছেন— "আমি যখন সেই দিনগুলির পানে ফিরে দেখি আমার মনে হয় অজ্ঞাতে আমি আমার বৈদিক পূর্ব-পুরুষের দর্শিত পথ অনুসরণ করেছি এবং গ্রীষ্মের আকাশের অতি দূরের সত্তার ইঙ্গিত আমাকে প্রেরণা দিয়েছে"—

এই ভাবটিকে কবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাব্যে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

ভগবান — 'এক' আবার তিনি 'বহু' একোহহং ঃ বহুস্যাং। অথবা

"রূপং রূপং প্রতিরূপং সো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) ২/৫/১৯

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যে ঐ ভাবের প্রতিফলন দেখি —

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে
দ্যুলোক ভূলোক বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী" চিত্রা / চিত্রা

বাহিরে তিনি নিত্য লীলাময়ী প্রকৃতি, তিনি আবার অন্তরে প্রাণের মানুষ। অর্থাৎ অন্তরে যাঁহাকে দেখিতেছেন, বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেও কবি তাঁহাকেই অবলোকন করিতেছেন —

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তাঁয় সকলখানে।
আছে যে নয়ন তারায় আলোক ধারায়
তাই না হারায়
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।" অরূপরতন / বাউলের গান।

কবির এই গানের সঙ্গে তুলনীয় —

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি
যাহা যাহা নেত্র স্ফুরে তাহা ইষ্ট মূর্তি"
চৈতন্যচরিতামৃত / কৃষ্ণদাস।

তুঃ "জং জং পলোএমি দিসং পুরও লিহুথ বব দীসুসে
তত্তো তুহ পতিমা পডিবাডিং বহই বব সঅনং
দিসাঅকং।" হাল / গাথাসপ্তশতী।

তুঃ "আমি যেমনি করিয়া চাই
আমি যেমনি করিয়া গাই
বেদনাবিহীন ওই হাসি মুখ
সমানে দেখিতে পাই॥" মানসী

অরুপরতন নাটকের ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন— "যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রাগে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়— এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।" যিনি নিজেকে এমনভাবে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে "দূর" নিকট হয় 'পর' "আপন" হয়—

"তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর ;
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।" গীতাঞ্জলি / ৩

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি উপনিষদের রসে নিষিক্ত— "স এবাধস্তাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ" ছান্দোগ্য / ৭ / ২৫ / ১

তিনি সর্বত্র বিরাজিত × × এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই যে .... ধর্ম / পৃঃ ৪৪ / রবীন্দ্ররচনাবলী / ১৩

'গুরু' নাটিকায় এই কথাটি তিনি দাদাঠাকুরের মুখে স্পষ্ট করিয়া দিয়া বলিয়াছেন—"যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন, তাকে একটা জায়গায় ধরতে গেলে তাকে হারাতে হয়।" গুরু / পৃঃ ১৫১ / র, র-১৩

সেই পরম-সত্ত্বাকে কবি বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "বলাকা" কাব্যে কবি তাঁহাকে "চঞ্চলা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

"হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
চলে নিরবধি।"

তিনি একাধারে চঞ্চল ও অচঞ্চল। যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তিনি চঞ্চল কেন? কারণ তিনি শুধু সৃষ্টি বা স্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি প্রলয়ের মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যেও বিরাজমান। যিনি "শিব" তিনিই আবার ভয়ঙ্কর, রুদ্র। তাই তিনি ভাঙেন আবার নিজের হাতে গড়েন—

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,
সৃষ্টি তাহার খেলা
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনের সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার
তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা"। — বোধন / মহুয়া।

এমনি তাঁহার খেলা। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে গাছের জীর্ণ-পাতাগুলি ঝড়াইয়া ফেলেন— নব পুষ্প মঞ্জরীতে ভূষিত করার জন্য। তিনি মাঘের বুকে সকৌতুকে লুকোচুরি খেলেন। তাই তিনি মায়াবী—

"নিত্য কালের মায়াবী আসিছে নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু আনিবে সে ধরণীতে
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয়মনে দূরে দেয় পাড়ি
নববর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে ফিরে জয় করে নিতে।"

মহুয়া বোধন

যুগের পর যুগ ঋতুচক্রের যে আবর্তন চলিয়াছে তাহাও এই নটরাজের নৃত্যছন্দ-গতির মধ্য দিয়াই হইতেছে—

"সেই আনন্দ-চরণ-পাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধেরে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।" গীতাঞ্জলি / ৩৬

নটরাজের এই নৃত্যের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, আনন্দ সমস্তই আছে। মৃত্যুর মধ্যেও তিনি অমৃত-মাধুরী মিশাইয়া দিয়াছেন ; তাই কবি মৃত্যু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কেবা জানে।" উৎসর্গ / ৩৮

অথবা

"সে যে মৃত্যুপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।" নৈবেদ্য।

নৃত্যে একটি পদক্ষেপের পর আর একটি পদক্ষেপ, পদক্ষেপের মধ্যে আছে নৃত্যের গতি, ছন্দ, সমগ্রতা। তাই জীবন মৃত্যুর মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই। মৃত্যু ভীতি অহেতুক, কারণ এ খেলা তাঁহারই খেলা—

"এ জন্ম-মরণ খেলায়
মোরা মিলি তারি মেলায়
এই দুঃখ সুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী।" অচলায়তন

কবি 'বর্ষশেষ' প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই দুইটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় একেবারেই এক হয়ে আছে। × × সে এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎ সংসার।" র. র. / ১৪ খণ্ড।

জীবন ও মৃত্যু যেন এ পিঠ ; ও পিঠ ; এর শেষ নাই, অশেষ ; শুধু চোখের অন্তরাল হইয়া যায় মাত্র—

"ফুরায় যা, তা ফুরায় শুধু চোখে—
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে। ৩৮ / গীতাঞ্জলি।

অথবা

"এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা
চির দিনরাত আপনার সাথ ;
আপনি খেলিছ পাশা।

× × ×

এই মতো চলি চিরকাল গো
শুধু যাওয়া আসা। উৎসর্গ / ৩৮

কবির মত হইতেছে—"দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন।" ভারতবর্ষ / র. র. ৪র্থ খণ্ড।

এই কথা তিনি গীতাঞ্জলিতে বলিয়াছেন—

"হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে

আসনটি তার সাজিয়ে দে ভাই ;
মনের মতো করে।
দিন রজনী আছেন তিনি
আমাদের এই ঘরে,
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে উঠে
নয়ন মেলে চাই,
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে
দেখতে মোরা পাই" গীতাঞ্জলি / ৪৯

তুঃ-- "আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখতে হবে......." ভক্ত / শান্তিনিকেতন / র. র. / ১৪ দশ খণ্ড

ভগবানের এই যে ব্যাপকতা ইহার মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে। ঈশ্বর, অসীম অনন্ত, তাঁহাকে আবার নির্গুণও বলা হইয়াছে। কবির এই সর্বেশ্বর-বাদকে গ্রহণ করা কি সম্ভবপর ? হিন্দুরা অসীম অনন্তকে শান্ত করিয়া আনিয়া প্রতীকের মাধ্যমে নিবেদন জানান সেই অনন্তকে। মানুষ রূপের পূজারী, কায়ার পূজারী, ছায়াকে অবলম্বন করিয়া কি কোনো ভাব মানুষের অন্তরে জাগে ? কবি নিজ সর্বেশ্বরবাদের কথা বলিয়া নিজেই আবার সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়াছেন। একদিকে মনন শক্তির দ্বারা তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বত্র স্বীকার করিয়া নিয়াছেন, অপর দিকে তিনিই আবার তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে যে কবি সেই সর্বেশ্বরকে প্রিয়ভাবে, কান্তভাবে, নাথভাবে, প্রভুভাবে পাইবার আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন বৈষ্ণবেরা শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য মধুর রসের মধ্য দিয়া সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তব জগতের নরনারীর ভালবাসার জন্য পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন, অধ্যাত্মজগতেও ঠিক অনুরূপ প্রয়োজন। এই খানেই দেখি একটি দ্বৈতভাবের প্রকাশ। সর্বেশ্বর 'এক' তিনি অদ্বৈত, তিনি বিশ্বব্যাপী বিশ্বসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা। বিশ্বসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার

লীলাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদ। কবি তাঁহার 'স্মরণ' কাব্য গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"যে-ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ
দুয়ের মিলন ঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা।"

তুঃ

"যদ্যপি রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা অভিন্ন
তথাপি লীলার লাগি যুগপচ্ছিন্ন"

অথবা

কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে
অতএব রাধা নাম পুরানে বাখানে। চৈতন্যচরিতামৃত।

ইহাকেই আবার অন্যভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে—

আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।" চৈতন্যচরিতামৃত।

বৈষ্ণবদর্শনের এই মতবাদটি সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন—"অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে হইয়াও অসীম এবং আকাশই সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসীমের অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানব মনে অসীমের সার্থকতা সীমার বন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিয়াই অসীম প্রেমের বন্ধু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমার মধ্যে সীমান্ত নাই, প্রেমাও নাই। সঙ্গী ছাড়া অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গলাভ করিতে চায় প্রেমের জন্য। ব্রহ্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত।"

দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া যে প্রশ্ন, কবি তাহার সমাধান করিয়াছেন। শান্তি-নিকেতনের 'সামঞ্জস্য' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি ঐ প্রবন্ধে "তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী। 'হাঁ' যেমন 'না'কে কাটে 'না' যেমন

'হাঁ'কে কাটে তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতেই একই স্থানে দুই হওয়া চাই, এক হওয়াও চাই। ভগবান প্রেমের স্বরূপ কি না তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেছেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। প্রেমের ভিতরকার এই এক অদ্ভুত রহস্য যে যেখানে একদিকে কিছুই জানিনে সেখানে অন্যদিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতে অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে।

—০—

—: দ্বাদশ অধ্যায় :—

(কবির কাব্যে রাধা মূর্তি)

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বৈষ্ণবীয়-আদর্শ হইতে পৃথক একথা অনস্বীকার্য। তবুও বলিতে হয় যে সীমা ও অসীমের প্রেম সাধনার পেছনে বৈষ্ণবীয় যুগলোপাসনার ছায়া দুর্লক্ষ্য নহে। রবীন্দ্র কাব্যে মূলসুর হইতেছে—

"অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা"

পদাবলী সাহিত্যের রাধাও কৃষ্ণের মধ্যে "হারা" হইতে চাহিয়াছেন—

"তুঁহু যে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ"

কবি বলিয়াছেন—

তাইত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহর বেশে।"

পদাবলী সাহিত্যে দেখি—কৃষ্ণ রাধার জন্য নাপিতানী বেশ, মালিনী বেশ, পসারী বেশ, দেয়াসিনী বেশ, বণিকনী বেশ, বেদিয়া বেশ ধারণ করিয়াছেন।

কবির এই উক্তি—

আপনারি বিরহ তোমার
আমার নিল কায়া" স্মরণ করায়—
যদ্যপি রাধা-কৃষ্ণ সর্বদা অভিন্ন
তথাপি লীলার লাগি যুগপচ্ছিন্ন।" চৈতন্যচরিতামৃত।

লীলাতত্ত্বের ব্যাখানের জনাই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের নির্বিকল্প, বা কায়াহীন রূপের পরিবর্তে 'কায়ার' সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ দ্বৈতভাব বা দ্বৈতসত্ত্বা না থাকিলে প্রেম জন্মিতে পারে না। তাই কবি বলিয়াছেন—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে
কত কালের সকাল-সাঁঝে তোমার চরণ-ধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে।"

গীতাঞ্জলি / ৩৪

তুঃ বৈষ্ণব পদকর্তা—

"মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি গান
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান"

সীমা অসীম দ্বৈত হইয়াও অদ্বৈত—

কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কানে কানে
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে। গীতিমাল্য / ৮

অথবা

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানেই চাইনি।

× × ×

গোপন রহি গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ-সুখের গানে

সুর দিয়েছ তুমি, আমি
তোমার গানতো গাই নি।" গীতিমাল্য / ৯২

অপরূপ ভাবের পদ চণ্ডীদাসে পাই—

"এক কীট হয় আর দেহ পায়
ভাবিয়া তাহার রূপ।"

অথবা

"মোরা এক তনু হয়ে রজনী গোঙাই ......"

অসীম 'অনন্ত' সসীম 'সান্ত'।

সান্ত কি ভাবে অনন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে? তবে কি সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না? যায়। কবি বলিয়াছেন—

'দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে
আপনজেনে আদর করিনে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু-হাত ধরিনে
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে,
সঙ্গী বলে তোমায় বরিনে। গীতাঞ্জলি / ৯২

কবির এই উক্তির ব্যঞ্জিত অর্থ বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে পূর্বেই বলা হইয়াছে—

"ব্রজ লোকের ভাব পাই তাহার চরণ
তারে ঈশ্বর করি নামানে ব্রজজন
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে কান্ধে।" চৈতন্য চরিতামৃত।

কবি তাঁহার জীবনদেবতাকেও অনুরূপ ভাবে কল্পনা করিয়াছেন—

"বিশ্বে তোমার লুকোচুরি
দেশ-বিদেশে কতই ঘুরি,

এবার বলো, আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না। গীতাঞ্জলি / ২৩

'প্রভু' হিসাবে—

"যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।" ঐ / ২৪

রাজা সাজে—

"তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজনঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।" ঐ / ৫৬

বংশীবাদক হিসাবে—

নিশীথে রাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাও হে পুরে
যে তান দিয়ে অবাক কর
গ্রহ-শশীরে।" ঐ / ৫৯

পরম সত্ত্বার সঙ্গে মিলন হইবে তাহারই জন্য বিবিধ সাজ-সজ্জা—

"তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে;

উষা এসে পূর্ব-দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা।" গীতিমাল্য / ৫২

পরম-সত্ত্বার সঙ্গে মিলনের যে আকুতি উপরিউক্ত পংক্তিগুলিতে বিধৃত হইয়াছে, সেই আকুতি কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষের মধ্যে, পদাবলী সাহিত্যে, চৈতন্য প্রভুর মধ্যে এবং শ্রীরাধার মধ্যে দেখিতে পাই।

কবি তাঁহার জীবনদেবতার নিকট নিবেদন করিয়াছেন—

"তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার করে নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে।"

তুঃ "আলো ধনি, সুন্দরি কি আর বলিব
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব।
তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জরাশি
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা-মূরতি।
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধানাম।" বসন্ত রায়

বসন্ত রায়ের এই উক্তির সঙ্গে কবির পদের সাদৃশ্য আছে—

"কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ
চির জনম এমন করে ভুলিয়ো নাক।"

রবীন্দ্র-কাব্যকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে কবির দুইটি সত্ত্বা প্রকটিত—একটি নারী-সত্ত্বা, অপরটি পুরুষ-সত্ত্বা। নারী সত্ত্বার পিছনে 'রাধিকা-সত্ত্বা' দুর্লক্ষ্য নহে। এই নারী-সত্ত্বা সম্বন্ধে আমরা পাই—

"Wherever there is something
which is concretely personal and
human, there is woman's world"

Personality / Rabindra Nath

বৈষ্ণব-মতবাদ হইতেছে—পুরুষ-সত্তা একমাত্র কৃষ্ণের। নিউম্যানও বলিয়াছেন যে—আমাদের পুরুষাকারের যত গর্বই থাকুক না কেন, উচ্চতর আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিতে হইলে নারী বেশেই যাইতে হইবে। কবি তাঁর Personality শীর্ষক প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন—"This woman's nature in the poet has left the deep stir of life in all the world. She has known it to be infinite, not illumination of her feeling"

তাই দেখিতে পাই কবি-চিত্তের নারী সত্তার আবেদনটি পদাবলী-সাহিত্যের কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার আত্মনিবেদনের একান্ত সগোত্র—

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
মোর জানা নাই আছি এক ঠাঁই
সে কথা যে যাই পাসরি।"

তুঃ— "দিবস রজনী ভাবিতে আপনি
কত না উঠিছে দুখ।
পাখা যদি পাই পাখী হয়্যা যাই
কাহারে না দেখাই মুখ।"

কবি-চিত্তে এই রাধিকা সত্তাটি জাগরূক দেখিতে পাই কেন? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি 'প্রতীক প্রীতি' ভাব সর্বদাই জাগরূক। সার্থক কবি ও সাধক মানস-প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ কোনো একটি বা কয়েকটি বস্তু নিবিড়তম ভাব প্রকাশের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে কৃষ্ণ রসময়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাও রসময়। বৈষ্ণবদের নিকট কৃষ্ণ একটি বিশেষ মূর্তি। কিন্তু কবির জীবনদেবতা 'এক' হইয়াও 'বহু'। রবীন্দ্র-কাব্যের মূলকথা—রূপজগৎ হইতে অরূপের জগতে উত্তরণ, অর্থাৎ 'ভূমি' হইতে 'ভূমার' উপলব্ধি। তাই দেখা যায় কবি-মানস বিচিত্র প্রতীকের গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় কবি-মানসের প্রেমিকা সত্তাটি হইতেছে শ্রীরাধিকা-

সত্তা। কবি ও তাঁহার জীবন দেবতা অনাদি কাল হইতে কোটি প্রেমিকের মধ্যে বিরহ-বিধুর, নয়ন-সলিলে, মিলন-মধুর লাজের মধ্য দিয়া আসিলেও—

"আজি সেই চিরদিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে.
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি
সকল কালের সকল কবির গীতি।"

'মানসী'র 'একাল ও সেকাল' কবিতার মধ্যে কবি মোক্ষম কথা বলিয়াছেন—

এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে
এখনো প্রেমের খেলা
সারানিশি সারাবেলা—
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।"

তাই শ্রাবণের বারিধারা কবি-চিত্তে জাগরুক হয়—

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি যে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।"

একাল ও সেকাল / মানসী।

অথবা

পড়ে মনে বারিবার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিতচরণ,
শ্যামল তমাল তল নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছলছল নলিন নয়ন।
এভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়

বিজন যমুনাকুলে বিকশিত নীপ মূলে

কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহ ব্যথায়।" পত্র / মানসী।

অথবা

"নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা

খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ-কুটীর।

× × ×

'সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে

রাধিকার নির্জন স্বপন।" বর্ষাযাপন/সোনারতরী।

তাই কবি পরজন্মে চাহিয়াছেন—

"যদি পরজন্মে পাইরে হতে

ব্রজের রাখাল বালক

তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে

সুসভ্যতার আলোক।" জন্মান্তর / ক্ষণিকা।

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতবাদটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য, তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"He approached God through all the beauty, love and joy that there is in life. In this he was a true successor of Vaisnava poets of Bengal." The appeal of Rabindra Nath, Contemporary Municipal Gazette, Calcutta.

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"ঘরোয়া ও জীবনাশ্রয়ী আদর্শের অনুসরণে কবি রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব-পদকর্তাদের প্রত্যক্ষ উত্তর সাধক।" পৃ—৩৭

রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভার কথা বলিতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করিয়াছেন —"রবীন্দ্র প্রতিভার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি এক আশ্চর্য রসবোধ ও মৌলিকতার সঙ্গে বৈষ্ণব-কবিতাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়াছেন ও তাহার স্বরূপ বজায় রাখিয়াও তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া নবভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

—ঃ ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ—

(রবীন্দ্র ভক্তি-সাধনা ও বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনা)

ভক্তি প্রত্যেক ধর্মের প্রতিপাদ্য। ভগবান ও ভক্তকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিবাদ ও ভক্তিতত্ত্ব স্বীকৃত। মানুষের অন্তরে তিনটি প্রধান বৃত্তি আছে— জ্ঞান, কর্ম এবং প্রেম। অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের প্রতি প্রবল স্পৃহা, কর্মবাদের উপর আস্থা স্থাপন এবং প্রেম বা ভালবাসার স্পৃহা। এই তিনটি মৌলিক নহে যৌগিক ; অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যের যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ তিনটি বৃত্তির কোনো একটিকে প্রাধান্য দেন নাই।

জ্ঞানের মধ্য দিয়া জ্ঞানের বস্তুকে জানা যায়। ইহা ঠিক। কবি কিন্তু এই জ্ঞানমার্গের উপর বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেন নাই। কারণ জ্ঞানের দ্বারা বিষয়টিকে শুধু জানা যায় মাত্র। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবে, কারণ আগুনের দাহিকা শক্তি আছে, সুতরাং ইহা জ্ঞানের বিষয়। কবি জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন—

"কর্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী
মন্দিরে তার পাষাণ-প্রাচীর অভ্রভেদী,
চতুর্দিকেই থাকে ঘিরে ;
তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে
পায়না আলো, পায়না বাতাস, পায়না ফাঁকা, পায়না কোনো রস,
কেবল টাকা কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণদশা ঘটিছে তার, সে কথাটাই ভুলে থাকে।

× × × ×

আমি ছিলেম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে ;
বৃহৎ সর্বনাশে

হারিয়ে ছিলেম বিশ্ব-জগৎ খানি।
নীল আকাশের সোনার বাণী
সকাল-সাঁঝের বীণার তারে
পৌঁছত না মোর বাতায়ন-দ্বারে।
ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারি পাতে,
আমার আঙিনাতে। ছিন্নপত্র / পলাতকা

কর্মের মধ্যে মানুষ জড়িত হইয়া তাহার সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ভুলিয়া যায়। কর্মের মধ্যে যাঁহারা নিয়ত জড়িত তাঁহারা অর্থের দাস, কর্মের দাস হইয়া পড়ে। ঋতুচক্রের আবর্তন তাহাদের অন্তরে কোনো সাড়া জাগায় না; আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে তাঁহাদের হালখাতা হয় না, হয় বৈশাখের প্রথম তারিখে— করে লেন-দেনের হিসাব। এমন সময় কবির হাতে 'ছিন্নপত্র' আসিয়া পৌঁছাইল —

অন্যমনে হাতে তুলে
এই কথাটাই পড়ল চোখে "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে?"
মনু? আমার মনোরমা? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই।
অমনি হঠাৎ এক নিমিষেই
সকল শূন্য ভ'রে
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে।"

অর্থাৎ প্রেম জাগিয়া উঠিল—এই প্রেম সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন— মিলনের মধ্যে যে সত্য, তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে তাহা আনন্দ, তাহা রস-স্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানা স্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণ করতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা— মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।" উৎসর্গ / ধর্ম / র র / ১৩ দশম খণ্ড।

প্রেমের সঙ্গে ভক্তি জড়িত। কিন্তু ভক্তিবাদ যখন প্রেম-তত্ত্বকে ছাপাইয়া যায় তখন সেখানে আর এক প্রকার উম্মাদনার সৃষ্টি করে। ঈশ্বরকে মাধুর্য রসের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করা যায়; এবং ইহার মধ্যে মাদকতা আছে সন্দেহ নাই। ভাব-প্রবণ ব্যক্তিরা এই প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৃপ্তি পায়। কিন্তু এই মাদকতার মধ্যে একটা গলদ আছে। গলদটি হইতেছে এই ইহা মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব করে। বৈষ্ণব-ভক্তেরা এই পথের পথিক। কবি এই প্রকারের ভক্তি সাধনাকে অনুমোদন করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন—

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞান-হারা
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।" নৈবেদ্য / ৪৫

এর পরও কবি বলিয়াছেন—

"মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা-খেলা
মুগ্ধ-ভাব-ভোগে সেই বুদ্ধ-শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুতুল।" নৈবেদ্য / ৫০

কবির মত হইতেছে— আচারের বাহুল্যের মধ্যে দেবতাকে হারাইয়া ফেলেন, তাই কবি বলিয়াছেন—

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধ-দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে?
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।" গীতাঞ্জলি / ১১৯

যে জন্য কবিকে জ্ঞানমার্গ, অনুষ্ঠানমার্গ আকৃষ্ট করে নাই, ঠিক সেই জন্যেই কবি বৈরাগ্যমার্গকেও পরিহার করিতে চাহিয়াছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি, যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।" নৈবেদ্য / ৩০

কবির নিকট সন্ন্যাসের জন্যেই সন্ন্যাস তাহা আত্মবঞ্চনা। সন্ন্যাস বা ত্যাগের প্রয়োজন শিক্ষার ক্ষেত্রে। তিনি বলেন "শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য পালন শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না; রসের জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। নিয়মলোলুপতা ষড়রিপুর জায়গায় সপ্তম রিপু হইয়া দেখা দেয়।" সাহিত্য। কবির মতে আদর্শ ধর্ম হইতেছে— যে ধর্ম মানুষের অন্তরে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমকে জাগরূক করিতে পারিবে; এবং তাহা সম্ভব হইবে যদি আমরা সেবা ও পূজার পাত্র হিসাবে মানব জাতিকে গ্রহণ করি। তাই কবি বলিয়াছেন—

"ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।" নৈবেদ্য / ৪৭

কবির মত হইতেছে নিষ্কাম, স্বার্থশূন্য কর্মদ্বারা ভক্তিকে জাগরূক করিতে হইবে। ঐ কর্ম হইবে—

রাখরে ধ্যান থাক্‌রে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধূলা-বালি
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম হয়ে পড়ুক ঝরি।" গীতাঞ্জলি/১১৯

কর্মের মধ্যে বাধা বিপত্তি আছে, কিন্তু সমস্ত বিপদ আপদকে তুচ্ছ করিয়া যাইতে পারিলেই অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাইবে, সুতরাং মনে শক্তি

ও প্রাণে ভক্তি না থাকিলে দুঃখের অভিজ্ঞতাকে আনন্দ-আস্বাদে পাওয়া যায়না। তাই কবি প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

আমি তাই চাই ভরিয়া পরান
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুক্তি।
দুঃখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি।" নৈবেদ্য / ২০

নৈবেদ্য রচনা কালে কবির অন্তরে পরাধীনতার বেদনা বাজিয়াছে গভীর ভাবে। তিনি প্রতি পদেপদে দেখিতেছেন যে মানবাত্মা লাঞ্ছিত নিপীড়িত হইতেছে, তাই জীবনদেবতাকে ভক্তি জানাইয়া বলিয়াছেন—

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পন।" নৈবেদ্য / ১৬

ভক্ত যেমন প্রভুর নিকট জীবন সমর্পন করিয়াছেন, তেমনি প্রভুও ভক্তকে পতাকা দিয়াছেন। কবি প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
বাহিবারে দাও ভকতি।" নৈবেদ্য / ২০

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনদেবতার কোনো নামকরণ করেন নাই। মধ্য যুগের ভারতীয় সাধক—কবীর, দাদু, নানক, রজ্জবজী, মালিক মহম্মদ জায়সী প্রভৃতি এবং সুফী সাধকেরা ভগবানের কোনো নামকরণ করিয়া কোনো সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে ভগবানকে স্থাপন করেন নাই। বাউল, ভাটিয়ালি সঙ্গীতে দেখি যে তাঁহারা ভগবানকে কোনো একটি বিশিষ্ট নামে অভিহিত করেন নাই— দরদী বন্ধু, সাঁইরূপে অভিহিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তি হৃদয়ের আবেগ বা Emotion প্রসূত নহে, তাহা যুক্তি

ও অপ্রমত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত—

"সম্বরিয়া ভাব অশ্রুনীর
চিত্তে রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।" নৈবেদ্য।

কবির ভক্তিবাদ 'দাস্যভাবে' ভাবিত নহে। কবি ভগবানের অসীম গুণ-পনায় মুগ্ধ। ভগবান অনন্ত; তাঁহাকে তিনি কোনো দিনই 'সান্ত' করিতে চাহেন নাই—

আমিও আপন হাতে
করবো ছোট বিশ্বনাথে,
জানাবো আর জানাবো
ক্ষুদ্র পরিচয়ে?

কবির জীবনদেবতা, বিশ্বদেবতা মহান অধীশ্বর—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান
আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরবে রহি
শুনিয়া লইতে চাই আপানার গান।

ভক্তির সঙ্গে 'নাম' এর সম্পর্ক আছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব 'নাম-মাহাত্ম' প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের মতে—কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত আর অন্য কোনো গতি নাই—"নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" এই নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ, বন্দন ও কীর্তনের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। চৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন এবং চৈতন্য প্রবর্তিত ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য সম্মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন— "বৈষ্ণবধর্ম প্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিমতা সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া উচ্চ, নীচ, শুচি, অশুচি সকলেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল, সেই দিনকার বাংলা দেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্য-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।"

নামের কথা উল্লেখ করিয়া রাধা বলিয়াছেন—

"না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে তায়

× × ×

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম

× × ×

কহে বিনোদিনী শুনগো সজনী
যাইতে বলগো কি
কৃষ্ণ নাম মোর পশেছে হৃদয়ে
কদাচ পরাণে জি ॥

'পূর্বরাগ' পর্য্যায়ের বহুপদে 'নাম মাহাত্ম্য' অতি অপরূপ-ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণবদের মতই নাম-মাহাত্ম্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবানের নাম জপের মধ্যেও যে চরম সার্থকতা আছে তাহা কবি বৈষ্ণব-ভক্তদের মতো উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখো থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহবীণার তার
বাজাও আনন্দে তোমার
নামেরি ঝংকার। গীতিমাল্য / ৪৪

× × ×

তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে, আপন
মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়
বলব বিনা আশায়

বলব মুখের হাসি দিয়ে,
বলব চোখের জলে। গীতিমাল্য / ৩১

অথবা

আমার এনাম যাক্ না চুকে
তোমারি নাম নেব মুখে
সবার সাথে মিলব সেদিন
বিনা-নামের পরিচয়ে। গীতাঞ্জলি / ১৪৪

রবীন্দ্রনাথ ভক্তিবাদী কবি সন্দেহ নাই। উপরন্তু পদাবলীর ভক্তিবাদ যে তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। তথাপি পদাবলীর ভক্তিবাদ ও কবির ভক্তিবাদ এক নয়।

বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছে—নাম-কীর্তন ও লীলা-কীর্তনের মাধ্যমে। এই লীলা-কীর্তনের প্রেক্ষাপটে মানবীয় দৃষ্টিভংগি থাকিলেও মূলতঃ তাহা অতিমানবীয়। উপরন্তু পদাবলী সাহিত্যের ভক্তি, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদনার ফলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিরকালই সমস্ত উন্মাদনাকে পরিহার করিয়াছেন, উপরন্তু কর্মবাদকে তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন।

—: চতুর্দ্দশ অধ্যায় :—

(রবীন্দ্র কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও রূপের প্রকাশ)

দুঃখানুভূতি, প্রকৃতি, অসমাপ্ত প্রসাধন, কীর্ত্তন গান।

বৈষ্ণব পদাবলী বাঙালি ও বাঙ্গালা-সাহিত্যকে তন্ময় করিয়া রাখিয়াছিল, আজিও সেই প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের বজ্র-নির্ঘোষে সুপ্ত বাঙ্গালিকে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ব্রজের মধুর ভাবাবেশ তাঁহাকেও বিহ্বল করিয়াছিল। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যেই মধুসূদনের বৈষ্ণব-প্রীতি প্রকাশিত— যদিও ব্রজাঙ্গনা ও বৈষ্ণব পদাবলী একই ছাঁচে গঠিত নহে।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালার বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার যে ধারাটি নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রামবসু প্রভৃতির টপ্পায় অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রণয়-সঙ্গীতে আসিয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে বিহারীলাল নূতন করিয়া প্রবাহিত করিলেন— 'সঙ্গীতশতকে'। মূলতঃ বিহারীলাল ছিলেন— উদাসীন রোমান্টিক কবি। প্রেমের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা প্রদর্শনে তিনি ভবভূতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বিহারীলালের মধ্যে যে উদাসীনতা দেখা যায় তাহা তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে দেখা যায় না। নব্য রোমান্টিক কবিদের অগ্রণী ছিলেন— দেবেন্দ্রনাথ সেন। দেবেন্দ্রনাথ রচনারীতিতে মাইকেলের রীতি ও বিহারীলালের রীতি সম্মিলিত হইয়াছে। তবে বিহারীলাল ছিলেন কিছুটা বৈদান্তিক এবং দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন— বৈষ্ণবীয় ভক্তি রসিক। অক্ষয় কুমার বিহারীলালকে অনুসরণ করিলেও পরিশেষে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। বিহারীলাল ছিলেন ভাব-সম্মিলনের কবি এবং অক্ষয় কুমার ছিলেন

'প্রেমবৈচিত্ত্যের' কবি।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। "সন্ধ্যা সঙ্গীত" পর্যন্ত বিহারীলালের প্রভাব ব্যাপক ছিল। ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে বিহারীলালের 'সারদা'র পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছিল। উভয়েই রোমান্টিক কবি এই ক্ষেত্রেই উভয়েই যোগসূত্র। বিহারীলালের 'সারদা'র স্পর্শ রবীন্দ্রকাব্যে দেখা দিলেও মূলে ছিল বৈষ্ণব পদাবলীর স্পর্শ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমযুগে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করিয়াছিলেন. কিন্তু সেই অনুসরণ রবীন্দ্র-কাব্যে বহিরঙ্গ মাত্র। ঔপনিষদিক-দর্শনের সহিত বৈষ্ণবের নিত্যলীলাকে মিশ্রিত করিয়া "রবীন্দ্রদর্শন" এক অপরূপ আত্ম-তন্ময়তা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাই ব্রজধামের নিত্যলীলার নূপুরধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমবাদে' বৃন্দাবনের প্রেমলীলার ভিতর অবসান লাভ করিয়াছে—

"আজি সেই প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিলেছে সকল প্রেমের স্মৃতি
সকল কালের সকল কবির গীতি।" অনন্তপ্রেম / মানসী।

তাই দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্যে ভাব ও রূপের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও রূপের প্রভাব—

দুঃখানুভূতি

পদাবলী সাহিত্যে দেখি রাধা ও কৃষ্ণ দুইজনই মিলনের মধ্যেও "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" তাই পদাবলী সাহিত্য মূলতঃ বিরহ বা "বিপ্রলম্ভ"-এর সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস'

শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি"। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকেই সার বলিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের মধ্যেও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন মিলনে সুখ বিরহে দুখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তাঁহার প্রেম "কিছু কিছু সুধা বিষগুণ আধা" তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান তাহাও বিষামৃতে একত্র করিয়া। তাই চণ্ডিদাস বলিয়াছেন—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাই।"

গোপী প্রেমের মূল তত্ত্ব হইতেছে—নিষ্কাম প্রেম। গোপীরা কোনো কামনা-বাসনা লইয়া পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন নাই, তাঁহারা জাতি-কুলমানে তিলাঞ্জলি দিয়াই আসিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের নিকট।

'বিরহ' পদাবলী সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। এবং বিরহের অগ্নিদাহেই পুড়িয়া ছাই করিয়া দিয়াছেন সামাজিক রীতি-নীতি। লৌকিক গাথাগুলিতেও তাহাই পাই। তাই পদাবলী সাহিত্যের প্রতিটি পর্যায়ের পদেই ধ্বনিত হইয়াছে বিরহ-ব্যাকুলতা। এমনকি মিলনের মধ্যেও সেই বিরহ-ব্যাকুলতা—

"একতনু হয়ে মোরা রজনী গোঙাই
সুখের সায়রে ডুবি অবধি না পাই।"

রজনীতে সেই অবধি না পাইলেও প্রাতেও সেই অবধি পাইয়াছেন—

"রজনী প্রভাত হইলে কাতর হিয়ায়
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়।"

বৈষ্ণব কবিরা প্রেমের জন্য ঘরকে বাহির, বা হিরকে ঘর, পরকে আপন, আপনকে পর, দিনকে রাত্রি, রাত্রিকে দিন করিয়াছেন। তাই বেদনা-বিধুর হইয়াও পদাবলীর রাধা এত মধুর। রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার সঙ্গে প্রেমের জন্য ঘরকে বাহির, বাহিরকে ঘর, পরকে আপন করিয়াছেন—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত অজানারে দিলে ঠাই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য মূলতঃ অভিসারের সাহিত্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যও অভিসারের সাহিত্য। পদাবলীর নায়িকা অভিসার করিয়াছেন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য; রবীন্দ্রনাথ অভিসার করিয়াছেন জীবনদেবতাকে লাভের জন্য। বৈষ্ণব নায়িকা বিরহের আগুনে পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমনি বিরহানলে পুড়িয়াছেন। দুঃখ ও বেদনা উভয়েই।

'দুঃখ' সম্পর্কে কবি 'দুঃখ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টিতত্ত্ব যে একেবারে বাঁধা। কারণ অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ। একথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণতার বিপরীত কিন্তু শূন্যতা—অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে, সেইজন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে।" গদ্যে যাহা বলিয়াছেন, কবি পদ্যে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন—

এখনও বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য
সেই শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর
মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিকো যেন
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।" কবি-কাহিনী।

অথবা

বসিয়া বসিয়া হেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে একই গান, একই গান, একই গান"

হৃদয়ের গীতধ্বনি / সন্ধ্যাসঙ্গীত।

'প্রভাত সঙ্গীতে'র 'প্রতিধ্বনি' কবিতায়ও ঐ একই বেদনার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে—

"আমরণ চিরদিন কেবলি খুঁজিব তোরে
কখনো কি পাব না সন্ধান।

কড়ি ও কোমল, মানসী প্রভৃতি কাব্যেতে দেখি কবিহৃদয় সংশয়ে, নিষ্ফলতায়, ক্ষোভে হাহাকার করিতেছেন. কবি চাহিতেছেন প্রেম অথচ প্রেম পাইতেছেন না, যাহা পাইতেছেন তাহাও সংশয়বিহীন প্রেম নহে, সুতরাং সে প্রেমে কবির কোনো প্রয়োজন নাই—

"যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিড়ে দাও।" মানসী

কবির মানসী কাব্যের মধ্যে despair Resignation এর যে ভাব রহিয়াছে কবি সে কথা নিজে এক পত্রে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট স্বীকার করিয়াছেন। মানসীর যুগে দেখিতে পাই, বর্ষা কবিহৃদয়ে চির বিরহীর "সুখমিত বা দুঃখমিত বা স্মৃতি, আশ্বাসহীন অব্যক্ত বিরহব্যথায় মথিত করিয়াছে—

"এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়
বিজন যমুনা কুলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে রহি ব্যথায়।" পত্র / মানসী।

সোনারতরী ও চিত্রাকাব্যে ব্যথার সুরেত ধ্বনিত হইয়াছে ক্ষণে ক্ষণে। নীরব নিথর সন্ধ্যায় কবির মনে জাগিয়াছে—

নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন ক্লিষ্ট ক্লান্তসুর
শূন্য পানে আর কোথা ? আরো কতদূর ?

চণ্ডীদাস যেমন সুখের মধ্যে দুঃখ, দুঃখের মধ্যে সুখ অনুভব করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও ঠিক তেমনি বেদনার মধ্যে আনন্দ এবং আনন্দের মধ্যে বেদনা অনুভব করিয়াছেন—

নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
এবারের মতো পূরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান
সে সুরা তরল অগ্নি সমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি।" অন্তর্যামী / চিত্রা।

'খেয়া' কাব্যের বেশীর ভাগ কবিতায় কবি-জীবনের বিচিত্র ব্যথা-বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে এবং এই বেদনাবোধের বা দুঃখানুভূতির মূলে রহিয়াছে প্রেয়োকে লাভ করিবার ব্যাকুলতা, যেমন রাধার ছিল ব্যাকুলতা— কৃষ্ণ লাভের জন্য। খেয়াতে কবি বহুস্থানে মিষ্টিক হইয়া পড়িয়াছেন। এই কাব্যে আমরা দেখি— কবি যেন রাধার মতো প্রতীক্ষমানা, দীনা বাসরসজ্জিকা-বধূ। কবি বাসর সজ্জা রচনা করিয়া 'পথিক রাজা' বা তাঁহার জীবনদেবতার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাসর-সজ্জায় সজ্জিত কবি বলিয়াছেন—

"আমি এখন সময় করেছি
তোমার এবার সময় কখন হবে ?

সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে ?
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা
তরী আমার বেঁধে এলাম ঘাটে
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা
কেনা বেচা নানান হাটে।" প্রতীক্ষা / খেয়া।

বিরহিণী-কবি-চিত্ত ব্যথায় উদ্বেলিত হইলে উচ্ছ্বাস, শান্ত ও সৌম্যতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু দুঃখানুভূতি ঠিক তেমনি আছে—

"আমার এ গান শুনবে তুমি যদি
শোনাই কখন বলো
ভরা চোখের মত নদী
করবে ছল ছল।"

পদাবলী-সাহিত্যে ও রবীন্দ্রকাব্যে বেদনা সমানভাবেই ধ্বনিত হইয়াছে। কেন এই বেদনা ? তাহার কারণ হইতেছে— বৈষ্ণব পদকর্তারা এবং রবীন্দ্রনাথ 'অধরা'কে ধরিতে চাহিয়াছেন। অথচ অধরা ধরা দিয়াও অধরাই রহিয়া গিয়াছেন।

জগতের প্রতিটি রোমান্টিক ও মিস্টিক কবিদের কাব্যে একটা বিষাদের সুর সর্বদাই ধ্বনিত হইয়াছে। রোমান্টিক কবিদের অন্তরে সৌন্দর্য সম্বন্ধে, প্রেম সম্বন্ধে, তাঁহাদের মানসী-প্রতিমা সম্বন্ধে একটা পরিপূর্ণ আদর্শ আছে। সেই আদর্শ প্রকাশ্য দিবালোকে কাহারও চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না, ইহা কবিদের মনোজগতের বাসনা লোকের বস্তু। কিন্তু বাস্তব জগৎ কল্পিত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ফলে মানসনেত্রে যাহা দেখিতেছেন চর্মচক্ষে তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, ফলেই একটা বিরোধ বাধে। এই বিরোধ জাগায় বেদনা, ঝরায় অশ্রু। এ-ত গেল সাধারণ রোমান্টিক কবিদের কথা, কিন্তু বৈষ্ণব পদকর্তা বা রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, মহৎ কবি বা মহাকবি। মহাকবি বা ঋষি কবিদের দৃষ্টি

কবিদের দৃষ্টি-ভঙ্গি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী যেমনি সুদূর প্রসারী তেমনি অতল-স্পর্শী।

পদাবলী-সাহিত্যের পদকর্তারাও উপলক্ষ্য মাত্র। যেন তাঁহারা সখা ও দর্শক। সেখানে রাধাই হইতেছে সর্বস্ব। রাধাভাব বা রাধাপ্রেম যেমন মিষ্টিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার সহিত প্রেম, তাহাও মিষ্টিক। রাধা-কৃষ্ণকে একান্ত ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও নাথ হিসাবে, বঁধু হিসাবে, জীবনদেবতার সঙ্গে প্রেমের লীলা করিয়াছেন। মিষ্টিক-কবি-সাধকদের সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য বলিয়া কোনো কিছুই থাকেনা। তাঁহাদের জগৎ আলো আঁধারি জগৎ। তাঁহাদের নিকট ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ চিরাচরিত প্রথার সম্বন্ধ নহে। সুফী-সাধকদের মধ্যেও এই ভাবটি বিদ্যমান। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট 'সাকী'। মিষ্টিক দৃষ্টিতে তাঁহারা তাঁহাদের অভীষ্টকে সর্বত্র নিরক্ষণ করেন—

যেদিকে পসারী আঁখি দেখি শ্যামরায়
ফুলবতী ধৈরজ দূরে যায়।

× × ×

যত কর এছার নাসিকা মুই বন্ধ
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যামবান্ধ।

অথবা

অনুখন মাধব মাধব শোঙরিতে
সুন্দরী ভেল মাধাই।

কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নাই, মথুরায়, তবুও রাধা মানস-নেত্রে কৃষ্ণকে দেখিয়া বলিতেছেন—

"প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ দেখিনু
দিন যাবে আজি ভাল।"

ইহাই হইতেছে রাধার প্রেমের মিষ্টিক ধর্ম। রবীন্দ্রনাথও ঠিক তেমন ভাবেই বলিয়াছেন—

"পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বুকে ভরিয়া দাও সুগন্ধ
তেমনি করে আমার হৃদয় ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না।"

রাধার প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী, কোন কিছুকে তিনি গ্রাহ্য করেন না—

"এসব দুখ কিছু না
তোমার কুশলে কুশল মানি"

অথবা

"কলঙ্কী বলিয়া বলে সর্বলোকে
তাহাতে নাহিক দুখ
বঁধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পড়িতে সুখ।"

তুঃ "প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে
দুঃখকে আজকে কঠিন বলে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।" গীতিমাল্য / ৩৬

তাই আমরা দেখি পদাবলীর মিস্টিক সুরের সঙ্গে কবির মিস্টিক সুরের সাদৃশ্য আছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যাহা আসল, মিস্টিকের নিকট তাহার কোনো মূল্য নাই। এ সম্বন্ধে ডঃ রাধাকৃষ্ণান বলেন—

"The conception of the ground of all existence in God and of the Kinship of the human spirit to the divine is at the basis of the idea that the human soul is an exile always longing for home. It is the source of the urge in the heart towards Union with the beloved."

কিন্তু এই Union না হওয়ার জন্যই রাধার দুঃখ, রবীন্দ্রনাথের দুঃখ।

প্রকৃতি

(বৈষ্ণব-পদকর্তা ও রবীন্দ্রনাথ)

বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ঋকবেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, নাটকে প্রকৃতি সমভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। ঋক্‌বেদে বর্ষার শ্যামল মেঘপুঞ্জকে কল্পনা করা হইয়াছিল—পর্জন্যের দূত হিসাবে। মহাকবি কালিদাসের নিকট বর্ষার শ্যামল মেঘ-পুঞ্জ বিরহীর নিকট দূত হিসাবে দেখা দিয়াছে। কালিদাসের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতি দেবলোক ছাড়িয়া মানুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ব-প্রকৃতির সমবেদনার পটভূমিকায় মানুষের সুখ-দুঃখ সংযত ও মধুর হইয়া দেখা দিয়াছে। কালিদাস প্রকৃতির বর্ণনাতে বাস্তবরূপ অপেক্ষা তাহার রম্য (aesthetic) রূপটিকেই উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

ঋতুসংহারে কালিদাস ছয়টি ঋতুর বর্ণনা করিলেও তাঁহাকে বর্ষার কবি হিসাবে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। পদাবলী সাহিত্যে সমস্ত ঋতুরই বর্ণনা আছে সত্য, তথাপি মনে হয় বর্ষা ঋতুই বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অভিসার বর্ণনায় বর্ষা-ঋতু যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বর্ষাদিনে, একাল-সেকাল, বর্ষা-মঙ্গল, ঝড়ের দিনে, আষাঢ়, নববর্ষা, আবির্ভাব প্রভৃতি কবিতায়, গীতবিতানের কিছু গানে এবং নাটকে বর্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পদাবলী-সাহিত্যে প্রকৃতি উদ্দীপন বিভাব হিসাবে ধরা দিয়াছে—

"রজনী শাওণ ঘনঘন দেয় গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।"

অথবা

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে

আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে।" চণ্ডীদাস

অথবা

"গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই।" রায় শেখর

তুঃ—রবীন্দ্রনাথ

"সজনি গো
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ-যামিনীরে
কুঞ্জপথে সখি কৈসে যাওব
অবলা কামিনীরে।" ভানুসিংহের পদাবলী।

× × ×

গভীর রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে
শুয়ে শুয়ে সুখ অনিদ্রায়
রজনী শাঙন ঘনঘন দেয়া গরজন
সেই গান মনে পড়ে যায়।" বর্ষাযাপন / মানসী।

× × ×

আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু
বাজিল গম্ভীর গরজনে।

× × ×

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবন বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।" বর্ষামঙ্গল।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে বর্ষা-মেঘ বিরহ-মিলনের যবনিকা রচনা করিয়াছে। এখানে বর্ষা যেন দূতী, আস্বাদনের সিম্বলে পরিণত। কবি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— "বৈষ্ণব-পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনা বর্ণনা মনে পড়ে, প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব-কবির ছন্দো-ঝংকার এনে দেয়, তার প্রধান কারণ – এই সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য্য নয়, এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলনগাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণব-কবিদের সেই অনন্ত বৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণব-কবিতায় যথার্থ মনের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণব-কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ষা সর্বদা মানবমনে ব্যাকুল প্রত্যাশা ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষা, রাধা-কৃষ্ণের বিরহ-মিলন-নাট্যের একটি বিশেষ রঙ্গমঞ্চ। রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা বিশ্ব-ঋতুরঙ্গে জীবনলীলা-নাট্যের মাথুর দৃশ্যের মতো।

বর্ষা, রবীন্দ্রকাব্যে "সুখস্মিতি বা দুঃখস্মিতি" বা স্মৃতি মন্থন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—

'এ ভাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যামবিনে
কানেনর পথ চিনে মন যেতে চায়
বিজন যমুনাকুলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহ ব্যথায়।" পত্র / মানসী।

তুঃ "এভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।" বিদ্যাপতি।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯২ সালে শিলাইদা হইতে এক পত্রে লিখিয়াছেন— 'এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ

উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর, কত দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাক্‌ত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে" ছিন্নপত্র।

ছিন্নপত্রের বিভিন্ন স্থানে এবং কবিতায় এই অনুভূতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষি-কবি বলিয়াছেন—

"ওঁ মধুবাতা ঋতয়াতে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধবীর্নঃ সন্তোষধীঃ
মধুনক্তম্ উতোষ সঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু-মান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্ত সূর্যঃ ওঁ"

এই বাণী রবীন্দ্রকাব্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—

"এ দ্যুলোক মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধূলি"

তাই "স্বর্গ হইতে বিদায়" মাগিয়া বলিয়াছেন—

স্বর্গের তব বহুক অমৃত
মর্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা, অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।"

তাই 'সিন্ধু' কবির নিকট 'আদি জননী' হইয়াছেন। বিশ্বজোড়া লিপির অর্থ বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছেন—

"আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার— বোবার ইঙ্গিত ভাষা যেন
আত্মীয়ের কাছে।" সমুদ্রের প্রতি / সোনারতরী।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতি-প্রতিমা গঠন করিয়া কাব্যমন্দিরে স্থাপন করিয়াছেন তাহা সত্যই যেন প্রাণ-চঞ্চল মমতাময়ী নারীমূর্তি। ঐ নারী কখনো প্রেয়সী,

কখনো প্রেয়সী, আবার কখনও মাতৃরূপে প্রকটিত। 'বসুন্ধরা' কবিতায় মাতৃরূপ প্রকটিত—

"ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।"

এখানে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তবে ইহার মূলে আছে উপনিষদের প্রভাব।

অসমাপ্ত প্রসাধন

অসমাপ্ত প্রসাধন অথবা 'বিভ্রম' সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বৈষ্ণব-পদাবলী এবং বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে রবীন্দ্র-কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। অসমাপ্ত প্রসাধন বলিতে আমরা বুঝি প্রসাধনরতা নায়িকা প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়াই ছুটিয়া গিয়াছেন নায়কের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য, অবশ্য অন্য কারণেও প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া নারীরা ছুটিয়া গিয়াছেন দৃশ্যাবলী দেখার জন্য। এই 'বিভ্রম' আজিও শেষ হয় নাই।

বিভ্রমের চিত্র অশ্বঘোষ ও কালিদাসের কাব্যে আছে— যশ্চাপ্সরো-বিভ্রমমণ্ডনানাং সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্ত্তি বলাহকচ্ছেদবিভক্ত রাগামকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম।"

অর্থাৎ হিমাচলের শিখরদেশে নানা উজ্জ্বলবর্ণ বিশিষ্ট বহুবিধ গৈরিক ধাতু আছে। হিমালয়ে শীর্ষদেশে খণ্ড খণ্ড জলহারা মেঘমালা বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় এবং ঐ সকল রঙিন ধাতব পদার্থের আভায় জলহারা

মেঘগুলি নানা রঙের মিশ্রণে রক্তিম আভা ধারণ করিয়া উঠে। এই দৃশ্য দেখিয়া অপ্সরারা অবাক হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলেন এ কি! এরই মধ্যে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি তাহারা সাজ-গোজ করিতে বসিয়া যান। চুলবাঁধা, কাজলপরা, আলতা পরা, পত্রাদি রচনা কিছুই হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা সমাগতা, প্রিয়তমেরা আসিলেন বলিয়া! তাই তাড়াতাড়ি গয়নাগাটি, কাপড় চোপড় পরিতে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু ব্যস্ততায় কেহ পায়ে কাজল, চোখে আলতা দিয়া বসিলেন, কেহ বা কোমরে কণ্ঠহার জড়াইয়া কণ্ঠে চন্দ্রহার পরিলেন; সরলা কামিনীরা ভ্রান্তিবশে সমস্ত ওলট-পালট করিয়া বসিলেন।

কালিদাসেও অনুরূপ চিত্র আছে —

"বন্ধুঃ ন সম্ভাবিত এবং তাবৎ
করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশ পাশয়।"
উৎসৃষ্ট-লীলা গতিরাগবাক্ষা
দলক্তকাংখা পদবীং ততান" কুমার সম্ভবম্।

হালের গাথা সপ্তশতী গ্রন্থেও অনুরূপ অসমাপ্ত প্রসাধনের চিত্র আছে—

"অসমত্তখণ্ডণা বিঅ বচচ ঘরং মে সকজ্জহল্লসুম। ১।২১
বোলাবিজ্জহলঅসুম পুত্তি চিত্তেণ লগ্গিহিসি

অর্থাৎ হে পুত্রী, প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়াই কৌতূহলাক্রান্ত তাহার গৃহে গমন কর; যদি তাহার উৎসুক্য দূর হইয়া যায়, তবে তুমি তাহার হৃদয়ে স্থান নাও পাইতে পার।

তুঃ বৈষ্ণব পদাবলী ঃ

"সুন্দরি কৈছন আরতি তোর
বিঘটিত চরিত সাজ নাহি আনল
ভুলল মাধব মোর।

বিপরীত চীর পরিহরি হরি সাজল
দুহুঁ অঙ্কে দুহুঁ কানে।
সীঁথি বলয় করি রাই সাজাওল
কুণ্ডল মুদরিক মানে।" বল্লভদাস।

বৈষ্ণব পদাবলীতে পাই—রাধা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া গোপীগণ সহ সংকেতস্থলে ছুটিয়া গিয়াছেন—

"বিসরি গেহ নিজহু দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
এক কুণ্ডল ডোলনি
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতি বৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনি।" গোবিন্দ দাস।

× × ×

রাই সাজে বাঁশী বাজে, পড়ি গেল উল
কি করিতে কিনা করে সব হৈল ভুল।
মুকুরে আচরি রাই বান্ধে কেশভার
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার।
করেতে নূপুর পড়ে জঙ্ঘে পরে তাড়
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার
চরণে কাজল পরে নয়নে আলতা
হিয়ার উপরে পরে বঙ্ক-রাজ-পাত্তা।" বংশীবদন

ভারতচন্দ্রের রচনাতে এই বিভ্রম-চিত্র আছে। রবীন্দ্রকাব্যেও ইহা দৃষ্ট হয় এবং ইহা ঘটিয়াছে সংস্কৃত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে—

যেমন আছো তেমনি এসো আর করোনা সাজ
বেণী নাহয় এলিয়ে রবে সিঁথে না হয় বাঁকা হবে

নাইবা হল পত্রলেখায় সকল কায়দা ২
কাঁচল যদি শিথিল থাকে নাইকো তাতে লাজ
যেমন আছ তেমনি এসো আর করোনা সাজ

ক্ষণিকা / চিরায়মানা।

× × × ×

অলোকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো
কাজল বিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ো
এসো এসো বিনা ভূষণেই
দোষ নেই তাহে দোষ নেই
যে আসে আসুক ওই তব রূপ
অযতন-ছাঁদে ছাঁদিও

— o —

কীর্তন ও রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় সঙ্গীতকে মূলতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই দুইটি ভাগের একটি হইতেছে 'মার্গ' সঙ্গীত এবং অপরটি হইতেছে 'দেশী' গান—

"মার্গ-দেশীবিভেদেন দ্বেধা সঙ্গীতমুচ্যতে।
দ্বেধা মার্গাখ্যসঙ্গীতং ভরতায়ব্রবীৎ স্বয়ং।
ব্রহ্মণোঽধীত্য ভরতং সঙ্গীতং মার্গসজ্ঞিতম্‌
অপ্সরাভিশ্চ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্‌
তদ্দেশীয়মিতি গ্রাহ্যঃ সঙ্গীতং দেশভেদতঃ।"

স্বয়ং ব্রহ্মা ভরতকে যে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাই মার্গ সঙ্গীত আর অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ যে গান মহাদেবের সম্মুখে গাহিয়াছিলেন দেশভেদে তাহাই দেশীসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু আচার্য মতঙ্গ প্রণীত "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে আমরা পাই—

"আলাপাদিনিবদ্ধোয়ঃ সা চ মার্গঃ প্রকীর্তিতঃ
আলাপাদিবিহীনস্ত সা চ দেশী প্রবর্তিতঃ।"

অর্থাৎ আলাপাদিলক্ষণযুক্ত গান হইতেছে মার্গ, এবং আলাপবিহীন সঙ্গীত হইতেছে দেশী।

দেশী সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

"অবলাবালগোপালৈঃ ক্ষিতি-পালৈর্নিজেচ্ছয়া
গীয়তে সানুরাগেন স্বদেশে দেশিরুচ্যতে।

অর্থাৎ স্ত্রীলোক, বালক, রাখাল ও রাজা নিজের ইচ্ছার অনুরাগের সঙ্গে নিজ নিজ দেশে যে যে গান গাহিয়া থাকে তাহাই দেশী গান।

দেশী সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হইল ঃ—

কথা, সুর, ছন্দ বা তালের মিলন। মার্গ সঙ্গীতে কথার মূল্য নাই, শুধু সুরের মূল্য আছে। তাই আমরা দেখি—বাঙ্গালী সর্বপ্রকারের গান 'দেশী' আদর্শের গান।

কীর্তন গান বহু প্রাচীন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে কীর্তন গানের উল্লেখ আছে। ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে কীর্তনের মধ্য দিয়া ভগবানের নামকীর্তন করা। শ্রীরূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে বলিয়াছেন—"নামলীলাগুণাদিনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্" নাম লীলা ও গুণাবলীর উচ্চভাষণকে কীর্তন বলা হয়। বেদাদি শাস্ত্রে এবং বিবিধ পুরাণে শ্রীভগবানের নাম গুণ লীলা কীর্তনের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিতে একমাত্র ধর্ম হইতেছে—

"সত্যে যদ ধ্যায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতে
মখৈঃ দ্বাপরে পরচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।"

সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে, দ্বাপরে পরিচর্যায় এবং কলিতে হরি কীর্তনে বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্তব্য—

"হরের্নাম হরেনামেব হরের্নাম কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

প্রাক্-চৈতন্য যুগেও কীর্তন গান ছিল, তাহার নিদর্শন—চর্য্যাপদ। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—ঝুমুর গান। এই ঝুমুর গান, কীর্তনের রকমফের মাত্র। কীর্তন গানের প্রকৃত রূপদাতা—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এবং তাঁহাকেই বলা হইয়াছে 'সংকীর্তনৈকপিতরৌ'—সংকীর্তনের পিতা।

চৈতন্য প্রভুর তিরোধানের পর নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীর উৎসবে সর্বপ্রথম পালা-বন্ধ হিসাবে কীর্তন গানের প্রচলন করেন। কীর্তনের পাঁচটি ধারা—গড়েরহাটী, মনোহরসাহী, রেণেটি, ঝাড়খণ্ডি ও মন্দারিণী।

কীর্তন গানের পাঁচটি অঙ্গ—কথা, দোহা, আখর, তুক ও ছুট। কথা—শ্রীকৃষ্ণ, রাধা বড়াইয়ের ও সখীগণের উক্তি-প্রত্যুক্তি; এক গান হইতে অন্য

গানের যোগসূত্র, গানের কোনো একটি পংক্তির অর্থ গায়ককে কথা কহিয়া বিশদ করিয়া দিতে হয়। এই বিশদ করিয়া দেওয়া রীতিকেই বলা হয়—'কথা'।

দোহা—ছন্দে দুই চারি চরণে সূত্রাকারে অভিব্যক্ত বিষয়। সঙ্গের গাহিবার লোককে দোহার বলা হয়। দোহার বা দোহারী গানের সূত্র (খেই) ধরাইয়া দেয়।

আখর—রবীন্দ্রনাথের মতে কীর্তনের আখর 'কথার তান'। আখর রসের ভাণ্ডার অনর্গল করিবার মন্ত্র, উন্মোচনের কুঞ্চিকা— ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের 'বার্তিক'।

তুক—অনুপ্রাস বহুল ছন্দোময় মিলনাত্মক গাথাকে তুক বলা হয়।

ছুট—বড় তালের গান গাহিতে তরল তাল-ফেরতা দেওয়াকে ছুট বলা হয়।

রবীন্দ্রকাব্যে বিশেষতঃ গানের কবিসত্তাকে নায়িকারূপে কল্পনার মূলে রহিয়াছে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব ও কালিদাসের মেঘদূতের প্রভাব। পদাবলীর রাধা এবং মেঘদূতের যক্ষকান্তা (এবং যক্ষ) কবিচিত্তে বিরহানুভূতি জাগাইয়াছে—

"বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়
চোখের জলের শূন্যে চাওয়ায় কাটবে প্রহর
বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণফেলা দিন যামিনী
হে গরবিনী।"—

এ যেন মানিনী রাধার প্রতি সখীর উক্তি—

"তুমি যে আছ বক্ষে ধরে
বেদনা তাহার জানাক মোরে
চাবনা কিছু কবনা কথা
চাহিয়া রব বদনে হে।" গীতাঞ্জলি।

এখানে কবি-ভাবনা, বৈষ্ণব রসচিন্তার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনায়ও বৈষ্ণব কবিতার দ্বারা যেমন অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। গান রচনাতেও ঠিক তেমনি ভাবে বৈষ্ণবীয় ঢংটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত মূলতঃ দেশী সঙ্গীত। তথাপি কবির গান উচ্চাঙ্গ হিন্দি গান হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে।

পদাবলী-কীর্তনের গল্পের ধারাটি অক্ষুন্ন রাখার জন্য অথবা কোনো পংক্তিকে ভালভাবে গান করার জন্য কীর্তনীয়ারা কথকদের মতো কথনো কথনো অসমছন্দে ও সুরে অথবা কথার ভঙ্গিতে কথাগুলি বলিয়া যান। এই ধরণে বলাটা কীর্তনগানের একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি। এই ক্ষেত্রে পদকর্তা তথা কীর্তনীয়াদের সঙ্গীত ও কাব্যরস জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কীর্তনে তান ও আলাপে কথাহীন সুরের বিস্তার না করিয়া কথা বা শব্দের বিস্তার করিয়া সুরে বা রাগিনীতে খোলের সঙ্গে ছন্দ রাখিয়া চলার পদ্ধতিকে বলা হয় আখর। রবীন্দ্রনাথ এই আখরকে তাঁহার সঙ্গীতে অবাধে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আখরের নূতন নামকরণ করিয়াছেন 'কথার তান'। রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে কথার তান বা আখর-পদ আছে—

"আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নামল তিমির-নিবিড় রাতে।
দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে
প্লাবনঢালা শ্রাবণ-ধারা পাতে
সেদিন তিমির-নিবিড় রাতে।
আমার স্বপ্নরূপে বাহির হয়ে এল।
সে যে সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্নদেখার সাথে
সেদিন তিমির-নিবিড় রাতে।

রবীন্দ্রনাথের আখর-বিশিষ্ট গানের কয়েকটির প্রথম চরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে।"

× × ×

"আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি"

× × ×

"ওহে জীবন বল্লভ........ "

× × ×

"কে জানিত তুমি ডাকিবে........ " (প্রভৃতি)

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশারদ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের এই কীর্তনাঙ্গ গানের নামকরণ করিয়াছেন—'রাবীন্দ্রিক-কীর্তন'।

কীর্তন গানে—তুক একটি বিশিষ্ট রীতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে এ তুককে ব্যবহার করিয়াছেন, নিজস্ব রীতিতে—

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল
ও চুপি চুপি কি বলে গেল
ও যেতে যেতে গো কাননেতে গো
কত যে ফুল দলে গেল।
মনে মনে কী ভাবে কে জানে,
মেতে আছে ও যেন কী গানে,
নয়ন হানে আকাশ-পানে
চাঁদের হিয়া গলে গেল।"

এ ধরণের নিজস্ব ঢংএ গান রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলী নাম দিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রথম কীর্তনসুরে গান রচনা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি কীর্তনী ঢংএ লৌকিক প্রেমের গান রচনা করেন। প্রেম ও ধর্মসঙ্গীত ব্যতীত ঋতু সঙ্গীতও কীর্তন-সুরে রচনা করিয়াছিলেন।

কীর্তনগানের পদ্ধতির মধ্যে 'মধুকান' এর পদ্ধতিটি অপরূপ। এই পদ্ধতি লোক-সঙ্গীতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সেইজন্য ইহা বেগবান ও প্রাণবন্ত। রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতিকে অনুকরণ করিয়া গান রচনা করেন। তাঁহার 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর—

"মরি লো মরি
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।"

অথবা 'মায়ার খেলা'র
ওকে বলো সখি বলো
কেন মিছে করে ছল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবির— "ওগো শোন কে বাজায়
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি
চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।

অথবা

"তোমার গোপন কথাটি সখী রেখো না মনে
শুধু বোলো আমায় বোলো গোপনে।"

এই ধরণের গানগুলির মধ্যে কীর্তন গানের ঠাট, রূপ রস ও মিথলজিতে পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্র সঙ্গীতে কীর্তনের সঙ্গে বাউলের প্রভাব উপেক্ষণীয় নহে। কীর্তন ও বাউল পদ্ধতির যুক্ত প্রভাবেই গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির গানগুলি জমিয়া উঠিয়াছে। গীতাঞ্জলির ভাষা সোজা, ভাব ভক্তিনম্র এবং সুর মর্মস্পর্শী। তাই এই গানগুলির আবেদন অপরিসীম।

—ঃ পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ—

(রবীন্দ্রকাব্যে পদাবলীর প্রভাব)

পদের প্রতিধ্বনি

আলোচ্য অধ্যায়ে বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য হইতে কিছু সংখ্যক পদ উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ রচিত বহু কবিতার সঙ্গে যে উহাদের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাই দেখান হইয়াছে—

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল চণ্ডীদাস

তুঃ বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব
বিফল পীরিতি লেহা
বিফলরে এ মঝু জীবন যৌবন
বিফলরে এ মঝু দেহা ভানুসিংহ / ৩

"এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে
নাজানি কানুর প্রেম তিলেজানি ছুটে।" চণ্ডীদাস।

তুঃ "খোয়াব কব হম শ্যামক প্রেম
সদাডর লাগয়ে মোয়।" ভানসিংহ ঠাকুরের পদাবলী / ৩

নয়নকো নিঁদ গেও বয়ানক হাস
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝুপাশ।" বিদ্যাপতি।

তুঃ লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাসরে,
লয়ি গলি নয়ন আনন্দ।

শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয় মন
কাঁহি তব ও মুখচন্দ ?" ভানুসিংহ / ৬
"গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই
কুলিশ পতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগাই।
সজনি, আজু দরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসারি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল।" রায় শেখর।

তুঃ শাওনগগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথযামিনীরে।
কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনীরে। ঐ / ১৩

× × ×

বোলত সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত
সকরুণ রাধানাম।" ঐ / ১৩

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল
কহিও বন্ধুরে মোর এত পরিহার
এক তিল যাহা বিনু যুগশত মানি
তাহে কি এতহু দিন সহয়ে পরাণি। জ্ঞানদাস

× × ×

তুঃ আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি-নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম-চয়ন রে। বিরহ / কড়ি ও কোমল

মুখলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। জ্ঞানদাস।

তুঃ "প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।"
দেহের মিলন / কড়ি ও কোমল।

হেদেলো বিনোদিনী
এ পথে কেমনে যাবে তুমি
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি।
এ ভর দুপুরবেলা তাতিল পায়ের ধুলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভরে আউলাইল কবরী।" দানলীলা / বংশীবদন

তুঃ এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে
কিসের দুরূহ আশায়।
সম্মুখে দেখতে চাহি পথের যে সীমা নাহি
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিণী কথা রাখো দূরপথে যেয়োনাকো
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে। পসারিণী / কল্পনা।

প্রাণনাথ আজু কি হইল
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল
মৃগমদ চন্দনবেশ গেল দূরে
নয়নের কাজল গেল সিঁথার সিন্দুর। রামানন্দ বসু

তুঃ আমি আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে।

× × ×

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে। মানসী।
"শুনহে কানু ইহ অবধারি
সকল কাজ হাম বুঝলু বুঝলু
না বুঝলু অন্তর নারী।"

তুঃ তোমারে পাছে বুঝিতে পারি
তাই কি এত লীলার ছল
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।" উৎসর্গ।
রাই কানু কর ধরি নৃত্য করে ঘিরি ঘিরি
পরশে পুলক অন্তরে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই মুখ ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে
কুসুমিত বৃন্দাবন কলপ তরুগণ
পরাগে ভরল অলিকুল। নরোত্তম দাস।

তুঃ আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান। গীতবিতান।
সখির বচনে আঁখির কান
বুঝল সুন্দরী তেজল মান।

অর‍ুণ নয়নে ঝরয়ে লোর
গদ গদ বচনে বোল।
চরণ কমলে পড়ল কান
সখির বচনে তেজল মান। প্রেমদাস

তু : মান করে থাকা আজ কি সাজে
আজ মধুরে মিলবি মধু পরাণ বঁধু
চাঁদের আলোয় ওই বিরাজে
মান করে থাকা আজ কি সাজে। গীতবিতান।

"নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা
তথাপি তুমি যে গতি না ছাড়িনু প্রাণপতি
আমা সম নাহিক অধমা। নরোত্তম ঠাকুর

তু : আমি অধম অবিশ্বাসী
এ পাপ মুখে সাজে না যে
তোমায় আমি ভালবাসি। গীতিমাল্য

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।" চণ্ডীদাস।

তু : তোমারি নাম বলব নানা ছলে
বলব একা বসে আপন
মনের ছায়া তলে। গীতিমাল্য।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিখে
পালঙ্ক শয়ন রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিসে।" জ্ঞানদাস।

তু : রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
সেই গান মনে পড়ে বার
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
মনসুখে নিদ্রায় মগন। বর্ষাযাপন / মানসী।

"চলে নীল সাড়ি নিঙারি নিঙারি
পরাণ সহিত মোর।" চণ্ডীদাস / লোচনদাস / যদুনাথ

চোখে কাজল পরা
ঘাটের থেকে নীল সাড়ি
নিঙারি নিঙারি চলা রবীন্দ্রনাথ।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

বৃন্দাবন দাস।

তু ঃ এখনো সে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে
এখনো প্রেমের খেলা
সারানিশি সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটিরে। একাল ও সেকাল / মানসী

সুন্দরী কত সমুঝায়ব তোয়
পায়লি রতন যতন করি তেজলি
অব পুন সাধসি মোয়। গোবিন্দ দাস।

তু ঃ কতি ন কথিতমিদমনুপদচিরম্
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্" জয়দেব / ৬ / ৯

অথবা

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ঐ ৫ / ৯

তু ঃ "বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।" রবীন্দ্রনাথ।

জহাঁ জহাঁ পদযুগ ধরই
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরই
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ
তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ। বিদ্যাপতি।

তু ঃ "দুখানি চরণ পরে ধরণীর গায়
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়
শতলক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন।" চরণ / কড়ি ও কোমল।
এত কহি ফলহারী ফলদিল কর ভরি
প্রেমভরে গদ গদ চিত
কৃষ্ণচন্দ্র ফলহাতে খাইতে খাইতে সাথে
আসি নিজ গৃহে উপনীত।
ফলদেখি যশোমতি আনন্দে না জানে কতি
খাওয়াইয়া প্রেমসুখে ভাসে।
ধন্য সেই ফলহারী ফলে পাইল নন্দহরি
কহে কিছু ঘনশ্যামদাসে।"

তু ঃ ঝুলি হাতে দিলাম তুলে
একটি ছোট কণা
যবে পাত্র খানি ঘরে এনে উজার করি একি!
ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখি!
দিলেম যা রাজ-ভিখারীকে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে।" রবীন্দ্রনাথ
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া
ফিরে কতেক পাকে
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে
সে মুখে সেদিন থাকে। রায় শেখর।

তু ঃ মোর রাঙা চরণের ধূলি হইবার
হৃদয়ে একমাত্র সাধ ছিল যার
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিতে চুম্বন
মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেইজন।" ভগ্নহৃদয় / রবীন্দ্রনাথ।

ব্রজমণ্ডলের শব্দ

আলোচ্য অধ্যায়ে কবির যে কবিতাগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা বৈষ্ণব-পদকর্তাদের রচিত পদের প্রতিধ্বনি নহে। কবির অন্তরে ব্রজমণ্ডলের পরিবেশ যে ভাবে জুড়িয়া বসিয়া আছে তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে—

বাঁশরি : মথুরা

বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ কুহরিছে পিক-গণ
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল কই।

মথুরায় / কড়ি ও কোমল।

রাধা :

আর নিয়ে রাধার বিরহে ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল্,
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
একফোটা তার আঁখিজল। বিলাপ / কড়ি ও কোমল।

অভিসার : রাধিকা : বৃন্দাবন :

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবেকার দূরে বৃন্দাবনে।

একাল ও সেকাল / মানসী।

বৃন্দাবন : বাঁশি : যমুনা : রাধা

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে
এখনো প্রেমের খেলা
সারানিশি সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে।

একাল ও সেকাল / মানসী।

অভিসার : বাঁশি : বঁধু

সেজে গুজে রেলপথে কর অভিসার।
নেই বাঁশি নেই বঁধু নেইরে যৌবন মধু
মুছেছে পথিক বঁধু সজল নয়ান।

শ্রাবণের পত্র / মানসী।

বারিষা : বৃন্দাবন : অভিসার : রাধিকা : তমাল :
ভরা বাদর : শ্যাম : নীপ : যমুনা :

মনে পড়ে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমাল তল নীল যমুনার জল
আর দুটি ছলছল নলিন-নয়ন ;
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়
বিজন যমুনাকুলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহ ব্যথায়।" পত্র / মানসী।

যদুপতি : মথুরা :

কোথা সে যদুপতি কোথা মথুরার গতি
অথ চিন্তা করি ইতি কর মনস্থির।

শ্রাবণের পত্র / মানসী।

গোবিন্দদাস : অভিসার : যমুনা : রাধা : নিকুঞ্জ :
গীতগোবিন্দ : মেঘে অম্বর : মেদুর :
বৃন্দাবন : রাধিকা :

বর্ষা আসে ঘনরোলে   যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী,
সুর করে বার বার   পড়ি বর্ষা অভিসার
অন্ধকার যমুনার তীর।
নিশীথে নবীনা রাধা   নাহি মানে কোন বাধা
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ কুটির

× × ×

আষাঢ় হতেছে শেষ   মিশায়ে মল্লার-দেশ
রচি 'ভরা বাদরের' সুর।
খুলিয়া প্রথম পাতা   গীত গোবিন্দের গাথা
গাহি 'মেঘে অম্বর মেদুর'

(মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।) জয়দেব।

× × ×

সেই ছবি জাগে মনে   পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।   সোনারতরী।

ব্রজ : রাখাল : ধেনু : বংশী : যমুনা : শ্যাম :

যদি পরজন্মে পাইরে হতে
ব্রজের রাখাল বালক
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশী বটের তলে

যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
　　　পরে পরায় গলে
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
　　　শীতল কালো জলে
যারা নিত্য কেবল ধেনু চড়ায়
　　　বংশী বটের তলে।

বেশি উদাহরণ দেওয়া হইতে বিরত রহিলাম।



পদাবলীর রস পর্য্যায়ের প্রতিফলন

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্"—মহান্ পুরুষরূপী ব্রহ্ম-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের উপাস্য। পদাবলী-সাহিত্যে কৃষ্ণের লীলাময় রূপ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে অদ্বৈত ব্রহ্মের পুরুষ-বিগ্রহের মাধ্যমে সৃষ্টিলীলার মধ্যে একই তত্ত্ব ও সত্য মূর্ত্ত হইয়াছে। এই তত্ত্বই হইতেছে—আনন্দ-তত্ত্ব বা প্রকাশ-তত্ত্ব-"আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

পদাবলী ও রবীন্দ্রকাব্যের প্রেম-সৌন্দর্য ও জীবনদর্শনের মূলেই রহিয়াছে আনন্দ-তত্ত্ব বা প্রকাশ-তত্ত্ব। পদাবলী সাহিত্যে রাধা হ্লাদিনী শক্তির মধ্য দিয়াই আপনার সত্ত্বা প্রকাশ করিয়াছেন। স্রষ্টা ও কৃষ্ণ, সৃষ্টি ও রাধা—একই সত্ত্বার দুইটি রূপ। কবির 'আমি' ও 'তুমি'ও তাহাই।

ব্রহ্ম, কৃষ্ণ, অদ্বৈত ; কিন্তু প্রেমের প্রকাশ ও আস্বাদনের জন্য দুইই আবার দ্বৈত। এবং সেই প্রেমের পরিণতি অদ্বৈতে। পদাবলী সাহিত্যে এই দ্বৈত ও অদ্বৈতের লীলা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া বিধৃত হইয়াছে। মানসী হইতে প্রাক্-বলাকা যুগ পর্যন্ত কবির কাব্যেও পদাবলী সাহিত্যের ঐ দ্বৈতাদ্বৈত ভাবটি প্রস্ফুটিত। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন—১২৮৭-১৩১২ সাল পর্যন্ত এই পঁচিশ বৎসরের কাব্য রচনায় পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পদাবলী সাহিত্যে যে ভাবে পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস আক্ষেপ প্রভৃতি পর্যায়ের পদ আছে রবীন্দ্র সাহিত্যে অনুরূপ পদের অভাব নাই। আলোচ্য অধ্যায়ে উভয় সাহিত্যের সাদৃশ্য মূলক কিছু সংখ্যক পদ উদ্ধৃত করা হইল—

পূর্বরাগ (বংশীধ্বনি শ্রবণ)
"ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে
আমার ঘরে কেহ নাইরে।" গান / কড়ি ও কোমল।

"রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিখলিরে কান ?" ভানুসিংহের পদাবলী।

× × ×

"বাঁশরি-ধর্ন তুহ অমিয় গরলরে।" (ঐ)

× × ×

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে
বন মাঝে কি মনো মাঝে।"

× × ×

"বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে সে কথা বুঝায়ে দাও !"
মানসী।

উপরি উক্ত পদগুলি, পদাবলী সাহিত্যের ঐ পর্য্যায়ের পদগুলিকে স্মরণ করায়।

স্বপ্নদর্শন

"প্রতিনিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।"
যৌবন স্বপ্ন / কড়ি ও কোমল।

× × ×

"স্বপ্নে আমার মনে হোলো
কখন ঘা দিল আমার দ্বারে হায়।"
প্রকৃতি / গীতিবিতান।

× × ×

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।"
সুপ্তোত্থিতা / সোনারতরী।

তু:　　"পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে
নাসার বেসর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে।"　　　　চণ্ডীদাস।

×　　　×　　　×

"তোমারে কহি যে সখি স্বপন কাহিনী
শাঙন মাসের দে ঝিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিকে বসন
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া গো
মুখ ধরিয়ে করয়ে চুম্বন।"　　　　রামানন্দ বসু।

অভিসার

পূর্বরাগের অনুরাগ রঙে রঞ্জিত হইয়া কৃষ্ণ মিলনের জন্য রাধা অভিসার করিয়াছেন। কৃষ্ণও রাধার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য অভিসার করিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে অভিসার হইতেছে শক্তি ও শক্তিমানের অভিসার। ইহাকেই উপনিষদের ভাষায় বলা যাইতে পারে—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" কৃষ্ণ এই ভূমার প্রতীক। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রাধার অভিসারই হইতেছে জীবের ভূমার উদ্দেশ্যে অভিসার। রবীন্দ্রসাহিত্যের অভিসার হইতেছে ভূমার উদ্দেশ্যে অভিসার তাহাই হইতেছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গতিবাদ। আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে যে রবীন্দ্রনাথের অভিসার ও পদাবলী অভিসার এক, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। উভয় সাহিত্যের মত এক হইলেও পথ ভিন্ন। পদাবলী জগতে প্রেম সাধনার অভিসার পর্ব রাধাকৃষ্ণের বিশিষ্ট প্রতীকের মধ্যে রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রতীক গ্রহণ করেন নাই। ফলে কবির অভিসারের আন্তর ধর্মটির মধ্যে বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। রসের দিক দিয়া উভয় সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হয়, পদাবলী মধুর রসের সাহিত্য, রবীন্দ্র-সাহিত্য মূলতঃ শান্ত রসের সাহিত্য।

উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের গতিবাদের মধ্যে জীবনের যে সার্বিক বিকাশের ইঙ্গিত আছে পদাবলী সাহিত্যের অভিসারের মধ্যে সেই ইঙ্গিত নাই। দুই এর তত্ত্বের প্রকৃতি-গত বৈসাদৃশ্য থাকিলে রাধার প্রেমমধ্যে জীবনের অভিসারের সঙ্গে এবং কবির অভিসার-দৃষ্টির সঙ্গে একটা নিকট সম্বন্ধ আছে একথা অস্বীকার করিবার কোনো উপায় নাই। বর্ষা অভিসার—

"বাদর বরখন নীরদ গরজন
বিজুরী চমকন ঘোর
উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর।"

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

অথবা

আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে। গীতাঞ্জলি / ১৮

অথবা

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার গীতাঞ্জলি / ২০

তুঃ ঝরঝর বরিখে সঘনে জলধারা
দশদিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা
এ সখি কিয়ে করব পরকার
অব জনি সাধয়ে হরি অভিসার।" শেখর।

জীবনদেবতার জন্য কবির অভিসার, শুধু একালের নহে, যুগযুগান্তর ধরিয়া এই অভিসার চলিয়া আসিয়াছে—

'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়,
জানিনা সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবন-ধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।''   গীতাঞ্জলি/৬৫

'বলাকা' কবিতায় অভিসারের সার্বিক রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

''তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অংকুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে অজনা হইতে অজানায়
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।''

'শাজাহান' কবিতায় পাই অভিসারের গতির কথা, সেই গতি—

''জীবনেরে কে রাখিতে পারে !
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।''

'চঞ্চলা' কবিতায় পাই—

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও
ফিরে নাহি চাও।
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও
কুড়ায়ে লওনা কিছু করনা সঞ্চয়।"

অথবা

"বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
হেথা নয় হেথা নয়, আর কোনখানে।" বলাকা।

বাসক সজ্জিকা :

এই অবস্থায় দেখা যায় রাধা, কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় কুঞ্জ সাজাইয়া বসিয়া আছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সাজসজ্জা করিয়াছেন। পদাবলী সাহিত্যের এই রূপটির প্রতিফলন দেখিতে পাই রবীন্দ্রকাব্যে—

"আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়নেরে।
কত নিতি-নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম-চয়নে রে।

× × ×

তাই মালাটি গাঁথিয়া পড়েছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া" বিরহ / কড়ি ও কোমল।

× × ×

"দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে।" উৎসর্গ / ৮

"মম হৃদয়ণিকুঞ্জে বাসর সাজায়ে
জ্বালায়ে আশার বাতি
তুমি এস বা না এস আমি বসে আছি
জীবন-মরণ সাথী।"

তুঃ "বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা
তাম্বুল সাজানু দীপ উজরানু
মন্দির হইল আলা।"
"অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হইল
নিশ্চয় জানিনু মোরে বিধি বিড়ম্বিল।" বসুঘোষ

অথবা

"কহে শ্যাম বঁধু আসিবে বলিয়া
শেজ সাজাইনু ফুলে
গত প্রায় নিশি কোথা কালশশী
রজনী গেল বিফলে।" নরহরি।

উৎকণ্ঠিতা

নায়িকা নায়কের জন্য অথবা নায়ক-নায়িকার আগমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে প্রতি মুহূর্তে সচকিত হইয়া থাকেন। এই সচকিত ভাবই উৎকণ্ঠা। রাধা যেমন কৃষ্ণের আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার আশাপথ চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন উৎকণ্ঠার চিত্র আছে, কালিদাসের কাব্যেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। 'নববর্ষা' প্রবন্ধে কবি বলিয়াছেন, "নব মেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পরম নিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া 'জনমাজর সোহাগিনি' মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্য-লোকের মধ্যে কোন একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।"

গীতাঞ্জলির বহু কবিতায় এই ভাবটি বিদ্যমান—

"এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।" গীতাঞ্জলি / ১৭

× × ×

"পথ চেয়ে মোর কাটল নিশি
লাগছে মনে ভয়
সকালবেলা ঘুমিয়ে পরি
এমন যদি হয়।" খেয়া / জাগরণ।

× × ×

"কখন্ যে দিন ফুরিয়ে যাবে—
আসবে আঁধার ক'রে,
কখন্ তোমার পূজার বেলা
কাটবে অগোচরে।" গীতাঞ্জলি / ৮৭

তু:— "সজনি রজনী বহি যায়
অবহু না মীলল নাগর রায়
কি বুঝি বরজ যুবরাজ
কেলি রভস করু সহচর মাঝ।"

× × ×

অথবা

"কথিত সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলরূপমপি-যৌবনম্।" জয়দেব।

(আমি এখন কাহার শরণাপন্ন হইব ; সখীগণের আশ্বাসবাক্যে আমি প্রবঞ্চিতা। কথিত সময়ে শ্রীহরি বনে আসিলেন না। আমার এই নির্ম্মল রূপ যৌবন বিফল হইল।)

পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ।"

জয়দেব ।

তু ঃ "দিবস রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি ।
তাই চমকিত মন চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি ।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
কে আসিছে বলে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখি ।"

মায়ার খেলা ।

কলহান্তরিতা

মানের শেষে প্রিয়ের বিচ্ছেদের সূচনা। সেই অনুতাপে দেখা দেয় কলহান্তরিতা-লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই ধরণের কবিতা পাই—

"বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।"

× × ×

'ওরে তুই যারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তারে পাবি কি আঁখি ?
এখন পথে ফিরে পাবি কিরে
ঘরের বাহির করলি যারে।"

কবির এই কবিতাগুলিতে, কবির অনুতপ্ত-হৃদয় কলহান্তরিতা শ্রীরাধার মতই ; জীবন-দেবতাকে ফিরাইয়া পাইবার আর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও রাধার আর্তি সমভাবে পূর্বেই হইয়াছে—

"সুন্দরি তোহে সমুঝায়ব কোই
অব রহ নিরজনে বন মাহা রোই।" গোবিন্দদাস।

"সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ
মান দগধ জীউ অবহুঁ নাহি নিকসই
কানু সঙ্গে কি করব রোখ।" গোবিন্দদাস।

"সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম্।"

× × ×

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে
কিমপরমধিক সুখং সখিভবনে।" জয়দেব।

নিবেদন

পদাবলী-সাহিত্যে রাধা নিজেকে যেমনভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, কবিও নিজেকে তাঁহার জীবন দেবতার পায়ে সঁপিয়া দিয়াছেন—
ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থে কবি বলিয়াছেন—

"সবশেষ হল যেখানে
সেথায় তুমি আর আমি একা।"

দ্বৈতসত্তার মধ্য দিয়া অদ্বৈতের প্রকাশ।

কবি তাঁহার জীবনদেবতার নিকট নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন—

"ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।" নৈবেদ্য।

× × ×

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবস রাত
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবন নাথ নৈবেদ্য

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।" গীতাঞ্জলি।

"আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব
তোমার চরণ-ধূলায়-ধূলায় ধূসর হব।" গীতাঞ্জলি।

গীতাঞ্জলিতে যে অধ্যাত্ম-জীবনের চিত্র পাই, তাহা সূরু হয় নৈবেদ্যে; খেয়াতে এবং গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির মধ্য দিয়া চরিতার্থ লাভ করে। গীতাঞ্জলিতে এই অধ্যাত্ম সাধনায় কবি-চিত্তের সহজ সরল আনন্দের চিত্র অপেক্ষা বেদনারই সুর স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়াছে। এখানে আত্মনিবেদনের মধ্যে কবি মাঝে মাঝে সংশয় অনুভব করিয়াছেন—

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো,
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এইকি ভালে ছিল রে লিখা—
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।" গীতাঞ্জলি / ১৭

× × ×

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো,
কেউ জানবে না, কেউ বলবে না।" গীতাঞ্জলি / ২৩

গীতাঞ্জলিতে যে বেদনা এবং আস্তি-নাস্তির মধ্যে যে সংশয় ছিল তাহার দ্বন্দ্ব গীতিমাল্যে নিরসন হইয়াছে—

'এই যে তুমি' এই কথাটি
বলব আমি বলে

কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চলে।" গীতিমাল্য / ১৪

× × ×

"আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।" গীতিমাল্য / ১৫

গীতিমাল্য সম্পর্কে অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'কাব্য-পরিক্রমা'তে বলিয়াছেন—"কবির সৌন্দর্য সাধনা যেমন কড়ি ও কোমল ও চিত্রাঙ্গদার ভোগ প্রদীপ্ত বর্ণ উজ্জ্বলতায় প্রথম সূচনা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'মানস সুন্দরী', 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতার বর্ণ ও প্রাচুর্যে ও বিলাসে বিচিত্র হইয়া অবশেষে ক্ষণিকার বর্ণ বিরল বেগরহিত সুগভীর স্বচ্ছতায় পরিণতি লাভ করিয়াছিল। সেইরূপ নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশঃ কবির অধ্যাত্ম সাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রতা হইতে ঐক্য, বেদনা হইতে মাধুর্যে, বোধ-প্রাখর্য হইতে ঐক্য সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে।" তাই গীতালিতে কবি বলিয়াছেন—

"ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়
তোমারই হউক জয়।"

কবি-চিত্ত প্রশান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে, কোন বেদনা বা সংশয় নাই—

"আজতো আমি ভয় করিনে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধু-পারে
তবু তুমি সেই তো আমার তুমি,
আবার তোমায় চিনব নূতন করে।" গীতালি/৯৭

অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার পরিণতির সুমেরু শিখরে দাঁড়াইয়া কবি নিবেদন করিয়াছেন—

"আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফিরে
দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলানো
এই সাগরের তীরে।

× × ×

আবার তুমি ছন্মবেশে
আমার সাথে হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে।" গীতালি / ৮৬

মান

প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে যে মনান্তর প্রচলিত তাহাই মান। পদাবলী সাহিত্যে মানের প্রকার ভেদ আছে। সহেতুক মান এবং নির্হেতুক মান। হেতু থাকাতে যে 'মান' এর সৃষ্টি, তাহাই সহেতুক মান এবং কারণ বিনা যে মান— তাহাই নির্হেতুক মান। তবে মূল কথা— প্রেমের স্বভাবই মান করা ; রবীন্দ্র কাব্যেও মানের চিত্র আছে—

মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ,
ক্ষমহ কুবচন মোর।
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব
তুহুঁ মম প্রাণক প্রাণ।"

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী / ১৫

"তুমি যদি না দেখা দাও
করো আমায় হেলা,
কেমন করে কাটবে আমার
এমন বাদল বেলা।" গীতাঞ্জলি / ১৬

× × ×

বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে।
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।"
গীতবিতান।

পদাবলী সাহিত্যে 'মান' এর পদ বহু রহিয়াছে—

পিরিতি মূরতি কভু না হেরিব
ও দুটি নয়ন কোণে? চণ্ডীদাস।

× × ×

উহার নাম আর কোরোনা
উহার নামে নাই মোর কাজ
উনি করেছেন ধর্মনাট ভুবন ভরি লাজ।"

—০—

প্রেম বৈচিত্ত্য

যখন মিলনের মধ্যেও বিরহের আশঙ্কায় চিত্ত উদ্বেলিত হয় তখন তাহাকে প্রেম বৈচিত্র্য বলা হয়। আনন্দের মধ্যে বিষাদ— এই ভাব সংস্কৃত সাহিত্যে আছে কালিদাস তাঁহার 'বিক্রমোর্বশীয়' গ্রন্থে বলিয়াছেন— "রতি-খেদসুপ্তমপি মাং শয়নে যা মনাসে প্রবাসগতম্" সা ত্বমিহেত্থমকহং কথং সহেথাশ্চিরবিয়োগম্" অর্থাৎ শয্যাতে যে তুমি রতিশ্রমতপ্ততায় আমাকে প্রবাসগত বলিয়া মনে করিতেছ, সেই তুমি আমার এমন চিরবিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিলে?

ঋতুসংহার কাব্যে পাই— "সমীপবর্ত্তিস্বধুনা প্রিয়েষু সমুৎসকা এব ভবন্তিনার্য" বসন্তকালে দয়িত নিকটেই থাকা সত্ত্বেও দয়িতারা উৎকণ্ঠিত ও ভাবি বিরহের সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

ভবভূতির রচনায়ও মিলনের মধ্যে এই ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—
"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতিবা-দুঃখমিতি বা প্রমোহ নিদ্রা বা কিমু-বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ তব স্পর্শে-স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সম্মীলয়তি চ"। উত্তর-রামচরিত / ১ম অঙ্ক।

অর্থাৎ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না ইহা সুখ না দুঃখ, আমি প্রমোদগ্রস্ত না সুপ্ত, আমার দেহে বিষসঞ্চার হইতেছে, না যেন মদ্যপান হেতু প্রমত্ততা উপস্থিত হইতেছে। যে মুহূর্তে তোমার দেহ স্পর্শ করিতেছি ঠিক সেই মুহূর্তেই বিহ্বলতা উৎপাদন করিয়া আমার চৈতন্যকে কখনো বিকারগ্রস্ত করিতেছে আবার কখনো উন্মাদনার সৃষ্টি করিতেছে। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এই অনুভূতি কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তং প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

প্রেমবৈচিত্ত্যের চিত্র সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রকীর্ণ কবিতার মধ্য দিয়া পদাবলী সাহিত্যে পৌঁছিয়াছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যেও ইহা দুর্লক্ষ্য নহে—

তার পাশে আছি, তবু নির্বাসন।"

× × ×

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহিনি
'প্রিয়তম আমি বিরহিনী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।' দীনা / মহুয়া

× × ×

বিরহ বিধুর নয়ন সলিলে
মিলন মধুর লাজে। অনন্ত প্রেম / মানসী।

× × ×

'তাইতো আমার মিলনের মাঝে
নয়ন সলিল বহে।'

এই চিত্রগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর এই চিত্রগুলির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে—

তিল এক নয়ন ওত জিউ না সহ
না রহই দুহুঁ তনু ভীন।" রায় শেখর।

রাধা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বস্ব দিয়াছেন। এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধা চরম অপবাদ পাইয়াছে— রাধাকে 'অসতী' বলা হইয়াছে, তবুও রাধা হাসিমুখে বলিয়াছেন—

"সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ না জানি।" চণ্ডীদাস

অথচ এই রাধা শ্রীকৃষ্ণকে—

"অঞ্চলে বাঁধিয়া রত্ন চাহি ফিরে ঘরে
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে।"

রাধাকে লোকে 'কলঙ্কী' বলিয়াছেন তাহাতে রাধার ভ্রূক্ষেপ নাই—

"কলঙ্কী বলিয়া বলে সর্বলোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ
বঁধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পড়িতে সুখ।" চণ্ডীদাস।

অথচ এই সুখের মধ্যেও দুঃখ, আনন্দের মধ্যে বেদনা। এই বেদনা প্রিয়তমকে পাইয়াও হারানর বেদনা। রবীন্দ্রনাথ চিত্রার 'সিন্ধুপারে' কবিতায় বলিয়াছেন—

"সেই মধু মুখ সেই মৃদু হাসি, সেই সুধা ভরা আঁখি
চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি।"

কবির মধ্যে প্রেমবৈচিত্ত্যের বাণী নিখুঁত ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে—

"তবে তাই হোক। দেবী অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ

নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।" চিত্রা।

আক্ষেপানুরাগ

নিজের পরাজয়ের চেয়ে যখন প্রেমের পরাজয় ঘটে তখন অনুরাগ আক্ষেপের রঙে রঞ্জিত হয়। তাই রাধা বলিয়াছেন—

"যার লাগি ছাড়িনু গৃহের যত সুখ
না জানি কি লাগি এবে সেজনা বিমুখ।" জ্ঞানদাস।

× × ×

' কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে অন্তর
যাহারে মরমি কহি সে বাসয়ে পর।"

× × ×

এদেশে না রব একা যাব দূর দেশে
সেই যে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে।"

বৈষ্ণব পদাবলীতে আক্ষেপের বিভিন্ন শ্রেণীর পদ আছে— নিজের প্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, প্রেমের প্রতি আক্ষেপ, বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ কিন্তু রবীন্দ্র কাব্যে পর্য্যায়ের পদ নাই —শুধু সাধারণ ভাবে ধ্বনিত আক্ষেপের পদ পাই—

"আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহেনা যে অপমান
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে
তাহারো চেয়ে সে মহীয়ান।" মানসী।

× × ×

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী। গীতাঞ্জলি/৬১

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি
আলস ত্যাজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বুঝি আর হল না তোমার সাথে
সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে   গীতাঞ্জলি / ৬৭

"যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে

× × ×

উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশি, সাজে নাই গেহ—
কাঁদিয়া তোমায় এনেছি ডাকিয়া
ভাঙা মন্দির-দ্বারে।"   গীতাঞ্জলি / ৭২

ঝুলন

'ঝুলন' পদাবলীর একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। 'ঝুলন' অর্থে রাধা কৃষ্ণের ঝুলনকেই বুঝায়। কবির কাব্যে ঝুলন আর এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার পদসংখ্যাও কম। তথাপি উভয়সাহিত্যের মধ্যে এক ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে—

"নওল নওলী নব রঙ্গমে
দোউ ঝুলত প্রেম তরঙ্গমে॥'

× × ×

সুখ শোহিনী সব সঙ্গমে
রস মাধুরী ধরু অঙ্গমে॥"

অথবা "আজ রাধাশ্যাম রঙ্গেতে ঝুলে
মণিময় নব হিন্দোলা সাজাইয়া
বংশীবট তটে কালিন্দী কূলে। নরহরি সরকার।

তুঃ সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন জাগে মনে ভুলোনা॥" গীতবিতান।

× × ×

অথবা— "মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাসিয়া
মারিবে ঠেলা—
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা। ঝুলন / সোনারতরী।

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'ঝুলন' হইতেছে শক্তি ও শক্তিমানের লীলা বিলাস। কিন্তু কবির 'ঝুলন' কবিতার ঝুলন হইতেছে প্রাণরূপিনীর সঙ্গে খেলা। রাধাকৃষ্ণ একই দোলায় দোল খাইতেছেন, পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কায় রাধা-কৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিতেছেন ; এবং তাহার দ্বারাই নিজেদের প্রেমকে নূতন করিয়া জাগ্রত করিতেছেন। তেমনি মরণের সঙ্গে ঝুলন খেলাতে কবি আপনার প্রাণকে উপলব্ধি করিতেছেন।

প্রোষিত ভর্তৃকা

নায়ক দূরদেশে গেলে নায়িকা যখন তাঁহার আগমনের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তখন সেই নায়িকাকে বলা হয় প্রোষিত ভর্তৃকা নারী। নায়ক কৃষ্ণ

চলিয়া গিয়াছেন, নায়িকা রাধা তাঁহার আগমনের পথের দিকে তাকাইয়া আছেন।

পদাবলী সাহিত্যে পাই—

"পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা
পিয়া বিনে মধু নাখায় ঘুরি বুলে তারা
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া।" গোবিন্দ দাস

অব মথুরাপুর মাধব গেল
গোকুল মাণিক কো হরিলেন
গোকুল উছলল করুণা রোল
নয়নের জলে দেখ বহয় হিলোল
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি। বিদ্যাপতি।

শ্যামরে নিপট কঠিন মনতোর
বিরহ সাথী করি সজনী রাধা
রজনী করতহি ভোর
একলি নিরল বিরল পর বৈঠত
নিরখত যমুনা পানে
বরখত অশ্রু, বচন নাহি নিকসত
পরান থেহ ন মানে।"

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ৪

বৃন্দাবন সুখ সঙ্গ
নব নগরে সখি নবীন নাগর
উপজল নব নব রঙ্গ
ভানু কহত—অয়ি বিরহকাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ।

মুগধা বালা, বুঝই বুঝলি না
হমার শ্যামক লেহ।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী / ১৭

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবী রাতি ?
দখিনা বাতাসে কেহ নাই পাশে সাথের সাথি।
চারিদিক হতে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায় —
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে, বিকচে ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ আসিলে ভুলে ?

মানসী / ভুলে।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর আগের মতো
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা জীবন হত।
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কিনা —
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,

× × ×

কে জানে সে ফুল তোলে কিনা কেউ ভরি আঁচোর
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কিনা সারা প্রহর।"

ভুলভাঙা / মানসী।

সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা
অন্ধ বিভাবরী সঙ্গ পরশ হারা।
চেয়ে থাকি সে শূন্যে অন্যমনে
হেথায় বিরহিনীর অশ্রু
হরণ করিছে ঐ তারা। প্রকৃতি / গীতবিতান।

ভাবোল্লাস

বিরহিণী রাধা বিরহবিধুরা হইয়া কল্পনায় কৃষ্ণ সমাগমের অভ্যর্থনায় আপনাকে প্রস্তুত করিতেছেন। এই প্রস্তুতির জন্য এবং ভাবনেত্রে কৃষ্ণ-দর্শন

জনিত যে উল্লাস তাহাই ভাবোল্লাস বলিয়া পদাবলী সাহিত্যে কথিত। বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে দেহ, কৃষ্ণ-বিলাসের দেহ।

"The human body is the highest temple of God" এই বাণীটিও রবীন্দ্র কাব্যে সার্থকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে
বেদি করব হাম আপন অঙ্গনে
ঝারু করব তাহে চিকুর বিছানে
জব হরি আওব গোকুল পুরে।" বিদ্যাপতি।

× × ×

আলিপন দেওব মোতিব হার
মঙ্গল কলস করব কুচভার
সহকার পল্লব চুচুক দেব
মাধব সেবি মনোরথ নেব।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পরতেক
লোচন লোরে অভিষেক। বিদ্যাপতি।

তুঃ আজ মনে হল কারে পেয়েছি কারে যে
পেয়েছি সে কথা জানি না।
আজ কী লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সারা আকাশের আঙিনা কিসে যে
পুরেছে শূন্য জানি না। রবীন্দ্রনাথ

অথবা

"তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা।"

অথবা

তোমার সে ভালো লাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
আজি আমি একা একা
দেখি দুজনের দেখা
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি
আমার তারায় তব মুগ্ধ-দৃষ্টি আঁকি। স্মরণ

সম্ভোগ

প্রিয়তম দর্শন ও আলিঙ্গন প্রভৃতির জন্য নায়িকার যে অবস্থা হয় তাহাকেই সম্ভোগ বলে। বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনে সম্ভোগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—১) মুখ্য ২) গৌণ। এই সম্ভোগকেই আবার বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান। রাধার মধ্যে সম্ভোগের যে প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা রবীন্দ্র সাহিত্যে নাই। কিন্তু সম্ভোগের মুখ্য তত্ত্বটি রবীন্দ্রসাহিত্যে যে-ভাবে রূপায়িত হইয়াছে তাহা অনুপম এবং অননুকরণীয়ও বটে।

একথা ঠিক—মহাকবি কালিদাস, বৈষ্ণব পদকর্তা এবং রবীন্দ্রনাথ দেহাশ্রয়ী প্রেমকে কাব্যের মধ্যে চিত্রিত করিলেও মুখ্যতঃ তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল ভোগাতীতের পথে। রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল'এ এই ভোগ হইতে ভোগাতীতের অন্বেষণে, 'রাজা ও রাণী' নাটকে ভোগ হইতে কর্মের দিকে মন স্থাপন ও পুরস্কারের প্রেমের মিলন চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রেম-সাধনা করাই ছিল তাঁহার কাব্যময় জীবনের চরম ও পরম ইচ্ছা; সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ।" সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ সম্ভোগের মধ্য দিয়াই সসীম সৌন্দর্য ও অসীম, অনন্ত সৌন্দর্যকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন।

দেহগত সৌন্দর্যকে কবি প্রথম জীবনে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই ; তাহার বহু নিদর্শন 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী' কবিতার মধ্যে আছে। বৈষ্ণব-পদকর্তারা দেহ কামনা যে ভাবে করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ ভাবে করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আসক্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিরাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যাহা বৈষ্ণব-পদকর্তারা করেন নাই—

"আমার এ দেহ মন চিররাত্রি দিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।"

দেহের মিলন, কড়ি ও কোমল।

অথবা— "মেশে দোঁহে তবুও মেলেনা তিলেক বিরহ বহে মাঝে
চেনা বলে মিলিবারে চায় অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ
দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি মাঝে যেন শরমের হাস
দুখানি অলস আঁখিপাতা, মাঝে সুখ স্বপন আভাস

ক্ষণিক মিলন / কড়ি ও কোমল।

'চিত্রা'র 'রাত্রে ও প্রভাতে', 'সোনার তরী'র 'ঝুলন' প্রভৃতি কবিতায় সম্ভোগের স্থূল রূপটি প্রকটিত। কিন্তু কবি ধীরে ধীরে রূপ হইতে অরূপের পথে যাত্রা সুরু করেন।

মিলন

'মিলন' বৈষ্ণব পদাবলীর একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। রবীন্দ্র সাহিত্যের এই পর্যায়ের বহু কবিতা আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মিলন হইতেছে জীবন-দেবতা তথা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের মূলতত্ত্বটির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা কবির একান্তভাবে নিজস্ব। কোনো তত্ত্বদৃষ্টির আওতার মধ্যে ফেলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'মিলন' এর কবিতাগুলি চয়ন করিয়া যদি ক্রম অনুসারে সাজান যায় তাহা হইলে একটি অনুপম লাবণ্যময় চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। মিলনের সময় সমাগত —

"গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি লগন রে
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
সোনার গগন রে।"

মিলন নাট্যে প্রকৃতিও যেন সব সাজে সজ্জিতা। বাতাস মিলনের বার্তা লইয়া আসিয়াছে—

"যেন সময় এসেছে আজ
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ
বাতাস আসে হে মহারাজ
তোমার গন্ধ মেখে। গীতাঞ্জলি।

মিলন-লগ্ন উপস্থিত, এখন সাজ-সজ্জা করিতে হইবে, কিন্তু সাজাইবে কে?

"বেলা শেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নব মিলনের সাজে
সারা হল কাজ মিছে কেন আজ
ডাকো মোরে আর কাজে। খেয়া।

অন্যকাজে যাবার সময় নাই, কবির জীবনদেবতা আসিতেছেন সংবাদ আসিয়াছে, অতএব বাসর সজ্জা প্রস্তুত করিতে হইবে—

"এখন নিরিবিলি ঘরে সাজাতে হবে রে
বাসক শয়ন যে
ফুল সেজ লাগি রজনীগন্ধা
হয়নি চয়ন যে।
সারা যামিনীর দীপ সযতনে
জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে
যূথীদল আনি অবগুণ্ঠন খানি
করিব বয়ন রে

সাজাতে হবে যে নিবিড় রাতের
বাসক শয়ন যে।" খেয়া।

সজ্জা ও প্রসাধনের পূর্বে স্নানের প্রয়োজন—

"স্নান করে আয় এখন তবে
প্রেমের বসন পরতে হবে
সন্ধ্যা বনের কুসুম তুলে
গাঁথতে হবে হার
ওরে আয় সময় নেই যে আর। গীতাঞ্জলি।

যদি সাজ-সজ্জা করিতে পাওয়া না যায় তবে সাজ-সজ্জা না করিয়াই আসা দরকার, অথবা অর্ধ সজ্জাতেই আসা দরকার, কারণ 'মিলনলগ্ন' সমাগত —"মা কুরু বিলম্বনম্"

"অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল করবী বাঁধিয়ো

× × ×

এসো এসো বিনা ভূষণেই
দোষ নেই তাতে দোষ নেই।

অথবা — "যেমন আছো তেমনি এসো আর করোনা সাজ
বেণী না হয় এলিয়ে রবে, সিঁথে না হয় বাঁকা হবে
নাইবা হল পত্রলেখার সকল কারু কাজ।" ক্ষণিকা।

কবি সাজ-সজ্জা না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলেন। জীবন দেবতা কবির সংগে মিলিত হইবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু কবি তখন—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী। গীতাঞ্জলি / ৬১

অথবা— "কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি
আলস ত্যাজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি
উঠিনু যখন তখন গিয়েছে চলে।" গীতাঞ্জলি / ৬৭

বাধ্য হইয়াই কবিকে যাইতে হইল। ঘাটপারে আসিয়া কবি দেখেন ঘাটে তরী বাঁধা। তরণীর কর্ণধার কবিকে বলিলেন— "এসো"—

"আছে আছে স্থান
একা তুমি তোমার শুধু একটি আঁঠি ধান।
না হয় হব ঘেঁষাঘেঁষি এমন কিছু নয় সে বেশি
না হয় কিছু ভারী হবে আমার তরীখান
তাই বলে কি ফিরবে তুমি? আছে আছে স্থান।
এসো এসো নায়ে
ধুলো যদি থাকে কিছু থাক্‌না ধুলো গায়ে
তনু তোমার তনুলতা চোখের কোণে চঞ্চলতা
সজলনীল জলদবরণ বসনখানি গায়ে
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই
এসো এসো নায়ে।' যাত্রী / ক্ষণিকা।

'সোনারতরী'র সোনারতরীতে কবি একদিন আবেদন জানাইয়াছিলেন—

"সবলই দিলাম তুলে থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে।"
কিন্তু তখন ঠাঁই ছিল না
"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরি
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

'সোনার তরী'তে যে অকৃতার্থ ছিল, আজ তাহা চরিতার্থ লাভ করিয়াছে। কবি তরীতে স্থান লাভ করিয়া বলিলেন—

"বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখনা তরী।"

তরী খোলা হইল ; কবি জীবন-দেবতাকে প্রতিবেদন জানাইলেন—

"এসো এসো এসো প্রাণ হয়ে মোর
হৃদয় মাঝারে।" গীতিমালা

× × × ×

"তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে
এসো গন্ধ বরণে এসো গানে।" গীতাঞ্জলি।

অধরা ধরা দিলেন, মিলন হইল। কবির মন আনন্দে ভরপুর—

তোমার মুখ চাহিয়ি শত যুগ ভয় দুখ
নিমিষে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তোমার দূরে করল রে
সকল মান-অভিমান।
জুড়ালো জীবন জুড়ালো আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো।"

তবুও ভয়— বিচ্ছেদ আসিবে ঃ যেমন রাধাকৃষ্ণ ভাবিয়াছেন— "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

তাই কবি বলিয়াছেন—

"যেতে দাও গেল যারা
তুমি যেয়োনা যেয়োনা
আমার বাদলের গান হয়নি সারা
কুটীরে কুটীরে বন্ধদ্বার নিভৃত রজনী অন্ধকার
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল, অধীর সমীর তন্দ্রাহারা
দীপ নিভেছে নিভুক নাকো
বাজুক কাঁকন তোমার হাতে আমার গানের তালের সাথে
যেমন নদীর জল ছল ছল ঝর ঝর ঝর শ্রাবণ ধারা।
তবুও বিদায় নিতে হইল, বিদায় বেলা
বসন্ত রজনী শেষে বিদায় নিতে গেলাম হেসে
যাবার বেলায় বঁধু আমার কাঁদিয়ে কেঁদেছে।"

বাৎসল্য রস

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাল-কৃষ্ণ ও মা যশোদাকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হইয়াছে। রবীন্দ্র কাব্যেও বাৎসল্য রসের কিছু সংখ্যক পদ আছে। চিত্রার 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় বাৎসল্য রসের একটি নূতন দিক কবি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। শিশু হৃদয়ের মধ্য দিয়া কবি বিশ্বজগতের সৃষ্টির বেদনা-ব্যাকুল রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। চঞ্চলকে ধরিয়া রাখিবার ব্যাকুলতা, স্নেহাস্পদকে নিজের কাছে রাখিয়া দিবার যে বাসনা, তাহারই নিখুঁত আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গীটি পৃথক ধরণের। কবি 'শিশু-কাব্যে' নিখিল বিশ্বের মধ্যেই যেন শিশুকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাই কবি বলিয়াছেন—

নিখিল শোনে আকুল মনে নূপুর বাজনা
তপন শশী হেরিছে বসি তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে নয়ন-মাজনা।

খেলা / শিশু

পদাবলী-সাহিত্যের শিশু ও রবীন্দ্র সাহিত্যের শিশু এক নহে। রবীন্দ্রনাথের শিশু — 'ভাব-শিশু' এই শিশুকে অনুভব করিতে পারা যায় — কিন্তু ধরা বড় কঠিন। পদাবলী সাহিত্যের শিশু কৃষ্ণ অসীমের মধ্যেও সীমায়িত হইয়া ধরা দিয়াছেন, এবং মানবমেলারই শিশু; যশোদার নয়নের মণি, বুকের ধন। শিশুরা যেমন নিজে দোষ করিয়া সেই দোষ

অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করে, পদাবলী সাহিত্যের বাল-কৃষ্ণ ঠিক তাহাই করিয়াছেন। কৃষ্ণ দৈ-মাখন চুরি করিয়া খাইয়া ধরা পড়িয়াছেন অথচ তিনি চুরির অভিযোগ অস্বীকার করিয়া গোপীদের স্কন্ধে সেই দোষ চাপাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র বাৎসল্য রসের কিছু সংখ্যক কবিতায় বৈষ্ণব-পদকর্তাদের গভীর আধ্যাত্মিক ধ্বনি শোনা যায়—

"বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর
ঝিনুক নিয়ে খেলা
বিপুল নীল সলিল পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায় গাঁথে ভেলা।"

'শিশু'র কবিতাগুলিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—
১) বাৎসল্য তত্ত্বাশ্রিত ২। তত্ত্ব ও রসঘটিত ৩) শিশু বোধ
৪) শিশু-কল্পনা।

প্রথম শ্রেণীর কবিতাতে পাই জন্মকথা—

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে, 'এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'
মা শুনে হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে—
'ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে॥
'ছিলি আমার পুতুল খেলায়, ভোরে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।"
× × × ×
তুই আমার ঠাকুরের সনে ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি॥

'খোকার রাজ্য এবং "ভিতরে ও বাহিরে" কবিতা দুইটি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাতে পাই— খেলা, খোকা, বিচার, চাতুরী, কেনমধুর, ঘুমচোর, অপযশ প্রভৃতি কবিতাগুলি।

খেলা : "তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া,
কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া !
বিহান-বেলা আঙিনাতলে এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া ॥
কিসের সুখে সহাস-মুখে নাচিছ বাছনি,
দুয়ার পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি !"

কেন মধুর : "রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝিরে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রঙ ওঠে জেগে,
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে ॥"

চাতুরী : "মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তার কী আকুলতা
তাকাই তাই বোবার মতো
মায়ের মুখচাঁদে।"

প্রশ্ন, সমব্যথী, ব্যাকুল, সমালোচক, জ্যোতিষশাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক, তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা।

সমব্যথী : যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর ছানা—
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে চাই ভাতে
তুমি করতে আমার মানা ?

বিচিত্র, মাস্টারবাবু, বিজ্ঞ, বীর-পুরুষ, রাজার কড়ি, মাঝি, নৌকা, যাত্রা, লুকোচুরি প্রভৃতি কবিতা চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। শিশু মনের অপূর্ব রহস্য দেখিতে পাই এই কবিতাগুলিতে—

বীর পুরুষ ঃ

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে, মা, চ'ড়ে

× × ×

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়া দিঘির মাঠে।

× × ×

এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে'
ওই-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে!

× × ×

'আমি আছি, ভয় কেন, মা, কর!'

× × ×

ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা॥

× × ×

দাদা বলত, 'কেমন করে হবে.
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে!'
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

লুকোচুরি ঃ

আমি যদি দুষ্টুমি করে চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি

× × ×

তখন কি, মা, আমায় চিনতে পারো?

'সোনারতরী'র আকাশের চাঁদ শীর্ষক কবিতায় বাৎসল্য রসের অপূর্ব নিদর্শন পাই—

"হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ
এই হল তার বুলি
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া
কাঁদে যে দু-হাত তুলি।

× × ×

বালক বালিকা ভাই বোনে মিলে
খেলিছে আঙিনা কোণে
কোলের শিশুকে হেরিয়া জননী
হাসিছে আপন মনে।

চৈতালীর 'করুণা' শীর্ষক কবিতায় শিশুর জন্য নারী-হৃদয়ের চরম ও পরম আকুতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—

"হেনকালে দোকানির খেলা-মুগ্ধ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে ছুটে বাহু মেলে।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি,
পাষাণকঠিন পথ উঠিল শিহরি।
সহসা শূন্যে উঠিল বিলাপ কাহার—
স্বর্গে যেন মায়াদেবী করে হাহাকার।
ঊর্ধ্ব পানে চেয়ে দেখি স্খলিত বসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।"

'পঞ্চভূত' এর মনুষ্য শীর্ষক নিবন্ধে কবি বলিয়াছেন—"যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে অনন্তের পরিচয় পাই। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া এই ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে

সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।"

'গোরা' উপন্যাসের হরি-মোহিনীর মুখ দিয়া কবি অনুরূপ উক্তি করাইয়াছেন—'ও আমার গোপীবল্লভ, আমার জীবন-নাথ, আমার গোপাল, আমার নীলমণি। বাবা তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই, এদুটিকে রাধারাণী আর সতীশকে পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের পুজো আমি মনের সঙ্গে করতে পেরেছি, এরা যদি যায় তবে আমার ঠাকুর তখনি কঠিন পাথর হয়ে যাবে।'

এই কথাগুলির মধ্যে যে আর্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যশোদার আর্তির অনুরূপ। এই আর্তির জনাই যশোদা বলিয়াছেন—

"আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি"

—o—

—ঃ ষোড়শ অধ্যায় ঃ—

বৈষ্ণব-মানস

রবীন্দ্র সাহিত্যকে, কালগত হিসাবে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে – ১। ১২৮৭-১৩১২ সাল ২। ১৩১৩-১৩২১ সাল ৩। বলাকার কাল। এই যুগ তিনটির রচনা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথম স্তরের রচনায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় স্তরের রচনায়, কবি পদাবলীর ভাব-মাধুর্যকে স্বকীয় অননুকরণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই যুগের রচনায়, যদিও পদাবলী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট নহে তথাপি পরোক্ষ প্রভাব যে সুস্পষ্ট তাহা অস্বীকার করা চলে না। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য-গীতালি সম্পর্কে বলিয়াছেন—"...... বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ বৃন্দাবনের পরিবেশের কোন ইঙ্গিত এই কাব্যত্রয়ে দেন নাই। রাধাকৃষ্ণ নাম দূরে থাকুক, কোথাও যমুনা, কদম্বতল প্রভৃতি বৃন্দাবন-লীলায় উদ্দীপক কোন শব্দও তিনি ব্যবহার করেন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীর সাধারণ মর্মকথা তাঁহার মনের মধ্যে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে বাহিরের কোন প্রতীক দিয়া আর তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এযুগের রচনায় বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকিলেও, অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়—ভগবানকে লইয়া অনুরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহের কবিতাগুলিতে। আর তাহার চেয়েও বেশী প্রভাব দেখা যায় নামের মাধুর্য ঘোষণায় ও ব্রজের ভাব প্রাপ্তির লালসায়।" ডঃ মজুমদারের উক্তিকে অনুমোদন করিয়া শ্রীবিনয় গোপাল রায় তাঁহার রচিত "Philosophy of Rabindra Nath" শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"Gitanjali, the Gitali and Gitimalya are the beads on Vaisnava rosary."

তৃতীয় স্তরের রচনায় কবি পদাবলীর পরিবেশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্তর সম্পর্কে ডঃ বিমান বিহারী বলিয়াছেন—"বলাকার রচনাকাল হইতে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত, এই ছাব্বিশ বৎসরকাল রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয় ভাবধারা ও সাধন-প্রণালী তটস্থ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং পদাবলীর ছন্দ, ভাব ও বিষয় যতটা সম্ভব বর্জন করিয়াছেন।"*

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি—যে যখনই যেখানে কোনো কিছু দৃষ্টান্তকে দাঁড় করার প্রয়োজন, তখনই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলী হইতে দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন। এবং এই উদ্ধৃতি সংখ্যা এত বেশি যে তাহা দেখিলে মনে হইবে যে তিনি পদাবলী সাহিত্যের পরিবেশকে কোনো দিনই ভুলিতে পারেন নাই; এবং তাঁহার অন্তরে পদাবলীর বাণী, পদাবলীর ভাবধারা সর্বদা জাগ্রত ছিল—

গল্প গুচ্ছ

"ছোট ছোট কোমল পাগুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায় তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়, মনে হয়, উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

"যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাতা
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু-গাতা।"

পদকর্তা গোবিন্দ দাসের শ্রীরাধা তাঁহার কান্তার চরণের পরশ পাইবার এবং কঠিন মাটির আঘাত হইতে পরাণ প্রিয় কৃষ্ণকে বাঁচাইবার জন্য দয়িতের পায়ের তলায় নিজের কোমল দেহ বিছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের "রাজপথের কথা" গল্পে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আঘাত হইতে রক্ষার জন্য কোমল হইতে চাহিতেছে। বাৎসল্য রসে যেন ভরপুর।

*ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলী" শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন— "এই পঁচিশ বৎসরের রচনায় পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।"

"কবি যে গানগুলি গাহিতেছে তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধাকৃষ্ণ সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ।

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়াছিলেন— বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে তখনো গোপিনীরা জানে না................"

—জয় পরাজয়

"কিরণ যদি সহজ সুরে বলিত মহীন্দ্র বাবু কাল সকাল সকাল আসবেনতো, তাহার মধ্যে ছন্দ লয়ে বাজিয়া উঠিত—

কী মোহিনী জান বন্ধু কী মোহিনী জান
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।"

— অধ্যাপক

ভাবী বধূর নাম শুনে নায়কের—

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল প্রাণ।"

—দর্পহরণ

এই গল্পে গুরু ঠাকুরের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বোষ্টমী বলিয়াছে—"তাহার সেই দূর বিহারী চক্ষু দুইটি বহুদূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুণ গুণ করিয়া গাহিল—

অরুণ কিরণ খানি অমৃত ছানি
কোন বিধি নিরমিল দেহা।"

এ যেন রাধার রূপের বর্ণনা। এই গল্পে বোষ্টমীকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও সাধনার যে সুগভীর তাৎপর্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

—বোষ্টমী।

বিভার সখি বলিয়াছেন—

"মরি, মরি, তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।"

—রবিবার

উপন্যাস

হরিমোহিনী গোরার রূপভাবনা প্রসঙ্গে বলিলেন—
"কীর্তন গানে শুনেছি—

চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাঁটিয়া
কে মাজিল গোরার দেহখানি।"

আবার উল্লেখ করিয়াছেন—

"চিকন কালিয়া রূপ মরমে লেগেছে গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া
কত চাঁদ নিঙ্গারিয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি কতেক সুধা দিয়া।" —গোরা।

"ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" এই পদটি নিখিলেশ তাঁহার ডায়েরীতে তিনবার লিখিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থার কথাই পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। মেজো জা বিমলাকে খুব সকালে বৈঠকখানা যাইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন 'এত সকালেই—গোষ্ঠী-লীলা বুঝি?' বিমলা কোন জবাব না দিয়াই চলিয়া যান, তখন মেজো জা গান ধরিলেন—

রাই আমার চলে যেতে
ঢলে পড়ে।

সন্দীপ বিমলার কাছে টাকা চাইলে, বিমলা একটা গানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব। যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল—

"বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্ত্যে তিন ভুবনে নাই কো যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে
সবার কানে বাজবে না সে
দেখলো চেয়ে, যমুনার ওই ছাপিয়ে গেল কূল।"

পদাবলীর অনুকরণে এই গানটি কবি রচনা করিয়াছেন।

সন্দীপের Philosophy of life সম্বন্ধে বা জীবনদর্শন সম্বন্ধে এবং বিমলার মনে তাহার প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথ বাউল-বৈষ্ণব-পদ্ধতিতে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে
আমার ঘর বলে তুই কোথায় যাবি
বাহির গিয়ে সব খোয়াবি
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব থাকনা উরে পড়ে।"

—ঘরে বাইরে

বিবাহের কথা শুনিয়া কুমুদিনীর মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল কবি তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগত, জানতাম না তার অর্থ কি ? সেই ব্যথায় সন্ধ্যাবেলাকার রঙের পথের গোধূলি ধূলিতে ও স্বপ্ন রাঙা হয়ে উঠেছে, যে ছিল অভিসারিণী তার মানস বৃন্দাবনে ভোরে উঠে যে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিণীতে।"

× × ×

"বিপ্রদাসকে দেখিয়া মোতির মার মনে হয়েছিল— আহা কি সুপুরুষ। এমন কখনো চোক্ষে দেখিনি, এ যে গান শুনেছিলেম কীর্তনে—

"গোরার রূপে লাগল রসের বান
ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর প্রাণ।"

—যোগাযোগ

"বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ ?
সকলি আমার স্বপন বলে হতেছে বিশ্বাস।"
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেছিলে সেখানেতো আদর মিলে ?
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ।"

এ উপন্যাসে আরও পাই—

"ভিক্ষা যদি দেবে রাই
(আমার) সোনা-রূপায় কাজ নাই

(আমি) প্রাণের দায়ে এসেছি যে
মানরতন ভিক্ষা চাই।"

—বৌঠাকুরাণীর হাট

বৈষ্ণব-সাধনার 'পরকীয়া তত্ত্ব' রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে যে ভাবে রূপান্তর লাভ করিয়াছিল, তাহার নিখুঁত আলেখ্য পাই 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে।

—শেষের কবিতা

'সহজ-সাধনা বা রসসাধনার সাহায্যে বাউল-বৈষ্ণব সাধকগণ উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি আনন্দ-লাভ করিয়াছিলেন। এই সাধনা কঠিন, নিম্নতর সাধকের পক্ষে বিপজ্জনক, দামিনী ও শচীনের টানা পোড়নের মধ্য দিয়া এই সাধনায় বাস্তব রূপে ও আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হওয়ায় দ্বন্দ্বটি কবি পরিস্ফুট করিয়াছেন।

দামিনীর উক্তি — "তোমারি চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি"
চণ্ডীদাসের বাণীকে বার বার স্মরণ করায়।

— চতুরঙ্গ

ব্যঙ্গ-কৌতুক

"বিধাতা কি সকাল বেলা এই জন্যই কি ডান চোখ নাচিয়ে ছিল? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত।" তাই কবি কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন—

"সখি কি মোর করম ভেল
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
'খানার' বদল 'বিল' হায় অদৃষ্ট"।

প্রবন্ধ

এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন— "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর মুখে চাহিয়া আছি। × × আমরা যেন কোন এককালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি।

তাই বৈষ্ণব কবি বলেন— "তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।"

—মেঘদূত

ব্যোম 'কচ ও দেবযানী'র আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই পদটি উদ্ধৃত করিয়াছে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

সাহিত্যের পথে (তথ্য ও সত্য) এই প্রবন্ধেও কবি তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল" পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে কবি "শারদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ। (গোবিন্দ দাস)

এবং "রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।"

জ্ঞানদাস এর পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

—পঞ্চভূত

সাহিত্য তত্ত্ব

এ প্রবন্ধেও কবি তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু' পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিচিত্র প্রবন্ধ (কেকা ধ্বনি)

এই প্রবন্ধে কবি বিদ্যাপতির—

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।" উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন —এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে ঘন বর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। এইরূপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন কালিমা লিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে।"

সাহিত্য (সাহিত্য সৃষ্টি)

এই প্রবন্ধে কবি বলিয়াছেন—"যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি, অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটি মাত্র ভাবের বিকাশ ওই যেমন বিদ্যাপতির—

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

শান্তিনিকেতন পত্রিকা

শান্তিনিকেতন পত্রিকার একাদশ খণ্ডের 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি বিদ্যাপতির এই পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়িব
হরিবিনে দিন রাতিয়া।"

সমাজ (ব্যাধি ও প্রতিকার)

এই প্রবন্ধে কবি— "ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

এবং "যে ঝাড়ের তরল বাঁশি তারি লাগি পাও
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও।"

উদ্ধৃত করিয়া কবি তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন।

স্বদেশী সমাজ (আত্ম শক্তি)

এই প্রবন্ধে তিনি "ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর" পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শব্দতত্ত্ব

শব্দতত্ত্বের নিছক কচ্‌কচানির মধ্যেও তিনি গোবিন্দ দাসের বৈষ্ণব-পদ উদ্ধৃতি করিয়াছেন—

"নব রঙ্গিনী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিনী মোহিনীরে।"

নাটক (প্রকৃতির প্রতিশোধ)

এই নাটকে কবি বৈষ্ণবী ঢং-এ পদ রচনা করিয়াছেন—

"হেদে গো নন্দরাণী
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও"

কৃষকদের মুখে গোষ্ঠের এই গানটি কবি দিয়াছেন।

স্ত্রীলোকেরা রাধার মানকে স্মরণ করিয়া সেই অনুসরণে বলিয়াছেন—

"বলি কথা কসনে রাই
শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে"

এ ছাড়া এই নাটকের বৌ-ঝি-চাষা-পথিক সকলের মুখেই এই গানটি দিয়াছেন—

'মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।'

মায়ার খেলা

এই নাটকে গানগুলি পদাবলী-সাহিত্যের অনুসরণে লেখা—

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলেনা
শুধু চলে যায়, এমনি মায়ার ছলনা।"

স্মরণ করায়— সুখের লাগি যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

রাজা ও রাণী

এই নাটকে ইলা বলিয়াছে—

ভুলে যদি সুখী হয় সেই ভালো
ভালোবেসে যদি সুখী হয় সেও ভালো।

অথবা

'আমি সারা নিশি তোমার লাগিয়া
রব বিরহ শয়নে জাগিয়া
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখ পানে চেয়ে হাসিয়ো।''

মুগ্ধ অনভিজ্ঞা নায়িকা বলিতেছে—

''সখি ভালোবাসা কারে কয় ?
সেকি কেবলি যাতনা ময় ?

এই গানটি চণ্ডীদাসের এই পদটি—

''সদা জ্বালা যার তবে সে তাহারে
মিলয়ে পিরীতি'' কে স্মরণ করায়।

গোড়ায় গলদ

এই নাটকে চন্দ্রকান্ত তাহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু" পদটি উদ্ধৃত করিয়াছে।

প্রজাপতির নির্বন্ধ

রসিক বলিয়াছে— "সখা কি মোর করমে লেখি
তপত বলিয়া তপনে ডরিনু
চাঁদের কিরণ দেখি।"

ইহা— "সখী কি মোর করমে লেখি
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি" কে স্মরণ করায়।

রাজা

রাজা-সুদর্শনার বিরহ-মিলন যেন বৈষ্ণব-ভাবনায় রাধা-কৃষ্ণের অভিসার। "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম" এই নাটকের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। অপিচ ঠাকুর্দা যেন সখ্যরসের এবং সুরঙ্গমা দাস্যরসের সাধক ও সাধিকা।

ফাল্গুনি

"তোমায় নূতন করে পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণে।"

গানটি 'রাস' হইতে সহসা কৃষ্ণের অন্তর্ধান, গোপীদের অনুসন্ধান ও পুনর্ম্মিলনের কথা স্মরণ করায়।

রক্তকরবী

নন্দিনীর— "ভালো বাসি ভালো বাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি"
বৈষ্ণব-পদাবলীর পরিবেশকে স্পষ্টতই স্মরণ করায়।

শাপমোচন

"জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি-হতে ঘুম নিল হরি
যার লাগি ফিরি একা একা
আঁখি পিপাসিত, নাহি দেখা
তার বাঁশি ওগো তার বাঁশি
তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি"

এরমধ্যে বৈষ্ণবীয় সুর ও ঢংটি বিদ্যমান।

—o—

—ঃ সপ্তদশ অধ্যায় ঃ—

(সমন্বয়)

উপনিষদের রসে রবীন্দ্র কবি-মানস সিক্ত হইলেও রবীন্দ্রকাব্যধারায় বৈষ্ণবীয় ভাব ও ভঙ্গি উপেক্ষণীয় নহে। এই সঙ্গে বাউল, বৌদ্ধ প্রভাবও লক্ষণীয়।

পদাবলী সাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য দুর্লক্ষ্য নহে। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব মূলতঃ সাম্প্রদায়িক এবং গোষ্ঠী বিশেষের সন্দেহ নাই, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে এ তত্ত্ব মূলতঃ কোনো সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বিশেষ অন্যায় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে না।

সাহিত্য হিসাবে পদাবলী সাহিত্যের মূল্যায়ণ করিলে বলিতে হয়—ইহা মূলতঃ বিরহের কাব্য। এই বিরহের প্রকাশ ঘটিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে, নাম শ্রবণে, গুণ কীর্তন শ্রবণে, চিত্রপট দর্শনে এবং বংশীধ্বনি শ্রবণে—

নিতি নিতি ডাকে বাঁশি
রহিতে নারি ঘরে
মরমে সন্ধান দিয়ে
হৃদয় বিদরে।"

Our sweetest songs are those that tell us saddest thought—পদাবলী Sweetest song এবং Saddest thought এ পরিপূর্ণ। রবীন্দ্র সাহিত্যেও রহিয়াছে Saddest thought বা বিরহ। তাই পদকর্তাদের মত রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—

"কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো
ঘরে যে আর রইতে পারিনে"

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি যেমন রাধাকে গৃহ ছাড়া করিয়াছে তেমনি কবির জীবন-দেবতাও কবিকে ঘর ছাড়া করিয়াছে।

সাহিত্যের কারবার মানব-জীবন লইয়া এবং ইহার মূল প্রতিপাদ্য হইতেছে নর-নারীর বিরহ-মিলন কথা। তাই রাধা-কৃষ্ণের বিরহ-মিলন-গাথা শুধু বৃন্দাবন বা পদাবলীর বিষয়বস্তু নহে, তাহা শুধু বাঙ্গালা দেশের বা ভারতবর্ষের নহে—তাবৎ বিশ্বের বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকলের।

রবীন্দ্রনাথ 'গ্রাম্য সাহিত্য' শীর্ষক নিবন্ধে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ-রাধার বিরহ মিলন সমস্ত-বিশ্ব-বাসীর বিরহ-মিলনের আদর্শ, ইহার মধ্যে ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মণ সমাজ বা মনুসংহিতা নাই।" তিনি উক্ত নিবন্ধে আরও বলিয়াছেন—"নর-নারীর প্রেমের মধ্যে একটা মোহিনী শক্তি আছে, সেই শক্তিকে যুগে যুগে দেশে দেশে মনুষ্য আধ্যাত্মিক শক্তির রূপক বলিয়া অনুভব ও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ সলোমন, হাফেজ এবং বৈষ্ণব পদাবলী।"

মানব-চরিত্রে প্রেমের দুইটি রূপ— প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। ভোগের মধ্যে প্রাকৃত প্রেম নিহিত এবং ত্যাগের মাহাত্ম্যের মধ্যেই অপ্রাকৃত প্রেম মূর্ত। প্রাকৃত প্রেম কাছে টানে, অপ্রাকৃত প্রেম দূরে সরাইয়া দেয়। পদাবলী-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-কাব্য অপ্রাকৃত প্রেমের কাব্য। প্রকাশ ভঙ্গির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় কাব্যের মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে। লৌকিক প্রেমে কুল, মান, আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতির মধ্যে একটি দুরন্ত শাসন আছে, কিন্তু অলৌকিক প্রেমে সেই শাসন পথ রোধ করিতে পারে নাই—

'ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি
কিবা করিবে বাপ মায়ে।

জাতি জীবন ধন এ রূপ যৌবন
নিছনি ফেলিব শ্যাম পায়।
সম্মুখে রাখিয়া নয়নে দেখিমু
লইয়া থাকিব চোখে চোখে
হার করিয়া গলায় গাঁথিয়া
লইয়া থাকিব বুকে।"

তবুও বিরহ। বিরহ ছাড়া উপায় নাই। কারণ সৃষ্টির মূলেই বিরহ। যেখানে বিরহ যত তীব্র ও গভীর, মধুরতাও তত সেখানে বেশি। সেখানে চোখের জলও মধুর। বিরহই বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে, ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বের সন্ধান করে। এবং খণ্ড অখণ্ডের সাধনা করে। তাই রাধা কৃষ্ণকে বিশ্বের সর্বত্র দেখিতেন—

"কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনো ব্যথা।"

× × ×

"কালার ভরমে জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ।
যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্ব পানে।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"মিলনে আছিলে বাধা শুধু একঠাই
বিরহে টুটিয়া বাধা আজি বিশ্বময় ব্যপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।"

তাই দেখি খণ্ডিত প্রেম মানুষকে অতৃপ্ত অপ্রসন্ন করায়। ফলে মানবাত্মা ক্রন্দন করিতে থাকে—

"জাবত জনম হাম তুয়া পদ সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।" বিদ্যাপতি।

অথবা ঃ তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম
সুতমিত রমনী সমাজে
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে।" বিদ্যাপতি।

রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পরে পায় হে"
চারি দিকে হেরো ঘিরিছে কারা
শত বাঁধনে জড়ায়ে হে—
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়েনা কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে" পূজা

এ সম্বন্ধে ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ বলিয়াছেন—

"Radha's passionate devotion to Krishna is the symbol of the soul's yearing for God. When Krishna to draw all creation to him. Sings the divine music of his flute, she listens to it and gives up her all for His Sake."

The Philosophy of Rabindra Nath.

তবে একথা অনস্বীকার্য যে মনঃ প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে জাতি বিশেষের প্রেমের প্রকাশ, সৌন্দর্য প্রকাশের আদর্শ ভিন্ন হইয়া পরে। রাধা-কৃষ্ণের গানের সঙ্গে বাঙালি জাতির হৃদয় অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। তাই দেখা যায় রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন গাথা সপ্তশতী, কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়, প্রাকৃত পৈঙ্গল প্রভৃতি প্রকীর্ণ কবিতায় প্রেমের প্রভাব অমোঘ অপরদিকে তেমনি বাঙ্গালাদেশের নর্দ, প্রাক্তারী ও গ্রামীণ রাখালিয়া

প্রেমগীতির সঙ্গেও যোগ নিগূঢ়। এ সম্বন্ধে "গ্রাম্য সাহিত্য" এ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— 'হরগৌরীর বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধা-কৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান।"

বাঙালির সৌন্দর্য চেতনা দেহমুখী হইলেও পরিণতিতে দেহাতীত। তাই পদাবলী সাহিত্যে এবং রবীন্দ্র সাহিত্যে এ দৃষ্টি ভঙ্গিটি প্রোজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"হৃদয় আকাশে থাক্না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।"

রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য সাধনা ও প্রেম সাধনার মধ্যে, বৈষ্ণবীয় ভঙ্গিটির সঙ্গে 'বাউল' এর স্পর্শ লাগিয়াছে। এ সম্পর্কে বিনয় গোপাল রায় বলিয়াছেন— "The faith of love which he gets from the Vaisnavas is strengthened by the Songs of the Bauls and the teaching of Kabir and others."

The Philosophy of Rabindra Nath. Pg. 13.

'বাউলরা বলেন — "ভবে রসিক যারা জ্যান্তে মরা
তারাই যাবে রে পারে।"

বৈষ্ণবেরা বলেন — "জীয়ন্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে সে
সখি কি আর বুঝাও তারে। মুরারি গুপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ বলেন— সকলদাবি ছাড়বি যখন
পাওয়া সহজ হবে।
এই কথাটি মনকে বোঝাই
বুঝবে অবোধ কবে?

'জ্যান্তে মরা', 'জীয়ন্তে মরা' সকল দাবি ছাড়া' একই বস্তু শুধু বলার ভঙ্গিটি পৃথক।

প্রেম-সাধনায় যে দ্বৈতবাদ দেখি তাহা শুধু বৈষ্ণব পদাবলীতে নহে, রবীন্দ্রনাথের নহে, তাহা সর্ব ভারতে। বাউল কবি, সুফীকবি, সহজ কবি দাদু ও কবীরও এই পথের পথিক।

কবীর বলেন— "কৌন মুরলী শব্দ শুন আনন্দ ভয়ো"

অর্থাৎ কোন্ মুরলীর শব্দে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হইল।

রবীন্দ্রনাথেও পাই—

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী"

কবীর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"The one figure which he adapt from the Hindu Pantheon and constantly uses is that of Krishna, the Divine Flute Player"

Kabir's poem—Translated by Rabindra Nath.

পদাবলী-সাহিত্যের নায়িকা শ্রীরাধার আক্ষেপ-উক্তিতে পাই—

"পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইনু
আপন করম দোষে আপনি মরিনু।"

এই পদটি অনুসরণে সন্তকবি দাদুর গীতিতে পাই—

"হুঁ সখ সুতী নীদ ভরি জাগে মেরা পীব
ক্যোঁ করি মেলা হোইগা পরস জাগান জীব।"

আমি সুখে গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম, আমার প্রিয়তম জাগিয়া বসিয়াছিলেন। কেমন করিয়া মিলন হইবে, তাহার স্পর্শেও আমার জাগরণ হইল না? রবীন্দ্রনাথেও অনুরূপ পাই—

"সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি
কিঘুম তোরে পেয়েছিল হত ভাগিনী।"

অথবা

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ যে চাহে ধূপেরে রহি জুড়ে
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।"

তুঃ- কবি দাদুর ঃ—

"বাস কহে হম্ ফুলকো পাউ
ফুল কহে হম্ বাস
ভাব কহে হম্ সৎ-কো পাউ
সৎ কহে হম্ ভাব।
রূপ কহে হম্ ভাব কো পাউ,
ভাব কহে হম্ রূপ
আপসমে দউ পূজন চাহে—
পূজা অগাধ অনূপ।"

বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রেম-সাধনা কি আত্মবিলোপময় জীবন-বর্জিত সাধনা ? বৈষ্ণবীয় প্রেম-সাধনা আত্মবিলোপময় প্রেম-সাধনা বলা যাইতে পারে না। জীবনী সাহিত্য জীবনধর্মী, জীবন-দায়ী সাহিত্য এবং পদাবলী কাব্যে একাধারে সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন।

জাতিভেদে ভাবধারা ভিন্ন হয় একথা অনস্বীকার্য। বাঙালী ভাব-প্রধান জাতি। এর জন্য দায়ী নদীমাতৃক বাঙ্গালাদেশ। বাঙ্গালার হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে যে মধুময় পরিবেশ রহিয়াছে তাহাই বাঙালি জাতিকে যুক্তিপ্রবণ, তত্ত্বমুখী এবং বিজ্ঞানমুখী না করিয়া প্রধানতঃ আবেগধর্মী, ও উচ্ছ্বাসধর্মী করিয়াছে। ফলে বাঙ্গালির সাহিত্যে সেই আবেগ ও উচ্ছ্বাসের নির্ঝর বহিয়া

গিয়াছে। তাই বাঙ্গালার কাব্য— গীতিকাব্য ; বাঙ্গালার কবি— গীতিকবি। একদিকে বাঙ্গালি যেমন আবেগ ও উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ তেমনি অপর দিকে ধর্ম প্রবণতাও বাঙালির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই দুই বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে। তাই বাঙালির গান প্রেমের গান, বাঙালির ধর্ম— প্রেমেরই ধর্ম। এই ধর্ম ও গানের সম্মিলিত বিশিষ্ট রূপ হইতেছে পদাবলী সাহিত্য এবং কীর্তনগান।

কবি সত্যেন্দ্র নাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যত গুলি।"

কীর্তন গান একা শুধু বৈষ্ণবের নহে, অবৈষ্ণবেরও অসংখ্য মুসলমান কবি— বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। এমন কি মজুর শ্রেণীর মেয়েরা সুরকি ভাঙ্গার সময় গায়—

আজকে যদি থাকত আমার শ্যাম
আঁচল দিয়ে বিছিয়ে দিত মুছিয়ে দিত ঘাম॥

বাঙালির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় সেদিন আন্দোলিত হয়েছিল, সেই দিন সহজেই কীর্তন গানে যে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনও সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।"

—যাত্রাবাত্রীর পত্র।

তাই বাঙালি ঘরের কথা বলিয়াছেন হরগৌরীর কাহিনীর মধ্যে এবং ভাবের কথা, রসের কথা, প্রাণের কথা বলিয়াছেন রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী মাধ্যমে। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী শুধু বৈকুণ্ঠের কাহিনী নহে, অকুণ্ঠ চিত্তের গান। 'বৈষ্ণব-কবিতা' শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বৃন্দাবন গাথা এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে এক কি শুধু দেবতার।

এই প্রেম গীতহার
গাঁথা হয় নর-নারী মিলন মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।"

প্রাকৃত প্রেমের উপর ভিত্তি করিয়াই সৃষ্টি হইয়াছে অপ্রাকৃত প্রেমের। তাই দেখিতে পাই পদাবলী-সাহিত্যের মান-অভিমানের মধ্য দিয়া যে মহাজীবনের বিরহ সূচিত হইয়াছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভাব ও রসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সেই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এবং একথাও সত্য যে কবি শুধু প্রয়োজন বশতঃ অরূপ ভাবুকতার রচনায় বৈষ্ণব-পদাবলীর ভঙ্গিকে গ্রহণ করেন নাই—

"ওই যে শব্দ চিনি নূপুর রিণিকি ঝিনি
× × ×
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
× × ×
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ফিরে
× × ×
আমারি এই আঙিনা দিয়ে যেয়োনা"

এ শুধু বৈষ্ণবীয় ভঙ্গীর রচনা নহে, ইহা অতীত প্রেম কাহিনীর নবীকৃত রূপও বটে। বিলাতী পিয়ানোর টুং টাং মাত্র নহে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে যেমন রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীম একই মঙ্গল সূত্রে আবদ্ধ, পদাবলী-সাহিত্যের দ্বৈতরূপও অনুরূপ। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বৈত-অদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে যে মতানৈক্য থাকুক না কেন প্রেম-ধর্ম সাধনায় ইহাই সত্য যে "দুই না হইলে প্রেম হয় না"— তাই রবীন্দ্রনাথও দ্বৈতবাদকে সর্বাংশে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

"There cannot be worship unless we admit duality and yet there cannot be devotion unless we fix our gaze on one.

সুতরাং তিনি না অদ্বৈতবাদী না দ্বৈতবাদী এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একেবারেই অযৌক্তিক ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

সাহিত্য হিসাবে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে'র স্বাতন্ত্র্যও আছে। যে স্বাতন্ত্র্য লোক হইতে লোকান্তরে জীবন হইতে জীবনান্তরে গতি ও স্থিতির মধ্যে; এবং তিনি বৈরাগ্য সাধনাকেও সমর্থন করেন নাই— ফলের আশাও করেন নাই—

"সেইত আমি চাই
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয়তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে
আবার ফুটাই ফুল।" গীতালি / ৩৭

বৈষ্ণবেরাও ফলের আকাঙ্ক্ষা বা মোক্ষ বাঞ্ছা করেন নাই। তাই ধর্মের দিক দিয়া পদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি সমপ্রাণতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। এবং তিনি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ধারাটির একটি অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার মৌলিকতা।

—০—

—: অষ্টাদশ অধ্যায় :—

উপসংহার

পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলিতে আমরা পদাবলী সাহিত্যের ভাব, রূপ ও রস কি ভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যকে উদ্দীপিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা তত্ত্বের সঙ্গে পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সাদৃশ্যের মূলে কি আছে ?— আছে 'স্মৃতি'। মেঘাবৃত দিবস-রজনী, জ্যোৎস্নাহসিত নীলনভ, ফাল্গুনের কুসুমিত নিকুঞ্জ— শুধু উদ্দীপন বিভবে নহে, হৃদয়ের অন্তরতম বন্ধু, হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। মেঘমেদুর আকাশ, কুসুমিত বনানী, বাঁশির সুর এমন ভাবে আমাদের স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে যে যখন শুনি—

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে ॥

× × ×

বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল,

× × ×

আমি বাহির হইব বলে যেন সারাদিন, কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোণে ;

'দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি,

তখনই মনে পড়ে "দূরে বৃন্দাবনের কথা"।

এই বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের নহে, সমগ্র বাঙালি জাতির। তাই দেখি "মধু-বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ" হইতে আধুনিকতম কবি পর্যন্ত সকলেরই সৃষ্টির বন্দনা— রাধার তীব্র প্রতীক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত। এবং দীক্ষাই কি একেবারে অভিভূত করিয়াছে ? বা রবীন্দ্র-সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিধ্বনি ? না—

প্রতিধ্বনি নহে ; বৈশিষ্ট্যহীনও নহে। ইহা স্বমহিমায় মহিমান্বিত।

তথাপি রাধার তীব্র প্রতিক্ষামন্ত্রে সকল কবিই কেন দীক্ষিত ?

বাঙ্গালা তথা ভারতীয়-সাহিত্যে যে দুইটি মৌলিক কাব্যধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে সেই কাব্যধারা দুইটি হইতেছে— হরগৌরীর কাহিনী এবং রাধাকৃষ্ণ কাহিনী। রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনীর সহিত লৌকিক গাথা-গীতির প্রেম-কাহিনীর ধারা মিলিয়াছে। এই ত্রিধারার ত্রিবেণী সঙ্গম হইতেছে বাঙ্গালা দেশের কথা, বাঙ্গালা দেশের কাহিনী, বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের কবিদের রচনায় ঐ ত্রিধারার ছাপ বিদ্যমান এবং রবীন্দ্র কাব্যেও ঐ ত্রিধারার প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ রসের পূজারী। তিনি বিভিন্ন কাব্য হইতে রস আহরণ করিয়া এক অনাস্বাদিতপূর্ব সুষমামণ্ডিত মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। তিনি যে শুধু বেদ-উপনিষদ, কালিদাস, ভবভূতি, বাল্মীকি, ব্যাস, জয়দেব, বৈষ্ণব পদকর্তা, কবীর, দাদু, রজ্জবজী, হেগেল, বের্গসঁ, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির ভাবধারা আহরণ করিয়াছেন তাহা নহে, অবহট্‌ঠ অপভ্রংশে রচিত প্রকীর্ণ কবিতা হইতেও রস সংগ্রহ করিয়াছেন— অমরু-শতকের এই কবিতাটি—

"কথমপি সখি ক্রীরা-কোপদ ব্রজেতি ময়োদিতে
কঠিন হৃদয়স্ত্যক্তা শয্যাং বলাদ্‌গত এব মঃ
ইতি সরভষং ধ্বস্তপ্রেম্নি ব্যপেতঘৃণে জনে
পুনরপি হতব্রীড়ং চেতঃ প্রয়োতি করোমি কিম্‌" ১২ নং শ্লোক

অর্থাৎ, সখি ক্রীড়া কৌতুক বশতঃ তাহাকে বলিয়াছিলাম 'যাও', সে কঠিন হৃদয়, তাই সে শয্যা ত্যাগ করিয়া জোর করিয়াই চলিয়া গেল, যে ব্যক্তি আমার প্রেমকে পদদলিত করিয়া গেল, তথাপি আমার নিলর্জ্জচিত্ত যে তাহাকে বাঞ্ছা করিতেছে, বল কি করি ?

তুঃ রবীন্দ্রনাথ :— "সে আসি কহিল প্রিয়ে মুখ তুলে চাও
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু যাও।"

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে
সখী ওলো সখী, ভাসিতেছে আঁখিনীরে
কেন সে এল না ফিরে।"

অমরুশতকের আরও শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূরোমাঞ্চমালম্বতে
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্‌জনে।

২৪নং শ্লোক

অর্থাৎ ক্রোধে ভ্রূকুটি করিলেও তাহাকে অধিক উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখে, অন্তর কঠিন হইলেও প্রাণে পুলক জাগে, দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তাহার সঙ্গে কথা বন্ধ করিলেও দেখিলেই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, চোখের সম্মুখে থাকিলে কি করিয়া মান যায়?

তুলনীয়ঃ রবীন্দ্রনাথ

"হাসিরে লুকাবি লাজে
চপলা সে বাঁধা পরে না যে
রুধিয়া নয়ন দ্বারে বাঁধিয়া রাখিলি যারে
কখন সে এল ছুটে নয়ন মাঝে।" প্রায়শ্চিত্ত

অথবা "আপনারে তুমি করিবে গোপন কি করি।
হৃদয় তোমার নয়নের কোণে
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।" চেনা / উৎসর্গ।

রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা তত্ত্বের সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের একটি মিল আছে সে কথা বিস্তারিতভাবে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দ্বৈত সত্তার কথা বহুস্থানে বহুভাবে

বলিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতবাদী হইয়াও লীলারস আস্বাদনের জন্য দ্বৈতবাদকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিশদভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় কবির দ্বৈতবাদ এবং পদাবলীর দ্বৈতবাদের সঙ্গে পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা এবং কৃষ্ণ এক নহেন। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের মধ্য দিয়া বিশ্বকে দেখিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মধ্যেই জীবন দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। বিশ্বকে বাদ দিলে রবীন্দ্র-সাহিত্যে কিছুই নাই। কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যে বিশ্ব একেবারে যবনিকার অন্তরালে। কৃষ্ণ —সুন্দর এবং রসময়। কিন্তু জীবন দেবতা শুধু সুন্দর নহেন, তিনি একাধারে—বঁধু, শিব, রুদ্র, প্রভু, নাথ, বেশে আবার বংশীধারী, তবে তিনি তিনি ব্রজেশ্বর বা বৈকুণ্ঠেশ্বর নহেন, এই মর্ত্যের। এবং মর্ত্যেই তাঁহার আসন—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেই যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথা আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো। গীতাঞ্জলি ৯৪

অথবা "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সর্বহারাদের মাঝে।" গীতাঞ্জলি / ১০৭

তাই জীবন দেবতার সাথে কবির লীলা একটানা একই সুরে হয় নাই, যেমন হইয়াছে রাধা ও কৃষ্ণের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ধ্রুপদী শিল্পী। ধ্রুপদ গানের আলাপ, তান কীর্তনের মধ্যে যেরূপ বিস্তার আছে কবির লীলাও ঠিক তেমনি বিস্তৃত। কবি এই লীলা বিস্তার করিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছেন এক রহস্যের বেড়াজালের মধ্যে—

"জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে না রে।" গীতাঞ্জলি / ১২৮

এই 'সরু মোটা' তারে জীবন-বীণা জড়াইয়া যাওয়াও একটি অধ্যাত্ম-লীলা। এবং একথাও স্বীকার্য যে এই অধ্যাত্মলীলার পিছনে পদাবলী সাহিত্যের লীলার স্পর্শ আছে, কিন্তু কবির লীলার মধ্যে যে ব্যাপকতা আছে পদাবলীর লীলার মধ্যে সে ব্যাপকতা নাই—

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো,
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিলরে লিখা—
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো,
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।" গীতাঞ্জলি / ১৭

কবির এই আক্ষেপ ও রাধার আক্ষেপ এক নয়।

অথবা "যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে।" গীতাঞ্জলি / ৭২

এই আর্তি কবির নিজস্ব, এইখানেই কবির বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা।

রাধা-কৃষ্ণের অভিসার একটি তত্ত্ব বা দর্শনসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোপীমুখ্যা রাধা একটি তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া অভিসার যাত্রা করিয়াছেন।

কৃষ্ণের অভিসারও ঐ একই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি ও তাঁহার জীবন দেবতার অভিসার ভিন্ন প্রকৃতির, উপরন্তু কবির চিত্ত দ্বিধা বিভক্ত। কখনো তিনি নারী বেশে, কখনো পুরুষ বেশে অভিসার যাত্রা করিয়াছেন। যখন কবি-চিত্ত নারী বেশে অভিসার করিয়াছেন, তখন কবি-চিত্ত যেন বিরহিনী রাধা হইয়াছেন। আবার যখন পুরুষ বেশে কবি-চিত্ত অভিসারে বাহির হইয়াছেন, সেখানে শিবের শান্ত সমাহিত রূপটি একান্তভাবে প্রকটিত। কবির অভিসার যাত্রা হইতেছে—কবি-চিত্ত একটি অপ্রাপ্তের সন্ধানে বহির্গত হইয়া আকুল অন্বেষণে নানা পথে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাই কবির কাব্যের মধ্যে আমরা যে বেদনাময় সৌন্দর্যলিপ্সু প্রাণের জীবন্ত অভিব্যক্তি দেখি, তাহা বৈষ্ণব দর্শনে দুর্লভ।

কবির মধ্যে একটা ক্রিয়া, একটা ব্যাপার, একটা গতি আছে। কবির এই গতি বৈষ্ণব পদকর্তাদের কাব্যে নাই। বৈষ্ণব-পদকর্তারা আপন কক্ষ-পথে স্থির নির্দিষ্ট থাকিয়া শুভ্র দীপশিখা হাতে লইয়া আবর্তন করিয়াছেন। পদাবলীতে পদকর্তাদের হৃদয়ের কোনো স্পন্দন আমরা অনুভব করি না; রাধা-কৃষ্ণের নির্মোকের অন্তরালে পদকর্তাদের ব্যক্তি পুরুষটি যেমন চাপা পড়িয়া গিয়াছে কবির কাব্যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আধুনিক গীতি কবিতার নিটোল রূপটি কবির রচনায় বিধৃত হইয়াছে। উপরন্তু কবি-চিত্ত অগ্রসর হইয়াছে স্খলন পতনের মধ্য দিয়া—

"কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি
করেছো কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বার বার ফিরে গেছ নাথ
অর্ঘ্য কুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার

নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার
হে কবি, তোমার রচিত রাগিনী
আমি কি গাহিতে পারি।" চিত্রা / জীবন দেবতা

তাই দেখি পদাবলীর 'নিবেদনে'র সঙ্গে কবির 'নিবেদনে'র পার্থক্য আছে। কবি জন্মদিন (আত্মপরিচয়) নিবন্ধে বলিয়াছেন—"জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ-যুগের শাস্ত্রীয় অনুলেপন ঘটেনি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিপথে প্রাচীন অনুশাসনের উদাত্ত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয়নি।"

কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—"লোক-জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং উপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি, এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন।" তাই কবির বক্তব্য—

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে
দেখো না আমায় বাহিরে।"

এত গেল কবির বক্তব্যের একদিক, কিন্তু আর এক দিক দেখিলে আমরা দেখিতে পাই—

কীর্তন গানে যে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।

The Religion of Man গ্রন্থে কবি বলিয়াছেন—"The Vaisnava poet sings of the lover who has flute which with its different stops, gives out the varied notes of beauty and love that are in Nature and Man. Those notes bring love our message of invitation They eternally urze us to come out from seclution of our self-centred into the realm of love and truth"—'The Vision'. Page 106.

কবি আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয়কে এক পত্রযোগে জানাইয়াছিলেন —"বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈয়ারি করিয়াছি। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে।"

যে কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন্‌টি অবলম্বন করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছান যাইতে পারে ?

"বাহির হইতে দেখোনা" ইহাও সত্য। আবার বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনে হাওয়া তৈয়ারি হইয়াছে" ইহা সত্য। "কীর্তন গানের যে আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে" তাহাও লুপ্ত হয় নাই—ইহাও সত্য। ইহার প্রমাণ রবীন্দ্র সঙ্গীতে রহিয়াছে। আমরা ইহাও আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে কবি ব্রজমণ্ডলের পরিবেশকে কোনো দিনই ভুলেন নাই। পদাবলীর শব্দরাজিকেও তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়াও কবি বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং বাহির হইতে দেখার প্রশ্ন আসে না এবং আমরা বাহির হইতে কবির কাব্য ও কবি-মানসকে বিচার বিশ্লেষণ করি নাই।

'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনার যে ভাবমূর্তি আমরা দেখি তাহাও বৈষ্ণবীয় বাসক সজ্জার নামান্তর—

ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি
সেজেছ কি শুচি দুকুলে
বেঁধেছ কি চুল তুলেছ কি ফুল
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে রাজা নাটকের ঠাকুর্দার মধ্যে সখ্যরস, দাসী সুরঙ্গমার মধ্যে দাস্যরস এবং রাণীর মধ্যে মাধুর্য রসের পরিচয় পাই যাহা বৈষ্ণবীয় ভাবধারা দ্বারা নিষিক্ত। আবার ঐ নাটকে যখন পাই— '× × × এত বিচিত্র রূপ দেখেছ, তবে কেন সব বন্ধ করে কেবল একটি মূর্তি দেখতে চাচ্ছ' ?

এইখানেই দেখি কবি আবার বৈষ্ণবীয় ভাবধারাকে অতিক্রান্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুর প্রত্যাশী নহেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের রাজা (যিনি সর্বলোকের রাজা) কৃষ্ণ নহেন, তিনি সুন্দর, তিনি রুদ্র, তিনি ভয়ঙ্কর। তাহার মালা, 'মালা' নয়—

'এ তো মালা নয় গো, এযে
তোমার তরবারি
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্রহেন ভারি।' দান / খেয়া

তিনি বাঁশিও বাজান, দানও করেন, কিন্তু তাহা বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলের নহে—

কি পেলি তুই নারী
নয় এ মালা, নয় এ মালা
গন্ধজলের ঝারি
এযে ভীষণ তরবারি।' দান / খেয়া

আবার বালিকা বধূ বেশে কবি-চিত্ত প্রতীক্ষমানা—

'সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিব জাগিয়া'
শতযুগ করি মানিবে তখন ক্ষণেক অদর্শনে" খেয়া

ইহা— "তারে এক তিল না হেরিলে
শতযুগ মনে হয়।"

কবির বিরহী চিত্তের সঙ্গে রাধিকা সত্তার যে একটি মিল আছে সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। রাধার আকুতি যে অনন্ত আকুতি একথাও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কবি চিত্তের আকুতিও অনন্ত আকুতি। তাই দেখি 'কল্পনা, নৈবেদ্য, খেয়াতে' যে নবজীবনের সূচনা হইয়াছিল, গীতাঞ্জলিতে তাহার পরিণতি লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই পরিণতি লাভ ঘটে গীতিমালা ও গীতালিতে। তখন জীবনদেবতা ধরা দিয়াছেন, আনন্দ ও খুশিতে কবি চিত্ত পরিপূর্ণ—

"আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।" গীতিমাল্য / ১৫

অথবা "প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে
ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে" গীতিমাল্য / ৩৬

কারণ "জানি যেন সকল জানি
ছুঁতে পারি বসন খানি
একটুকু হাত বাড়ালে।" গীতিমাল্য / ৯

এ আনন্দের চিত্র পদাবলী-সাহিত্যে নাই।

গীতিমাল্যের গানে কোনো তত্ত্ব কথা নাই, কোন দুশ্চর সাধনা বা তপস্যার কথা নাই, আছে শুধু স্বচ্ছতা, সরলতা ও আনন্দ। গীতালিতেও দেখি কবির ভয় ভাবনা একেবারে কাটিয়া গিয়াছে, প্রশান্তি ও পরম বিশ্বাসে চিত্ত শান্ত ও সমাহিত, উৎকণ্ঠাও নাই, প্রতীক্ষার বেদনা নাই, মাথুর বিরহও নাই। যাঁহার জন্য এত উৎকণ্ঠা আগ্রহ, যাঁহার জন্য এত অভিসার সেই 'তিনি' আজ ধরা দিয়াছেন—

"আজতো আমি ভয় করিনে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয়, নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধু-পারে
তবু তুমি সেইতো আমার তুমি,
আবার তোমায় চিনব নূতন করে। গীতালি / ৯৭

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" এর লেশটুকু পর্যন্ত নাই। কারণ এ যে চরম পাওয়া, ইহাতে হারানোর ভয় নাই, ফাঁকি দিবারও ভয় নাই— "চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল চিরদিন দিল ফাঁকি" আর হইবার কোনো

উপায় নাই। মনে হইল এইবার শেষ। কিন্তু "শেষ হয়ে না হইল শেষ"। তৃপ্তির মধ্যে আবার জাগিয়া উঠিল— অতৃপ্তি ; কবি চাহিতেছেন— আরও আলো, আরও আরোও প্রাণ", যে রাধা কৃষ্ণের জন্য—

"চীর চন্দন উড়ে হার ন দেলা
সো অব নদী গিরি আন্তর ভেলা"

সেই অতৃপ্তি, সেই বেদনা। এর পরেও 'তিনি' কবিকে ঘড়ছাড়া করিতেছেন। কারণ এ পাওয়ার মধ্যে তৃপ্তি নাই, এইতো Divine quest স্বর্গীয় তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য কবি বলিয়াছেন—

'পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার"—

চলার পথে যদি জীবনদেবতা ইচ্ছা করেন তবে—

"আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফিরে
দুঃখ সুখের-ঢেউ খেলানো
এই সাগরের তীরে।

× × × ×

আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে॥" গীতালি / ৮৬

এই খানেই কবির বৈশিষ্ট্য। ইহাই কবির অভিসার। এই অভিসারের সঙ্গে রাধার অভিসারের সাদৃশ্য থাকিলেও এইখানেই রহিয়াছে বৈসাদৃশ্য।

কবির দ্বৈতভাবের সঙ্গে রাধা কৃষ্ণের দ্বৈতভাবের সাদৃশ্য আছে। পদাবলীতে মান-অভিমানের যে চিত্র আছে কবির রচনাতেও তার অভাব নাই। তবুও রাধা রাধাই— তিনি প্রেমিকা নারী। কিন্তু কবি-সত্ত্বা একাধারে রাধা ও শিব। একদিকে গভীর উৎকণ্ঠা অপর দিকে প্রগাঢ় শান্তি। রাধার

বীণা একতন্ত্রী, কবির বীণা সহস্রতন্ত্রী। তাই রাধার বীণা বাজিয়াছে একটি সুরে ; কবির বীণা বাজিয়াছে সহস্রসুরে। রাধার বীণার সুর আছে, কিন্তু সে সুরের বিস্তার নাই, আলাপ নাই। কবির সুরে আলাপ আছে, তান আছে, বিস্তার আছে। তথাপি দেখা যায় সুরের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে। তাই ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবিকে বৈষ্ণব পদাবলীর শেষ উত্তর সাধক বলিয়াছেন। কারণ কবি যে তাঁহার কাব্য রচনায় শুধু বৈষ্ণবীয় প্রকাশ-ভঙ্গি, ভাষা ও ছন্দ প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে— তিনি বৈষ্ণবীয় প্রেম-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন—

"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো এসো মোর
হৃদয়-নীরে।

দুটো কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।
চাহিয়া বঞ্জুল বনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে
যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহন তলে।"

হৃদয়-যমুনা / সোনার তরী

তবে দৃষ্টি-ভঙ্গি এক নহে। বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরকে তাঁহার মহিমময় উচ্চাসন হইতে মানুষের দরজায় নামাইয়া আনিয়াছেন সত্য এবং বলিয়াছেন— "সবার উপরে মানুষ সত্য" তথাপি ঈশ্বরকে বা ভগবান্ কৃষ্ণকে পদকর্তারা প্রকৃত মানুষ করেন নাই। বাউলের পথ—কিছুটা ভিন্ন ; তাঁহারা বৈষ্ণবদের চেয়ে আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া মানবীয় সম্পর্কের মাধ্যমে দেবতাকে দেখিতে চাহিয়াছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই মানুষী প্রেম-প্রবাহকে একটি ব্যাপক পটভূমির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেখানে প্রকৃতি সৌন্দর্য, প্রেম

সমস্তই একাকার হইয়া গিয়াছে। ভক্ত-বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরের কৃপা বার বার প্রার্থনা করিয়াছেন। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না, আত্মজ্ঞান জন্মে না—

"জ্ঞানাতি তত্ত্বং ভগবন্‌-মহিমনঞ্চ"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা চাহেন নাই, বরং উল্টো কথাই তিনি বলিয়াছেন—

"আমারে করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।" নৈবেদ্য।

"উচ্ছল ফেন-ভক্তি-মদধারা" কবির ঈপ্সিত ধন নহে—

"ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় ফল।" নৈবেদ্য।

পদকর্তাদের উপলব্ধি এবং কবির উপলব্ধি এক নহে। পদকর্তারা গোষ্ঠীচেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আত্ম-সচেতন কবি। উপরন্তু বৈষ্ণব-মহাজনদের পদ হইতেছে—ভক্ত-হৃদয়ের অর্ঘ্য; কিন্তু কবির নৈবেদ্য এবং পদকর্তাদের নৈবেদ্য বা অর্ঘ্য এক বস্তু নহে।

কবি তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মানব-নাট্য-মঞ্চের মাঝখানে যে লীলা, তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা একে ছোট বলব না, এও সত্য। জীবন-দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলে মুক্তি।"

মানব-সত্য / ধর্ম।

মানুষের ধর্ম এই মুক্তিতত্ত্ব, কিন্তু এই মুক্তিতত্ত্ব, তত্ত্বশিরোমণিদের মুক্তিতত্ত্ব নহে। এই মুক্তি-তত্ত্ব কবির নিজস্ব সত্তার মুক্তি, এ যেন অদ্বৈত তত্ত্বের পরিণতি। কিন্তু অদ্বৈতে সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, প্রশান্তি নাই,

তাই আবার সেই দ্বৈতবাদ, আবার সেই ছুটিয়া চলা এক সত্তার পিছনে আর এক সত্তার চলা—

"মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে
ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে না করি শংকা দুর্দিনের অশ্রুজল ধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি,
তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবন-সর্বস্ব ধন
অর্পিয়াছি যারে জন্ম জন্ম ধরি ॥"

'জন্ম জন্ম ধরি' অভিসার যাত্রার মূলে আছে—

"আরো চাই যে, আরো চাইগো—
আরো চাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়
বিতরে নাই

× × ×

দিন-রজনীর বাঁশি পূরে
যে গান বাজে অসীম সুরে,
তারে আমার প্রাণের তারে
বাজানো চাই।" গীতিমাল্য / ৭৮

এই দৈবী-অতৃপ্তির জন্য ছোটা বা অভিসার যাত্রা করা। এই অভিসার যাত্রার মধ্যে আছে—উপনিষদের "চরৈবেতি চরৈবেতি" এবং পদাবলী সাহিত্যের 'হাওয়া'। অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন যেমন করিয়া মেশে, ঠিক তেমনি করিয়া উপনিষদ ও পদাবলী সাহিত্যের ভাবধারা ও পরিবেশ রবীন্দ্র-কাব্যে মিশিয়া রবীন্দ্রকাব্যকে এক অনন্য সাধারণতা দান করিলেও কবি তাঁহার এই অভিসারকে "অনন্ত অভিসার" রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "জন্মদিনে"

কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় কবি-চিত্ত নিজ মরণ-মহোৎসবের আভাস দিয়া শেষ খায়ের মত বিদায় লইবার প্রাক্কালে বলিয়াছেন—

'সে অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি"

ইহা যেন—ইহজীবনের শেষ অনুষ্ঠান এবং ভাবী জীবনের জন্মাষ্টমী।

ইহাই— "ওগো নব প্রভাত জ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার" গীতালি/৯৮

এই 'দর্শন' অন্য কোনো 'দর্শনশাস্ত্রে' নাই, ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দর্শন—

"আবার তোমায় চিনব নূতন করে" গীতালি/৯৭

—০—

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু অভিমত ঃ

অধ্যাপক ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, এম. এ. পিএইচ. ডি. ; প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ ; রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বলেন—

"গ্রন্থ আপনার অনবদ্য, স্বাদু স্বাদু পদে পদে।"

ডঃ নির্মল নারায়ণ গুপ্ত, এম. এ. ডি. লিট. বলেন- "প্রথম ন'টি অধ্যায়ে বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস, প্রেক্ষাপট ও বিবিধ তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পাঠককে আপনি গ্রন্থের মূল বিষয়ের রস গ্রহণে অধিকারী করে তুলেছেন। তারপর আটটি অধ্যায়ে একে একে রবীন্দ্রনাথের আশৈশব বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিচয় ও প্রভাব, তাঁর মানসিকতা ও জীবন দর্শনে উপনিষদ ও বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাব, তাঁর বিবিধ রচনায় এই প্রভাবের স্বর্ণ-প্রসূ প্রতিফলন এবং বৈষ্ণব কবি-গোষ্ঠী ও রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করে আপনি রবীন্দ্রনাথের কবি ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করেছেন। অদীক্ষিত পাঠককে দীক্ষিত করে রস পিপাসু করে তুলে তাকে বঞ্চিত করেন নি, রসসমৃদ্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছেন। নিশ্চয় করে বলতে পারি বাংলা সাহিত্যের পাঠকের এ এক পরম প্রাপ্তি।

Prof. J. N. Barman opined :—

"Vaisnava Padavali Sahitya Evam Rabindranath" by Dr Chakraborty is a product of very high standard not only from the literary point of view, also from philosophic depth of considerable dimension. It is a valuabe assets for research workers and serious students of literature and philosophy". **[North East Times (A daily newspaper of Assam)]**

Prof. Nava Kanta Barua,

A poet of great repute states

"Dr. Ajoy Kumar Chakraborti's book 'Vaisnava padavali Evam Rabindranath is a scholarly document prepared with deep insight and erudition into both Tagore lore and Vaisnava literary tradition .... Dr. Chakravarti's erudition and understanding has thrown much light on this less known area Tagore's creative art. I Congratulate him for this great service rendered to us.

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য ঃ

সপ্তলিপি (গল্পগ্রন্থ)

"The introduction to the collection of short stories is written by the eminent poet, Mr. Nava Kanta Barua, who has pointed out some of the characteristic features of Prof. Chakravarty's stories.

Simple and unornamental in out lines. The stories are beautifully told and the narrative is deftly handled. Love, Labour and the earth are themes in these stories."

Dinesh Goswami
North East Times / daily
Guwahati, Assam

॥ মহাকবি ॥

ডক্টর সুকুমার সেন, এম. এ. পিএইচ. ডি. বলেন—আমার যেমন ভালো লাগিয়াছে, পাঠক সাধারণেরও তেমনি ভালো লাগিবে এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে শিক্ষিত দর্শকদেরও সমান আনন্দ দিবে।

ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত, এম. এ. পিএইচ. ডি. বলেন—"নাটকখানি আমার ভালই লাগিয়াছে। আপনি মধুসূদনের জীবন হইতে যে সকল ঘটনা বাছিয়া লইয়াছেন সে নির্বাচন নাটকীয় অবস্থান সৃষ্টির পক্ষে বেশ উপযুক্ত হইয়াছে, ঘটনাগুলির সন্নিবেশও ভাল হইয়াছে।"

দৈনিক বসুমতী বলেন (৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৮)—নাট্যকার কথা, দৃশ্য ভাগ ও অঙ্ক বিভাগে নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং নাটকটিতে মধুসূদন এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলির যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

আনন্দবাজার বলেন (রবিবার ১৭ই কার্তিক, ১৩৫৮) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বনে লিখিত একখানি নাটক। তৎকালীন বঙ্গীয় বিদ্বৎ সমাজের যে মহাসম্মেলন বইখানিতে দেখিতে পাই—নাট্যোল্লিখিত একটি চরিত্রের মুখ দিয়া তাহা বর্ণিত হইয়াছে 'প্রতিভার শোভাযাত্রারূপে'। গ্রন্থটি সুলিখিত ও সুপাঠ্য হইয়াছে।

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, এম. এ. ডি. ফিল. বলেন— এই নাটকের খাতেই আপনার প্রতিভা তাহার প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তী (কালনা কলেজের অধ্যাপক) বলেন—শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্তীর লেখা "মহাকবি" নাটকখানি পড়লাম। নাট্যকার ইতিহাসের মশলা আস্ত রেখে সাহিত্য ব্যঞ্জনের স্বাদ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন এটা তাঁর অপূর্বশক্তি নির্মাণসীমা প্রজ্ঞার বিশিষ্ট স্বাক্ষর। বাস্তব সত্য ও সাহিত্য সত্যের এরূপ রসব্যঞ্জনাময় সংমিশ্রণ, ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে এরূপ নাটকীয় সংঘাত ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির উদাহরণ ঐতিহাসিক বাংলা নাটকে বিরল দৃষ্ট। সারস্বত ক্ষেত্রে নবীন নাট্যকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সম্ভাবনাময়।

॥ ভবানী মঙ্গল ॥

ভবানী মঙ্গল সম্বন্ধে যুগান্তর বলেন—"...... .... এই কারণে এই গ্রন্থখানি সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের নিকট আদর লাভ করিবে .... বাংলার সাহিত্যিকগণ এই গ্রন্থ আলোচনা করিতে পারেন।" ২৫-২-৫১।

॥ মাণিক্য মিত্রের কথা ॥

যুগান্তর বলেন—"অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত এই রূপকথা (কাব্য) সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয় প্রাচীন বাংলা

সাহিত্যের একখানি প্রয়োজনীয় উপকরণ জনসাধারণের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। ডাঃ সুকুমার সেন গ্রন্থের ভূমিকায় ইহার বিশেষ মূল্য আছে স্বীকার করিয়াছেন।

॥ সোনারায়ের গান ॥

আনন্দবাজার বলেন—'সোনারায় ঠাকুর' ব্যাঘ্র ভয়ংকের দেবতা। এই লৌকিক দেবতার একটি পালাগান আলোচ্য গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। ভূমিকাটিও মূল্যবান।

ডক্টর সুকুমার সেন বলেন—সংগ্রহটি মূল্যবান। সম্পাদনাও উৎকৃষ্ট।

Dr. Suniti Kumar Chatterjee, M.A P.R.S. D. LITT. F.A.S. বলেন—It has got its value in ethnology and religiology. I am sure those who are interested in the subject of Indian anthropology and cultural history, will appreciate your edition.

॥ কায়া ও ছায়া ॥

দেশ বলেন—"গ্রন্থকার ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন। গল্প দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।"

"শিল্পীর মৃত্যু" সম্বন্ধে দৈনিক বসুমতী বলেন—"ছোট গল্পের সার্থক কৌশলে ও ঘটনার অভিনবত্বে উপভোগ্য। বর্তমান সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা ছবিগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট।"

সুসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— বর্তমান জীবন নিয়ে যে সৃষ্টিধর্ম্মী রচনা করেছেন, যে জাগ্রত এবং রসপিপাসু দৃষ্টির পরিচয় পেয়েছি আমার ভাল লেগেছে।

॥ গ্রন্থকারের রচিত অপর গ্রন্থ ॥

১। Literature in Kamata—Kochbihar Raj-Darbar from 14th to 18th Century (approved thesis for the Ph. D. Degree)

২। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ (ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত)

৩। ভবানী মঙ্গল—রামনারায়ণ কৃত

৪। বিজ্ঞাসুর প্রস্তাব—ইন্দ্রকান্ত দেব শর্ম্মণ

৫। হরি বংশের কবি ও ভবানন্দের পরিচয়

৬। মাণিক্য মিত্রের কথা— দ্বিজ উমানাথ বিরচিত

৭। সাধন সঙ্গীতে বাংলার মুসলমান কবি

৮। সোনারায়ের গান

৯। কায়া ও ছায়া (গল্প সংকলন)

১০। শিল্পীর মৃত্যু (ঐ)

১১। নাগেশ্বরী (উপন্যাস)

১২। পটপরিবর্ত্তন (ঐ)

১৩। ঘুম নেই (ঐ)

১৪। মহাকবি (নাটক)

১৫। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৬। সাহিত্যদর্শন (সমালোচনা)

১৭। সিরাজদ্দৌল্লা (গিরিশচন্দ্র) সম্পাদিত

১৮। ছন্দ ও অলঙ্কার।

১৯। অলঙ্কার ও ছন্দ (প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য) (২য় সং যন্ত্রস্থ)

অসমীয়া ভাষায় লেখা

২০। সর্পলিপি (গল্প সংকলন)

২১। নাগেশ্বরী (উপন্যাস)

২২। ছন্দ-অলঙ্কার আরু ধ্বনি

২৩। হেমসরস্বতী বিরচিত প্রহ্লাদ চরিত্র অনুবাদ (যন্ত্রস্থ)

২৪। রবীন্দ্র সাহিত্যর চমু পরিচয় (যন্ত্রস্থ)